রামুর ইতিহাস

ইংরেজ আমল পর্যন্ত

আবুল কাসেম

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অপরূপ উকিল

অক্ষর বিন্যাস
ভারবি
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

জনাব তিতাশ চৌধুরী

ও

রাশিদা তাহির

লেখকের কথা

রামুর ইতিহাস রচনায় প্রথম উৎসাহ সৃষ্টি হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন কক্সবাজার জেলার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত স্মরণিকায় জনাব জহিরুল আলম চৌধুরীসহ যৌথভাবে লিখিত আমাদের রামুর অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত একটি লেখা ছাপা হয়। এই লেখাটি পাঠ করে কক্সবাজার জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক জনাব খন্দকার ফজলুর রহমান (তিনি বর্তমানে কক্সবাজারে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন) বিষয়টির প্রতি গভীর অনুসন্ধানের উৎসাহ প্রদান করেন। পরবর্তী সময় এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে লেখা 'রামুর পুরোনো ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক একটি প্রবন্ধ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক পূর্বকোণ' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের কক্সবাজার সংবাদদাতা জনাব মুহম্মদ নূরুল ইসলাম প্রবন্ধটির সীমাবদ্ধতা এবং তথ্যের অসম্পূর্ণতার ওপর 'রামুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঃ আরো কিছু তথ্য' নামে একটি সম্পূরক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটিও ২য় বর্ষ ১৭তম সংখ্যার দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বীকার করা প্রাসঙ্গিক যে, জনাব ইসলামের প্রবন্ধটির দিকনির্দেশনা একটি পরিপূর্ণ লেখার মোহে আমাকে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু তখনই কিছু লেখা সম্ভব ছিল না। পুনরায় কর্মোপলক্ষে রামুতে আসার বিষয়টি নতুনভাবে ভাবাতে শুরু করে। এ সময় তিন জন উৎসাহী ব্যক্তি সার্বক্ষণিকভাবে এই কাজে আমাকে মনোযোগী করে রাখেন। এদের একজন কক্সবাজারের বর্তমান এডিএম জনাব মুহম্মদ বাকের এবং অপর দু'জন রামু কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোস্তাক আহমদ ও উপাধ্যক্ষ জনাব দীপক কুমার বড়ুয়া। এ পর্যায়ে সঙ্গীত তথ্য এবং উপাত্ত নিয়ে 'রামুর প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশের পর তা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করেন।

খ্রিস্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে থেকে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বরাবরই রামু আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। রামুর ইতিহাসে এই শাসনের একটি ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তবে সূচিপত্র দেখে আরাকানি শাসনের ধারাবাহিক বিবরণ সম্যক উপলব্ধি করা হয়তো যাবে না। এখানে তাদের শাসনামলে বাইরে থেকে কারা কখন এসেছে, আক্রমণ করেছে, বিজয়ী বা বিজিত হয়েছে– এসব দিকগুলো হাই লাইট করা হয়েছে। রাহমী রাজ্যের রাজাদের সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া না গেলেও রামু থেকে অন্তত একজন রাজার আবির্ভাব ঘটেছিল– এ দাবিটি অমূলক নয়। তিনি চাইন্দা রাজা বা চণ্ডীলাহ রাজা।

ইংরেজ শাসন আমাদের দেশে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করেছে। প্রথম দিকে তাদের শাসন ছিল মূলত রাজস্বকেন্দ্রিক। ইংরেজদের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রামেই 'নোয়াবাদের' মতো নতুন রাজস্ব ধারণা ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও রামুসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের তখনকার ঐতিহাসিক সমস্যা ছিল আরাকানি উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্র-পুরুষ ছিলেন ক্যাপ্টেন কক্স।

ক্যাপ্টেন কক্স সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না। প্রচলিত বাংলা বানানে তার পুরো নাম ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স লেখা হয়। কিন্তু ইংরেজি ভাষাভাষী লোকেরা নামটি 'হাইরাম কক্স' বলে উচ্চারণ করে। এর কারণ বলা হয় যে, তিনি স্কটিশ ছিলেন, ব্রিটিশ নয়। সম্প্রতি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে প্রখ্যাত নাট্যকার সাইদ আহমদ কক্স-এর জীবনী স্ব হস্তে লিখে নিয়ে এসেছেন। আমরা পরিশিষ্ট খ-এর পুনশ্চ অংশে তার বাংলা অনুবাদ সংযোজন করেছি।

সামাজিক ইতিহাস অংশে লোকজ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সামষ্টিক ইতিহাসের এটিই যে রীতি হওয়া উচিত তা বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই বাঙালির ইতিহাসে আদি পর্বের বহু পুরনো উপাদান অনিবার্যভাবেই ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে পাশাপাশি আবিষ্কার করা হয়েছে তার উত্তরাধিকার। প্রসঙ্গ : রাখাইন সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দিকটিও সমানভাবে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

ইংরেজ আমল পর্যন্ত লেখার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। তাই '৪৭-এর দেশ বিভাগ এবং '৭১-এর স্বাধীন সংগ্রামের কথা আসেনি। আসেনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা। একালে পটভূমি ব্যাপক বিস্তৃত বিধায় সময়ের অপর্যাপ্ততায় তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে আরেক অধ্যায় সংযোজনের মাধ্যমে ইতিহাসটি হালনাগাদ করার ইচ্ছে রইল।

এই গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকেই সহায়তা করেছেন। ভূমিকা লিখে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। প্রোফাইল লিখে দিয়ে এবং কক্সবাজার ফাউন্ডেশন থেকে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ এনামুল কবীর। বইটি লেখার ক্ষেত্রে অন্যান্যের মধ্যে উৎসাহ, পরামর্শ ও তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন জনাব ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবু আহমদ, জনাব ওবায়দুল হকসহ রাইজিং এসোসিয়েটসের সকল সদস্য, জনাব শাহ আলম বাদলসহ রামুর সকল ইউপি চেয়ারম্যান, দৈনিক পূর্বকাণের সাংবাদিক আমির হোসাইন হেলালী এবং দৈনিক আজাদীর সাংবাদিক তপন চক্রবর্তী। একটি ভিন্নধর্মী অভিমত দিয়েছেন কক্সবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আফসার। পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছেন সহকর্মী অপর্ণা পাল ও মংবা। আর ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে স্বত্বাধিকারী হয়েছে ফাহিদ হাসিন সুপন। এদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনটি এমন যে, কৃতজ্ঞা প্রকাশের অবকাশ নেই।

প্রকাশনার সকল তত্ত্বাবধানসহ বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন এদেশের খ্যাতনামা প্রচ্ছদ শিল্পী খালিদ আহসান। পুরোনো মানচিত্রগুলো সরবরাহ করেছেন সাজু আর্টস-এর জনাব রমিজ আহমদ চৌধুরী। এছাড়া তিনি নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শও দিয়েছেন।

১৮ অক্টোবর, ১৯৯৪ — আবুল কাসেম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
রামুর ভৌগোলিক বিবরণ

১. ভৌগোলিক প্রাচীনত্ব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় পার্গিটা রচিত ভারতীয় দেশসমূহের প্রাচীনকালের মানচিত্রে। এই মানচিত্রে দক্ষিণে সাগর নোপের অবস্থান চিহ্নিত আছে। তাঁর মানচিত্রে কিরাত, সিরোট, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ করা আছে। পার্গিটা কিরাত সম্পর্কে বলেছেন, it (Kiratades, the term Kirata) was applied to tribes in habiting the Himalaya range and its southern slopes from the Punjub to Assam and Chittagong.[১] কিরাতের সম্পর্কে Lassen বলেন, By the name Kirradia, Ptolemy designates the land on the coast of further India from the city of Pentapolis, perhaps the present Miskanseri (Mirsarai) in the north, as far as the mouth of the Tokasanna or Arakan rivers.[২] Mc Crindle বলেন, By the cirradioi are meant the Kirata a race spread along the mouths of the Ganges as far as Arakan.[৩]

কিরাত-এ বসবাসকারী লোকজন অনার্য, বিশেষ করে মঙ্গোলীয় বা অষ্ট্রোমঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক ছিলেন– যারা উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি ঢল থেকে আগত। ড. এস.কে. চ্যাটার্জি চট্টগ্রাম আরাকান অঞ্চলকে প্রাচীন কিরাত বলে অভিহিত করেছেন।[৪]

কিরাতের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তা সত্ত্বেও উল্লিখিত মতগুলি অনুসরণ করলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রামুর অবস্থান প্রাচীনকালের কিরাতের মধ্যে নিহিত ছিল।

গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমি তাঁর বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থে এতদঞ্চলের কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে Pentapolis (150°-18°) একটি। কিরাত এবং চট্টগ্রামের মধ্যে তার অবস্থান দেখিয়েছেন। Mouth of the river Katabeda (151°-17°)কে Mc Crindle কর্ণফুলী নদী বলে শনাক্ত করেছেন। Barakoura (152°30′-16°) ক্রয়-বিক্রয় স্থল (a mart), Yule তাঁর মানচিত্রে এই স্থানটিকে Ramai বা Rama বলে শনাক্ত করেছেন।[৫] টলেমি একটি জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন Mouth of Yokosanna (153°-140°-140°30′) একে Wilfard এবং Lassen আরাকান নদী বলে শনাক্ত করেছেন, কিন্তু Yule একে নাফ নদী বলতে চান। টলেমি Kokkannagara (160°-20°) নামক একটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। Yule একে তারানাথের

১। *Jou nal of Asiatic Society of Bengal* (Pergitre) (1897) 108-109

২। Mc Cundle, ? 192

৩। Mc. Crindle, P. 192

৪। *Journal of Asiatic Society of Bengal*, letters KVI (1950) 234

৫। Mc. Crindle, P. 194-195

কোকিল্যাগু বলেছেন– যা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত।

তিব্বতি লেখক লামা তারানাথ তাঁর বিবরণে বলেছেন, the country to the south of Tripura and north of Rakhan (Arakan) was Ramma (Sans Ramya) the land of the picturesque seenaries.[১]

আরব ভূগোলবিদরা সপ্তম অষ্টম শতকে বঙ্গোপসাগরে পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি স্থানের পরিচয় দিয়েছেন। এই স্থানটিকে এরা Rahmi বলেছেন। এই Rahmi কে অনেক লেখক বর্তমান রামু বলে শনাক্ত করেন। The Arab geographers knew a place on the eastern coast of the Bay of Bengal, Rahmi (H. M. Elliot and John Dowsan, History of India as told by its own Historians 1.5) by name. This Rahmi has been identified by Dr. R.C. Majumder as the Kingdom of Ramyaka Indian Historical Quarterly, XVI (1940) (233) the Buddhist name of Chittagong.[২]

পর্তুগিজ লেখক ডি ব্যারোস ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে একটি মানচিত্র অংকন করেন। এই অঞ্চলের জন্য এই মানচিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মানচিত্রে কক্সবাজার এলাকার বেশ কিছু স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একটি নদী এবং তার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ এলাকা Estado de covascam অর্থাৎ কবাস কম (খোদা বখস খানের) এ স্টেট রূপে দেখানো হয়েছে। তারও দক্ষিণে Raino de Arracan অর্থাৎ আরাকান রাজ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার সম্পূর্ণটাই চকরিয়া নামে পরিচিহ্নিত। এই মানচিত্রে রামুর উল্লেখ নেই। অত্যন্ত বিস্ময় এই যে, এই সময় রামু সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এই মানচিত্রে রামুর নাম না থাকার কারণ সম্ভবত এই যে, ডি ব্যারোস এই সময়ে চট্টগ্রামে অবস্থান করতেন। চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন খোদা বখস খান এবং উত্তরাঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন আমীরজা খান। এদের দু'জনের মধ্যে বিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণেই খোদা বখস খান এবং তাঁর এস্টেট তখন তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। খোদা বখস খানের এস্টেটেই রামুর অবস্থান বিলীন হয়ে আছে। কেননা খোদা বখস খানের এস্টেটের দক্ষিণে আরাকান রাজ্য চিহ্নিত আছে। তবে এটি নিশ্চিত করে বলা শক্ত যে, ঐ সময় রামু আরাকানের অধীন ছিল কি-না। কেননা চকরিয়া এবং রামু ষোড়শ শতাব্দীর দীর্ঘ সময় একই সামন্তরাজের রাজ্যভুক্ত ছিল।

তুরস্কের সুলতান সোলায়মানের সময় লোহিত সাগর নৌবহরের ক্যাপ্টেন সিদি আলী তাঁর মিরাত উল-মমলিগ বা 'দেশসমূহের দর্পন' নামে বইতে ভারতীয় উপকূল থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত কয়েকটি দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মোহিত বা 'মহাসাগর' নামে আরো একটি বই লেখেন। এই বইতে চট্টগ্রামের নদীপথের বিবরণ আছে। তিনি উপকূলের যে সমস্ত স্থানের নাম করেছেন তার মধ্যে দরদিউ ফেশত হাইমিউন, কাকরদিয়া, জেজ্জিলিয়া এবং ফেশত্ গোরিয়াস অন্যতম। প্রফেসর জোসেফ ফন হেমার এই স্থানগুলির পরিচয় দিয়েছেন– দরদিউকে নারকেলদ্বীপ, ফেশত হাইমিউনকে আরাকানের অদূরে অবস্থিত জনবসতিহীন ঝিনুকদ্বীপ, বাকালকে মোশকাল বা মহেশখালী দ্বীপ, কাকরদিয়াকে কুতুবদিয়া দ্বীপ।[৩] দরদিউ দুটি শব্দে গঠিত। দর অর্থ

১। *Journal of Asiatic Society of Bengal* (XVI 1898) P. 24

২। Dr. Sunity Bhushan Qanungo, *A History of Ctg* P. 15

৩। *Journal of Asiatic Society of Bengal*, Vol VI 836, p. 496-97.

দরজা, দিউ অর্থ দ্বীপ। কক্সবাজারের প্রবেশ করার মুখে বা দরজায় এই দ্বীপ অবস্থিত ছিল। দরদিউকে সেন্ট মার্টিনের সঙ্গে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত। সিদি আলী চেহেলভি দরদিউর পরে বাকাল-এর উল্লেখ করেন। তাঁর বিবরণে বাকাল একটি খাঁড়ি বা প্রণালী। প্রফেসর হেমার বাকালকে মহেশখাল (মহেশখালী) রূপে চিহ্নিত করেছেন। ডি ব্যারোস মানচিত্রে বাকলা একটি দ্বীপ। এই বাকলা বাকাল খাড়ির সঙ্গে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রফেসর করিম মনে করেন।[১] বর্তমানে বাকলা নামে দ্বীপ নেই। সমুদ্র গর্ভে এটি বিলীন হয়ে গেছে। ডি. ব্যারোস মানচিত্রে বাকলা দ্বীপের উত্তরে একটি বড় উপসাগর আছে এবং এর উত্তরে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আরো একটি দ্বীপ আছে। ডি. ব্যারোস এই ৫টি দ্বীপের মধ্যে শুধু বৃহত্তম দ্বীপের নাম দিয়েছেন চকরিয়া দ্বীপ। এছাড়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ ভূখণ্ডকে চকরিয়া নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে চকরিয়া নামে কোনো দ্বীপ নেই। ডি. ব্যারোসের মানচিত্র এবং সিদির বিবরণ অনুযায়ী ব্যারোসের চকরিয়া দ্বীপকে সিদির কাকরদিয়ার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়। প্রফেসর করিম মনে করেন, বিলুপ্ত চকরিয়া দ্বীপ বর্তমান কুতুবদিয়া।[২]

Pierre Vander-এর মানচিত্রে 'Golfo de Rama' (or the gulf of Ramu) কথাটি উল্লেখ আছে। তবে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। Van den Brouck সঠিকভাবে তাঁর মানচিত্রে বাকখালী নদীর তীরে রামু সিটির অবস্থান দেখিয়েছেন। Asiac Descripto Nova Impessis' (1666 AD)-এর রামুর (Rama) অবস্থান আরাকানের উত্তরে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য মানচিত্র, যেমন-D 'Anvile' (Paris, 1751), Nicholas vishera-এর মানচিত্র, ''India orientatis,' Bodlcing Library মানচিত্র এবং ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল অব বেঙ্গলের এর প্রণীত ১৮৫২ সালের মানচিত্রে রামুকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

The London Series of modern map-এর ইন্ডিয়া অংশে মহেশখালীর কাছাকাছি Ramoo-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানচিত্রটি কোম্পানি আমলে তৈরি করা হয়েছে। এ সকল মানচিত্র পাঠে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বঙ্গোপসাগরের উপকূলসহ নদীসমূহের গতিপথের গত চার পাঁচশ বছরে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। Eastern Dist. Gazetteers-এর L.SS. O'Malley বলেন, The Arakan coast, including the district of Ctg. was subjected to considerable seismic disturbance with in the memory of man. Extensive alterations of the level are known to have occurred with in the last 350 years. An interesting proof this is given in 'MOHIT' a Turkish work on navigation in Indian seas written in 1554. In this work the writer alludes to the dangers of navigation amongst the islands on the coast of Ctg. Island which have since disappeared. The great earthquakes of April 2nd 1762 which raised the coast of Foul island 9 feet.

চট্টগ্রামের বহু স্থানের মতো রামু এবং গর্জনিয়া এই দুটি স্থান চট্টগ্রামের মূল দুটি

১। কক্সবাজারের ইতিহাস, আবদুল করিম, পৃঃ ২৩।
২। কক্সবাজারের ইতিহাস, আবদুল করিম, পৃঃ ২৪

পাহাড় অঞ্চলের (Hill range) সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সম্পর্ক L.SS.O Malley বলেন, The prominent characteristic of the tract of country lying to the northeast of the Bay of Bengal is succession of low ranges of hills, running in a south-easterly direction paralled with each other and with the cost line. The first of ranges, which contains the Maiskhal, Cox's Bazar and Taknaf hills raises almost from the sea at the northern extremity of the Maiskhali island of which it from backbone. After traversing the centre of this island it reappears at Cox's Bazar on the east of the Maiskhal channel and forms precipitious cliffs along the whole length of the coast until it terminates in the promptory of Taknaf. The central range forms the Sitakund hill in the north of the district and proceeding south wards is named succesivy the Dyang, Banskhali and Garjenia range.

তিনি আরো বলেন, It will thus be seen that the hills from four long valleys of these the most westerly i.e. that to the weast of the Maiskhal, Cox's Bazar and Teknaf range, is entirely under sea level with exception of Kutubdia and Matarbari island the western portion of Maiskhal island and a narrow strip of littoral in Cox's Bazar and Teknaf. The Second valley, proceeding east words also litterel in character as far as south the Mirsarai and Sitakund thana part of the Chittagong thana north of the Karnaphuli river, a small strip of the Patia thana and Anwara out post lying west of the Diyang hill between the Karnaphuli and Sangu rivers, and south of the Sangu river, the Banskhali sea board and the delta of the Matamuhari river of Chakaria thana and Ramu out post. South of Cox's Bazar the vally changes on Character, being protected from the incurtion of tidal water by the Cox's Bazar and Teknaf hills, and here it forms the fertile Ramu and Palang plains.

উল্লিখিত বিবরণে এটা স্পষ্ট যে, মহেশখালী থেকে শুরু করে কক্সবাজার ও রামু হয়ে একটি পাহাড়ি ধারা (রেঞ্জ) টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের লোকনন্দিত হিমছড়ি পাহাড়ি অঞ্চল এ ধারার যোগাযোগ রক্ষা করেছে। অপর একটি ধারা সীতাকুণ্ড পাহাড় থেকে দক্ষিণ দিকে সরে এসে অধুনা বিলুপ্ত দিয়াং এবং বাঁশখালী হয়ে আরো দক্ষিণে রামুর গর্জনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের বৃক্ষ নিধনের ফলে পাহাড়ের বস্তুগত অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস চট্টগ্রামে এই পাহাড়ি অঞ্চল দেখে বলেছিলেন, A nobel field for a naturalist. এর আরো ১২০ বছর পর মলি বলেছেন, this description still applied to it even after the lapes of 120 years, during which the jungle has yielded to the plough year after year.[১] বিগত প্রায় ১০০

১। Eastern Bengal Dit Gazetteers By L.SS. O' Malley, p. 8.

বছরে এই অবস্থার আরো অনেক দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভূমি প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানের নামেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ এপ্রিল রামুতে আসেন। তাঁর ভ্রমণ ডায়েরি থেকে জানা যায় দক্ষিণে বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব দিকের পাহাড়ি অঞ্চলের কোনো কোনোটি বৃক্ষাবৃত ছিল। এগুলোর মধ্যে বেশ দামি দামি গাছও ছিল। পাশাপাশি আরও কিছু পাহাড় ছিল যেখানে বৃক্ষ ছিল না। এগুলোকে তিনি বালির পাহাড় বলেছেন। রেজু খালের নিকটবর্তী এসব এলাকা সামুদ্রিক বালি দ্বারা গঠিত হয়ে ক্রমান্বয়ে সবুজাভ হয়ে উঠেছে বলে ধারণা করা চলে। তবে বালির পাহাড় এখন একটিও চোখে পড়ে না। হিমছড়ি থেকে ধোয়াপালং হয়ে বাকখালী নদীতে এসে অতঃপর তিনি রামুতে এসে পৌছান। বাকখালী নদীকে তিনি রামু নদী বলে অভিহিত করেছেন।[১] কিন্তু এগুলি বর্তমানে সবুজ বৃক্ষে আচ্ছাদিত। রামুর অন্যতম অরণ্য বললেও একে অত্যুক্তি হবে না।

ভূমি গঠনে ভূস্তর বিন্যাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার থেকে এটা নিশ্চিত যে পাহাড়ি উঁচু ভূমিসহ সমস্ত রামু ভূ-ভাগই সমুদ্র গর্ভ থেকে জেগে উঠেছে। হয়তো কয়েক হাজার বছর লেগেছে বর্তমান অবস্থায় আসতে।

অতীত ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, অতীতে রামুর ভৌগোলিক সীমানা কয়েকবার ছোট-বড় হয়েছে। এক সময় চকরিয়াও রামুর আওতাভুক্ত ছিল। সেটি আরাকানিদের সময়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় কক্সবাজারও রামুর অধীনে ছিল। বিশ শতকের শুরুতে ইংরেজদের রেকর্ডপত্র বা মানচিত্রে রামুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত। রামু নামে কোনো স্থানের নাম নেই (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

২. বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থা

কক্সবাজার হতে রামু ২৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। ২১°-১৭ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২১°৩৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে তার অবস্থান। রামুর উত্তরে চকরিয়া ও কক্সবাজার সদর, দক্ষিণে উখিয়া ও পূর্বে বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও কক্সবাজার সদর। রামুর আয়তন ৩৮৫.০ বর্গকিলোমিটার (১৪৮.৮০ বর্গমাইল)। রামুতে বর্তমানে ৩৯টি মৌজা এবং ৯টি ইউনিয়ন রয়েছে। ইউনিয়নসমূহের নাম : ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, ফতেখাঁরকুল, রাজারকুল, জোয়ারিয়ানালা, দঃ মিঠাছড়ি ও খুনিয়াপালং।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে ভরপুর রামু। এর কোথাও গভীর অরণ্যের বনভূমি, কোথাও কোথাও সবুজ সুদৃশ্য শোভিত পাহাড়, কোথাও কোথাও সমতল, আবার তার তীর ছুঁয়ে আছে বিশাল সাগর। হিমছড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং সমুদ্রের সৈকতে আগত পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। সুউচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে প্রশস্ত বালির চত্বরে বসন ধরে আছে যেন দুর্বিনীত সাগরের ঢেউ। বসনের আঁচলে তার লাল কাঁকড়া ফুল। এই দৃশ্য মনোলোভা।

১। Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798) edited By Willemvan Schendel, University Press Limited, p. 58.

বনভূমিতে আছে নানা জাতের জংলি এবং উৎকৃষ্ট মানের কাঠের গাছ। এগুলোর মধ্যে সেগুন, গর্জন, চম্পাফুল এবং আরো নাম না জানা হাজারও জাতের গাছ। এগুলো প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি মূল্যবান অর্থকরী সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। এসব বন জঙ্গলে নানা প্রজাতির বন্য পশুপাখি এবং জীবজন্তু বসবাস করে। হাতি, ভাল্লুক, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী মাঝে মধ্যে মানুষের জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্য হাতি, শূকর প্রভৃতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। হরিণ প্রভৃতির বন্যপ্রাণী শিকারিদের লক্ষ্য বস্তু। বন মোরগ ছাড়াও ময়ূর, মথুরা, কয়য়া প্রভৃতি বন্য পাখি এখানকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এছাড়াও নাম না জানা বহু প্রজাতির পশু-পাখি রামুর বনাঞ্চলে বসবাস করে। অভয়ারণ্য ঘোষণা করে তাই এখানে সহজেই ফরেস্ট জো সৃষ্টি করা যায়।

পর্তুগিজ ধর্ম প্রচারক সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে রামুতে আসেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী ৭ জুলাই বৃষ্টির দিনে আচ্ছাদিত নৌকাযোগে গর্জনিয়া পৌছেন। সেখানে তাঁর জন্য সুসজ্জিত হস্তী রাখার কথা ছিল। ঐ দিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। ৮ জুলাই সুসজ্জিত হাতিতে করে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। এই সময় প্রায় ষাঁড়ের সমান একটি মস্তবড় বাঘ একজন লোককে ধরে নিয়ে যায়। লোকটিকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত। ম্যানরিকের বর্ণনা অনুযায়ী বনের রাস্তা এতবেশি বিপদসংকুল ছিল যে, এরা হাতে বন্দুক উঁচিয়ে মাঝে মাঝে ফাঁকা গুলি করে বন্যপশুদের রাস্তা থেকে তাড়িয়ে পথ পাড়ি দিয়েছেন।

পাহাড়ের পাশাপাশি পাহাড় আর সমতল ভূমি বুক চিরে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে বাঁকখালী নদী। বাঁকখালী নদী আরাকান পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি থানার উপর দিয়ে রামুতে প্রবেশ করে। রামুর কয়েকটি ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহেশখালী চ্যানেলে গিয়ে পড়ে। এই নদীর মোহনায় কক্সবাজার শহর অবস্থিত। এই নদীতে বর্ষাকালে খরস্রোত প্রবাহিত হয়। পানিতে থাকে নানা জাতের মাছ। শুধু মৌসুমে বোরো ফসল এবং রবি শস্য উৎপাদনের জন্যে এই নদীর পানি একমাত্র সম্বল। কৃষকরা ছোটখাটো বাঁধ দিয়ে সেচের মাধ্যমে নদীর দুই পারে প্রচুর ফসল ফলিয়ে থাকে। বনভূমির তুলনায় আবাদযোগ্য জমি কম থাকলেও এখানে উদ্বৃত্ত ফসল ফলে।

আবহাওয়া : কক্সবাজার কর্কটক্রান্তি রেখার কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। বিষুবীয় অঞ্চলে সমস্ত বাংলাদেশ অবস্থিত। তাই বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। তবে কক্সবাজারের আবহাওয়া সমগ্র বাংলাদেশের আবহাওয়ার থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। একদিকে বনাঞ্চল এবং অন্যদিকে সমুদ্র থাকায় এখানকার আবহাওয়ায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত গরম অনুভূত হয়। বিশেষ করে কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, হিমছড়ি উপকূলবর্তী এলাকায় সমুদ্র থেকে প্রতিনিয়ত আসা নির্মল বায়ু পরিবেশকে উষ্ণ করে রাখে। এই বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তবে রামুর বিস্তীর্ণ এলাকা পাহাড় এবং বনাঞ্চলে আবৃত বিধায় এখানকার আবহাওয়ায় বড় ধরনের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। এখানে স্বাভাবিক শীত এবং গরম দুই-ই অনুভূত হয়।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কক্সবাজারে ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে

কম থাকে। এ সময় গড় তাপমাত্রার পরিমাণ ৭৮.৮০° ফারেনহাইট। এপ্রিল মাসে অধিক তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। ৮৮.৮° ফারেনহাইট এ সময়কার তাপমাত্রা। তবে শীত এবং গ্রীষ্মে এই তাপমাত্রার ওঠানামা আছে। ১৮৮৮ সালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০১° ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪৫° ফারেনহাইট। বর্তমানে বার্ষিক তাপমাত্রা গড় ৮৪° ফারেনহাইট। পাহাড়ি অঞ্চল বিধায় জেলার সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ১৯০০ সালে ১৩২.০১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। তার মধ্যে নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২১.৪৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৪ ইঞ্চি। বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়ায় এবং প্রতিনিয়ত অসংখ্য যানবাহন ও পর্যটকদের কক্সবাজারে অবারিত আগমন এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে যে কোনো ভয়াবহ প্রাকৃতিক পরিবর্তন হতে পারে।

রামুর প্রায় ১০ মাইল এলাকা জুড়ে সমুদ্র উপকূল। এই সমুদ্র উপকূলের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সবটাই সুদৃশ্য এবং ভ্রমণ উপযোগী বালির চর। সমুদ্রের পানি এবং সুউচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে বালির আর এক সমুদ্র। এমনটি খুব কমই দেখা যায়। সুউচ্চ পাহাড় ঘন জঙ্গলে আবৃত। সমুদ্রের গা ঘেঁষে অসংখ্য ঝাউগাছ। নিচে বালির শক্ত আস্তরণ সমুদ্রের ঢেউ এসে এতে আছড়ে পড়ে। হিমছড়ি থেকে শুরু করে পেচার দ্বীপ পর্যন্ত সবটাই এরকম সৌন্দর্যের আকর। হিমছড়ির ঝরনা লোকনন্দিত। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক এই ঝরনা দেখতে আসে। তবে ঝরনাটি তার পূর্বের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। এটি এখন মৃতপ্রায়। এই ঝরনার আরো পশ্চিম দিকে ছোট ছোট ঝরনার সূচনা লক্ষ করার মতো।

সমুদ্রে বহু প্রজাতির মাছ ও জীবজন্তু বসবাস করে। মাঝে মাঝে এসবের এ অঞ্চলে দেখা মেলে। মৃত অবস্থায় প্রকাণ্ড বড় তিমি মাছ উপকূলে এসে ঠেকে। মাঝে মধ্যে বড় বড় কচ্ছপ ঢেউয়ের আঘাতে উপকূলে এসে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় লোকজন সমুদ্রের পানি থেকে অত্যন্ত মূল্যবান চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করে বিক্রি করে। এ ছাড়া হাঙ্গরসহ বহু প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ উপকূলীয় জেলেদের হাতে ধরা পড়ে। রূপচাঁদা, ইলিশ, পোয়া, লাক্ষা, লটিয়া, ছুরিমাছ, মোকারেল (স্থানীয় নাম মাইটরা), সাকোজ মাছ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

রামুর পাহাড়ি বনাঞ্চলে বিশেষ করে গর্জনিয়া, ঈদগড়, খুনিয়াপালং, রাজারকুল প্রভৃতি এলাকায় বন্যহাতি পাওয়া যায়। অতীতে পাকিস্তান আমলে বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে খেদার সাহায্যে হাতি ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে খেদা স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২৫ থেকে ৩০ ফুট ব্যাসের খেদাতে একটি প্রধান গেট থাকে। যার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট এবং প্রস্থ ৮ ফুট। যেখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস, বাঁশ ও পাতা থাকে এমন জায়গায় এই গেট স্থাপন করা হয়। খেদার চতুপার্শ্বে ১৮ থেকে ২০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৭ ইঞ্চি ব্যাসের খুঁটি তিন সারিতে মাটিতে সমান্তরালভাবে পোতা হয়। এভাবে খেদা তৈরির পর ৩৫ ফুট হতে ৪০ ফুট দীর্ঘ একটি ঝুলন্ত দরজা বড় খুঁটির সঙ্গে আটকে রাখা হয়। এর পরে গেটে দুই প্রান্তে ছোট ছোট খুঁটি দিয়ে দীর্ঘ এক ফার্ল

প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরি করা হয়। পরে প্রতিরক্ষা দেওয়ালের দুই পাশে ৫০ গজ অন্ত র অন্তর আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা থাকে। হাতি খেদার ভিতরে প্রবেশ করার ১০/১৫ সেকেন্ডের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। গেটে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য একজন লোক সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। ব্রিটিশ আমলে রামু থানার ঈদগড় ও গর্জনিয়াতে খেদার সাহায্যে অনেক হাতি ধরা হতো। অতীতে রামুতে হাতি ছাড়াও গয়াল (বনগরু) ধরবার জন্য স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হতো। এ অঞ্চলে এক সময় প্রচুর বাঘও পাওয়া যেত। কিছু দিন আগেও ঈদগড়ের রাস্তায় বনের বানরদের খেলা করতে দেখা গেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে। মথুরা এবং কোয়েল (কয়া) পূর্বের তুলনায় কম হলেও পাওয়া যায়। হরিণ, বনমোরগ প্রভৃতি মাঝে মধ্যে দেখা যায়। বনজ সম্পদের পাশাপাশি খনিজ তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ অঞ্চলে কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। সমুদ্রের বালি থেকে আরো অনেক খনিজ সম্পদ আহরণ করা যেতে পারে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বিধায় এখানে প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। বিশেষ করে সামুদ্রিক ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ফলে প্রায় প্রতি বছরই জীবন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস, ১৭৯৫ সালে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়, ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড হারিকেন, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রলয় জীবন, ঘরবাড়ি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। ১৮৯৭ সালে জড় ও জলোচ্ছ্বাসে এখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনুরূপভাবে ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯৪৬, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬৩, ১৯৬৯ এবং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নৃতত্ত্ব ও প্রাচীনকালের ইতিহাস

১. নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

মানুষের ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও তার কৃষ্টি এবং সভ্যতার নিদর্শন প্রাকৃতিক কারণে খুব একটা সংরক্ষণ করা যায় নাই। বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে সভ্যতার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে দূর ইতিহাসের উপাদান খুব একটা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহে এই নিদর্শন নেই বললেই চলে। প্রাকৃতিক কারণ তো বটেই, এখানকার কাষ্ঠ নির্মিত বাড়িঘর অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত হাতিয়ার, বিভিন্ন দেবতার বিগ্রহ প্রভৃতি থেকে প্রাচীনকালের মানুষের বসবাস চিহ্নিত করা হয়।

প্রাকৃতিক, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, কাচার, মিজোরাম, ত্রিপুরা, সিলেট, চট্টগ্রাম এবং আরাকান অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর মধ্যে একক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রস্তর যুগের হাতিয়ারসমূহে এই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সীতাকুণ্ড পাহাড়ে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এক খণ্ড কাঠের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সৌন্দর্য খচিত তরবারির মতো। পণ্ডিতরা মনে করেন, এটি খ্রিস্ট জন্মের ২,০০০ বৎসর আগের তৈরী। এই ধরনের হাতিয়ার যারা ব্যবহার করেছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, কাচার এবং আরাকান অঞ্চলে বসবাসকারীদের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এরা কারা? জবাব পাওয়া খুব কঠিন। শুধু আন্দাজ করা যায়। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, অস্ট্রো এশিয়াটিক আরাকানি এবং সিনো তিব্বতিরা আরাকান চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের একাংশ।[১] কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন আরাকানিরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক তো নয়ই, চৈনিকও নয়, তিব্বতিরা এই মানবগোষ্ঠীর পরিবারভুক্ত হতে পারে। সাধারণত মনে করা হয় যে, Austroloid অথবা Proto Austroloid জনগোষ্ঠী এতদঞ্চলের আদিবাসিন্দা ছিলেন। এদের বংশধরদের এখনো দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোচীন, সলোমান দ্বীপপুঞ্জ, পিজি, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গভীর অরণ্য ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় বসবাস করতে দেখা যায়।

আরাকানি উপাখ্যান থেকে প্রাচীনকালের আরাকান সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী লোকদের পরিচয় জানা যায়। স্যার এ. পি. ফেয়ার এ সম্পর্কে বলেছেন, মিয়ানমার (বার্মা) আরাকানে প্রবেশকালে Bee-Loos জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সেখানে ছিল। দেশটির সূচনাকালে পালি নাম ছিল রেকখাইক (Rek Khaik) এবং বর্তমান Rakhaing. বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকরা আরাকানে প্রবেশকালেও এদের দেখতে পেয়েছেন। এরা মানুষখেকো রাক্ষস ছিল। পেগানের আনন্দ মন্দিরে Bee-Loos বা রাক্ষসের মূর্তি ছিল।

---

১. Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters (1950) p. 232.

চতুর্দশ শতকের একজন লেখকের লেখায় পাওয়া যায় যে, আরাকানের কিছু কিছু লোক মানুষের মাংস খেত।[১] বার্মার উপাখ্যান থেকে জানা যায় মুন জাতি আরাকান ও বার্মায় বসবাসকারী আদিবাসিন্দাদের মধ্যে বহু শতাব্দী যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করেছে। পরবর্তীকালে খমার (Khamer) উপজাতিদের মধ্য বার্মার সমতল ভূমিতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এরা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব গ্রন্থে ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেন, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোকজন বহু পরে ভারতবর্ষে আসে। জন প্রবাহে তাদের প্রভাব নেই। এই জনগোষ্ঠী দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হয়ে ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয়, উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রগামী দেশ ও দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। পরে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, মাগা, বোদো বা সেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর এদের একটি ধারা ধরা পড়ে। ব্রহ্মদেশে যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় এরা খর্বকায়, তাদের মুণ্ডাকৃতি গোল দীর্ঘ নয়, চামড়ার রঙ আরো ঘোর। আসামি মোঙ্গলীয়দের সঙ্গে এদের কোনো নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মদেশীয় গোল মুন্ড মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরা জেলার চাকমা, ত্রিপুরা, আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগদের। তবে বাঙালির রক্ত প্রবাহে এদের প্রভাব নেই।[২]

সঠিক বলা কঠিন যে, এতদঞ্চলে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা কবে এসেছিল। সম্ভবত খ্রিস্ট জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্বে এরা চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, লুসায়ী এবং আরাকান পার্বত্য অঞ্চলে অধিবাসী হয়ে থাকবে।[৩] তিব্বতি লেখক লামা তারানাথের মতে, আদিকালে চট্টগ্রাম বঙ্গ এবং কুকিল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪] চট্টগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে কুকিদের বসবাস ছিল। কুকিল্যান্ডের কথা রাজমালায় উল্লেখ আছে। হ্যামিলটন, ডব্লিউ. ডব্লিউ. হানটার প্রমুখ লেখকরাও কুকিদের সম্পর্কে বিস্তর লেখাজোখা করেছেন। সম্রাট অশোকের সময়ও কুকিল্যান্ডের অস্তিত্ব ছিল।[৫]

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এতদঞ্চলের বসবাসকারী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোকদের ভাষার মধ্যে চীন, তিব্বতি উভয় অঞ্চলের লোকদের ভাষাতাত্ত্বিক মিল লক্ষ করা যায়। যেমন– চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, মুরং প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা পানিকে 'Tui' বলে থাকে, তিব্বতি ভাষায় 'Chu' এবং চীনা ভাষায় 'chui' বা 'chu' বলা হয়। অনুরূপভাবে চাকমা এবং মগরা নদীকে 'Khyoung' আরাকানিরা বলেন Shyoung চীনা ভাষায় বলা হয় 'Kiang'. প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কারণে বাংলাদেশে এসেছিল নিগ্রো (Negrito), আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid), মঙ্গোলীয়– (ক) Palace-Mongoilod (খ) Tibeto-Mongoliod দ্রাবিড় (ক) Palaco-Mediterrancean (খ) Mediterranean, আলপাইনীয় (Alpionid) আর্মেনীয় (Armenoid), দিনারীয়

১. History of India as told by its own Historians, p. 73.

২. ড. নীহার রঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস-আদিপর্ব পৃষ্ঠা-৩৭।

৩. A History of Ctg; Dr S.B. Qanungo, p-36.

৪. S. C. Das "Antiguities of Chittagong" J A S B IXVII (1898) 20ff

৫. Indian Historical Quarterly, 1951, P. 246

(Dinarie), নর্ডীয় (Nordie), আর্য (Aryan) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর রক্ত ধারার লোকজন।

নিগ্রো, আদি অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড়রা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লোক। এরা আরব ও ইরানের মধ্য দিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এই তিন গোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। আর্য জনগোষ্ঠীর প্রথম দল অন্যান্য দেশ হয়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশে আসে। দ্বিতীয় দল উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করে।

নৃতত্ত্ববিদ রিজলি মনে করেন মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী এবং দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর সাংকর্ষে বাঙালির উৎপত্তি। মঙ্গোলীয়দের মাথা প্রশস্ত। বাঙালির প্রশস্ত মুণ্ডের ধারা মঙ্গোলীয় শোণিতের দান। অন্যদিকে দ্রাবিড়রা কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায়। বাঙালির শারীরিক গঠনের সাথে তার মিল আছে। তবে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা রিজলির এই মত সমর্থন করেন না। এরা মনে করেন, নিম্নবর্ণের বাঙালি এবং বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে জনগোষ্ঠীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি এরা হচ্ছে আদি অস্ট্রেলীয় (Proto Austroloid)। এই জনগোষ্ঠী মধ্য ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত, সিংহল থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আদি অস্ট্রেলীয়দের মতোই দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতের আদি অধিবাসীরা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ডু, প্রশস্ত নাক ও তাম্র কেশ বিশিষ্ট। খুব নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীর রক্তধারা এবং উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে আদি নর্ডিক আর্য রক্ত ধারা প্রবাহিত।

আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিক ভাষার নাম, কোনো জনগোষ্ঠীর নাম নয়। ভুলবশত কেউ কেউ অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর কথা বলে থাকেন। বাঙালির অস্ট্রিক ভাষার উত্তরাধিকার বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দ থেকে প্রমাণিত হয়। জৈনদের আচারাঙ্গ সূত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাবীর (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) যখন পথহীন রাঢ় বঙ্গভূমি ও সুরভ ভূমিতে প্রচারোদ্দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এইসব দেশের অধিবাসীরা তাকে আক্রমণ করেছিল। কতগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাকে কামড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু কেউই এই কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে দিতে অগ্রসর হয়নি। বরং লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুকে আঘাত করতে আরম্ভ করে এবং ছুঁ ছুঁ বলে চিৎকার করে তাকে কামড়াবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলিয়ে দেয়। বাংলাদেশে এখনও লোকেরা কুকুর ডাকবার সময় চু চু বা তু তু বলে। এই তথ্য থেকে বাগচী মহাশয় মনে করেন বাংলা চু চু বা তু তু মূলত অস্ট্রিক প্রতিশব্দ হতেই গৃহীত।[১] রামুর বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যেও প্রতিশব্দ দুটোর প্রচলন লক্ষ করা যায়।

২. প্রাচীনকালের ইতিহাস : আরাকানি শাসন

প্রাচীনকাল থেকেই রামুসহ গোটা চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। অতি প্রাচীনকালে আরাকান রাজ্য চন্দ্রপূর্ব বংশের রাজারা শাসন করতেন। স্থানীয় রাখাইন উপাখ্যান মতে প্রাচীনকাল থেকে তিনটি ধান্যবতী রাজবংশ আরাকান শাসন করেছেন। ১ম ধান্যবতী রাজবংশের রাজারা খ্রিঃপূর্ব ৩৩২৫ থেকে খ্রিঃপূর্ব ১৫০৭ পর্যন্ত আরাকান

১. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব*, পৃষ্ঠা-৪৫

শাসন করেন। এই সময় ৫৭ জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। ২য় পর্যায়ে ধান্যবতী রাজবংশের ২৮ জন রাজা খ্রিঃপূর্ব ১৫০৭ থেকে খ্রিঃ পূর্ব ৫৮০ পর্যন্ত এবং ৩য় পর্যায়ে ধান্যবতী রাজবংশের ২৫ জন রাজা খ্রিঃ পূর্ব ৫৮০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন।[১]

অনেক রাখাইন ঐতিহাসিক মনে করেন, জীবিতকালে গৌতম বুদ্ধ ৫৫ বছর বয়সে খ্রিঃ পূর্ব ৫৫৪ অব্দে রাখাইন রাজা আরাকানে এসেছিলেন। ঐ সময় আরাকান শাসন করতেন চান্দসুরিয়া (Chandfa Thuriya)। চান্দসুরিয়ার রাজত্বকাল খ্রিঃপূর্ব ৫৮০ থেকে খ্রিঃপূর্ব ৫২৮ অব্দ পর্যন্ত ছিল।[২] ধান্যবতী রাজবংশের রাজা চান্দসুরিয়ার রাজধানীতে এক ধর্ম সম্মেলনে সেবক আনন্দকে গৌতম বুদ্ধ বলেন, হে আনন্দ, ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্র পূর্ব পাশে পাহাড়ের উপর আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন এর নাম হবে রাংউ। রামু নামের উৎপত্তি রাংউ (যার অর্থ বক্ষাস্থি) থেকে বলে এখানে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

রামুর রামকোর্ট নামক স্থানে পাহাড়ের ওপর একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। এই বৌদ্ধ মন্দিরে সংরক্ষিত বুদ্ধমূর্তিটি গৌতম বুদ্ধের বক্ষাস্থি সংবলিত বলে ধারণা করা হয়। শ্রীলঙ্কা থেকে প্রত্যাগত জগৎ চন্দ্র মহাস্থবির রামকোর্ট সধাতুক বুদ্ধমূর্তি এবং তৎসংলগ্ন বিহারটি সম্রাট অশোকের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে বলে দাবি করেন। সম্রাট অশোক সারা বিশ্বে ৮৪ হাজার চৈত্য স্থাপন করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে রামুচৈত্য একটি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, বুদ্ধ আরাকানের ৪টি স্থানে ধর্মচক্র স্থাপন করেছিলেন। তিনি আরাকান থেকে হাইদগাঁও গ্রামে (পটিয়া) গমন করেন। সেখানে চক্রশালা নামক স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। এছাড়া তিনি চকরিয়াও গিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। এ বিষয়ে ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেন, According to the local Buddhist tradition, Gautama Buddha travelled through the district (Ctg. preached semons at several places and established Dharmachakras or the wheels of Dharma in a number of places such as Chakaria, Chakrasala, Hastigrama (Hiadgaon), Chandranatha, Mahamuni, Shakyapura (Shakpura) etc. which afterwards became Buddhist holy place.[৩] উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে রামুর কথা উল্লেখ না থাকলেও রামু তখনকার আঙ্গিকে বৌদ্ধ কৃষ্টি-স্থল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গৌতম বুদ্ধের রামুতে পদার্পণ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। সংযুক্ত নিকার গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধদেব একবার সুমত ভূমির অন্তর্গত শেতক নগরে এসেছিলেন এবং সেখানে কিছু দিন বসবাস করেছিলেন। তিনি ৬ মাস পুন্ড্রবর্ধন

১. Tun Shwe Khaing : Rakhaing Nansak Morsk Tha-hmaing (in Rakhaing) p-8 ed. 1970, Rangoon, Burma.

২. Tun Shwe Khaing : Rakhaing Mahamuni Tha-hmaing (in Rakhaing) p-14 ed 13rd, 1991, Rangoon, Burma.

৩. History of Chittagong, vol. 1 p-81

নগরে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন বলে বোধিসত্তাতবধান কল্পলতা গ্রন্থ থেকে জানা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ তার বিবরণে বলেছেন, বুদ্ধ সমতট, পুন্ড্র বর্ধন ও কর্ণসুবর্ণে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, এতগুলি উল্লেখ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বাংলাদেশে এসেছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয় না। তিনি পূর্ব দিকে দক্ষিণ বিহারের সীমা অতিক্রম করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই।[১] তবে তিনি মনে করেন, গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশে আসুন বা নাই আসুন অশোকের ধর্ম প্রচারের পূর্বেই বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম এসেছিল। খ্রিঃপূর্ব ২য় শতকের পুন্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। গুপ্তযুগে (৩য়-৪র্থ শতক) চীনের বৌদ্ধ শ্রমণরা ব্যাপক পরিমাণে বাংলাদেশে এসেছিল গুনাইঘর লিপি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ৭ম শতকে চীনা শ্রমণ য়ুয়ান চোয়াঙ বাংলাদেশে আসেন। তিনি সম্ভবত ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। ৭ম শতকে শশাঙ্কের সময় নালান্দার প্রধান আচার্য মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের জন্ম ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি য়ুয়ান চোয়াঙের গুরু ছিলেন।

৩য় ধান্যবতী রাজবংশের রাজাদের সময় আরাকান এবং রামুসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এই সময় অশোকের নির্দেশে রামুতে চৈত্য স্থাপন অযৌক্তিক নয়। এটি মেনে নিলে রামুর প্রাচীনত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিব্বতি লেখক লামা তারানাথ রামুকে রম্যভূমি এবং বৌদ্ধ কৃষ্টির অন্যতম স্থল বলে অভিহিত করেছেন।

আরাকানের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় টলেমির ভৌগোলিক বিবরণে। টলেমি প্রাচীন গ্রিসের একজন বিখ্যাত ভূগোলবিদ। তাঁর সময় আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৫ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ভূগোল ১৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। টলেমির ভৌগোলিক বিবরণে আরাকানকে 'আরগরী' বলা হয়েছে। রামুকে বলা হয়েছে Barakoura। রামুকে তখন ক্রয়-বিক্রয় স্থল (a mart) বলে বিবৃত করা হয়েছে। ঐ সময় আরাকানের রাজা ছিলেন মৌরীয় বংশের রাজা চন্দ্রসূর্য (চান্দসুরিয়া)। চান্দসুরিয়া অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তাঁর সময় আরাকান রাজ্যের বিস্তৃতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। তিনি মগধ, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের আরো অনেক জায়গা দখল করে নেন।

লামা তারানাথের বিবরণে প্রাক পাল যুগের অন্য তথ্য জানা যায়। পাল যুগের পূর্বে একটি শক্তিশালী চন্দ্র বংশ চট্টগ্রামসহ আরাকান শাসন করে। তাঁর বিবরণ অনুসারে রাজা বলচন্দ্র তাঁর রাজ্যের রাজধানী চট্টগ্রামে স্থাপন করেন। সেখান থেকে আরাকান এবং পূর্ববঙ্গ শাসন করেন।[২] আরাকানের সিথাং টেম্পল শিলালিপিতে রাজা বলচন্দ্রকে শ্রী ধর্মরাজানুজ ভামসা (Shri Dermarajanuja Vemsa) বলা হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই বলচন্দ্রকে তারানাথের বলচন্দ্র বলে সনাক্ত করেছেন। এই বলচন্দ্র জনপ্রিয় গীতিকার গোপীচন্দ্রের গানের নায়ক রাজা গোপীচন্দ্রের পিতামহ।

আরাকানের শিলালিপিতে চন্দ্রবংশের বিবরণ পাওয়া যায়। এই চন্দ্রবংশ ৩৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরাকান শাসন করেন। এই বংশের রাজাদের নাম নিম্নরূপ :

১. *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব*, পৃঃ ৪৯৪।

২. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, LXII (1898), 21-22.

দেবেনচন্দ্র	৩৭০-৪২৫	খ্রিঃ	৫৫ বছর
রাজচন্দ্র	৪২৫-৪৪৫	”	২০ ”
কালচন্দ্র	৪৪৫-৪৫৪	”	৯ ”
দেবচন্দ্র	৪৫৪-৪৭৬	”	২২ ”
ভানচন্দ্র	৪৭৬-৪৮৩	”	৭ ”
চন্দ্রবন্ধু	৪৮৩-৪৮৯	”	৬ ”
ভূমিচন্দ্র	৪৮৯-৪৯৬	”	৭ ”
ভূমিতচন্দ্র	৪৯৬-৫২০	”	২৪
নীতিচন্দ্র	৫২০-৫৭৫	”	৫৫ ”
বীর বা বীর্যচন্দ্র	৫৭৫-৫৭৮	”	৩ ”
প্রীতিচন্দ্র	৫৭৮-৫৯০	”	১২ ”
পৃথ্বীচন্দ্র	৫৯০-৫৯৭	”	৭ ”
ধৃচিচন্দ্র	৫৯৭-৬০০	”	৩ ”

এই চন্দ্র রাজাদের পরে আরও একটি চন্দ্র রাজবংশ আরাকানে রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজা আনন্দচন্দ্র। তিনি ভেসারিতে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন এবং স্তম্ভের গায়ে একখানি সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ করেন। বর্তমানে স্তম্ভটি ম্রোহং-এর সীতাউঙ্গ প্যাগোডায় সংরক্ষিত আছে। এই সংস্কৃত লিপিতে উপরিউক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজাদের নাম পাওয়া যায়। প্রথমে এ. পি. ফেয়ার এর পাঠোদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁর পাঠ ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রফেসর জনস্টোন পরে তা শুদ্ধ করেন এবং উপরোক্ত তালিকা জনস্টোনের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।[১] তাদের রাজ্যের সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই। এদিকে বাংলাদেশের পণ্ডিকেরা রাজ্যেও চন্দ্রবংশের বিবরণ পাওয়া যায়। বলচন্দ্র বা গোপীচন্দ্ররা এই বংশের রাজা বলে মনে হয়।

তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের পর পালদের অভ্যুদয় ঘটে। পালদের প্রথম রাজা গোপালের সাম্রাজ্য প্রথমে খুব ছোট ছিল। তারানাথ মনে করেন পালদের মূল সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে সম্ভবত চট্টগ্রামে অবস্থিত ছিল। কবি সন্ধাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম' কাব্যের মর্মানুসারে ধর্মপালের রাজ্য সমুদ্রকূলদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল। দেবপালের মুনগার কাব্যলিপির তথ্যানুযায়ী গোপালের রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল the earth as far as the sea.[২] গোয়ালিয়রের শিলালিপি থেকে জানা যায় ধর্মপালকে বঙ্গাধিপতি বলা হতো। ধর্মপাল পূর্ববঙ্গের নরপতি ছিলেন। এ সম্পর্কে ৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত ইরানি লেখক খুদাত-উল-আলমের লেখায় উল্লেখযোগ্য তথ্য রয়েছে।

১. E. H. Johnston, "Some Senaskrit Inscriptions of Arakan" in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. XI, part II, 1946

২। E. Tigrothia Indica XVIII, 304 f.

৩. রাহ্মি রাজ্য

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের সমুদ্র উপকূলে পাল রাজ্যের অবস্থান ছিল বলে কতিপয় সমসাময়িক আরব বণিকের বিবরণে পাওয়া যায়। এরা এই স্থানটিকে রাহ্মি (Rahmi) বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে রাহ্মি বেশ উৎসাহের বিষয়। আরব লেখকরা রাহ্মি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। ড. হোদিয়ালা বলেছেন, It seems to me that Rahma which is said by Masudi to have been the title or name of the king as well as of his kingdom, is to be explained by the original writing to which Sulaiman and Masudi were indebted for their knowledge s.... This phrase is equivocal and may mean, "the kingdom of Dharma" and also the king Dharma. The 'dal' was subsequently supposed to be a 're' a 'wav'. The phrase was thus misread as...Kingdom of Rahmi.[১] হোদিয়ালার রাহ্মি সম্পর্কিত বিবরণ আধুনিক লেখকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য লেখক এলিয়ট (Elliot) এবং ডাউসন (Dowson) সঠিকভাবে রাহ্মির অবস্থান নির্ণয় করেছেন। তাদের মতে রাহ্মি on the Bay of Bengal about Dhaka and Arakan.[২] আল মাসুদী বলেন 'The kingdom of Rahma extendy both along the sea and the continents.[৩] তার বিবরণ থেকে রাহ্মির নৌশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইবনে খুরদাদ (Iban Khuradadbhe) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, অন্য রাজাদের সঙ্গে রাহ্মিরাজ জাহাজযোগে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এতে ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। আরব লেখকরা বিশেষভাবে বলেছেন যে, রাহ্মি রাজ্যের সীমান্তে 'সমন্দর' (Sumandar) নামে এক সমুদ্র বন্দর ছিল। ড. আবদুল করিম সমন্দরকে চট্টগ্রাম বলে শনাক্ত করেছেন।[৪]

৪. প্রাচীন রাহ্মি কি বর্তমান রামু?

স্যার এ. পি. ফেয়ার রাহ্মির সঙ্গে রামুর সম্পর্ক আছে বলে অভিমত পোষণ করেন। তিনি History of Burma গ্রন্থে বলেছেন, The name Ramu is applied to the country of Chittagong in a general description of Bengal which the name of Ruhmi, Rahma or Rahmya given to a kingdom on the sea coast of the Bay of Bengal by the Arabian voyagers in the 9th and 10th centuries of the Christian era. There is now a village called Ramu in the southern part of Chittagong district.. It probably represents the name by which the territory in question was known to the Arabs. ড. আর. সি. মজুমদার স্যার এ. পি. ফেয়ারের অভিমতকে সমর্থন করেছেন এবং 'রাহ্মি' থেকেই যে 'রামু' এসেছে– তা প্রতিষ্ঠিত

১। S H Hodivala, Studies in Indo Muslim History, p. 5.
২। History of India as told by its own Historians, ed; H. M. Elliot and J Dowson p. 361
৩। Ibid, p. 25.
৪। Journal of Asiatic Society of Pakistan, VIII (1956) 13-24

করতে চেয়েছেন।[১] ড. এ. রহিম তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, The name Rahmi, traces its origin from Ramu, a place in Cox's Bazar in the southern part of the Chittagong district.[২]

ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, পনের শতকের পূর্বে রামুর গুরুত্ব এতটা ছিল না। এছাড়া এটি এত ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল যে, অবস্থাদৃষ্টে আরব লেখকদের বর্ণিত সামরিক শক্তি তার থাকার কথা নয়। তবু তিনি মনে করেন, In fact the description of the kingdom of Rahmi of the Arab writers hardly correspond to the principality of Ramu.[৩] রাহমি বা রুহমির সঙ্গে রামুর কোনো সম্পর্কে থাকতে পারে এ কথা ড. আবদুল করিম মোটেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, কোনো কোনো ঐতিহাসিক রামু, তারানাথের রম্ম (বা রম্য) এবং আরব ভৌগোলিকদের 'রুহমি'কে অভিন্ন মনে করেন। এই সূত্র অবলম্বনে এঁরা বাংলার পাল রাজবংশের উৎপত্তি রামু অঞ্চলেই নির্দেশ করেন। যেহেতু রামু সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, সেহেতু এই ঐতিহাসিকরা পালদের বর্ণিত তাদের সমুদ্রকূল উদ্ভূত আখ্যারও যুক্তিসঙ্গত (?) ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। নামের ধ্বনিগত বিচার করলে রুহমি, রামু এবং রম্ম শব্দত্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে বৈকি। কিন্তু মনে হয় আধুনিক পণ্ডিতেরা ঐতিহাসিক তথ্যের বদলে নামের সামঞ্জস্যের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন। এমন কোনো শক্তিশালী রাজা যিনি একই সঙ্গে জুর্জ ও বলহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, যার অধীনে পঞ্চাশ হাজার হাতি ছিল এবং যার সৈন্য বাহিনীতে দশ হাজার লোক শুধু ধোলাই কাজে নিযুক্ত ছিল—আদৌ রামু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নাই। তাছাড়া ঐতিহাসিকেরা জুর্জকে দাক্ষিণাত্যের গুর্জর প্রতিহার এবং বলহারকে রাষ্ট্রকুট রাজার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। সুতরাং ভৌগোলিক বিচারেও তাদের বিরুদ্ধে রামু রাজ্যের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। রামু বা দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে পাল রাজাদের আধিপত্য ছিল কি-না তাও সন্দেহের ব্যাপার। পাল রাজাদের কোনো তাম্রলিপি বা অন্য কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গামের পূর্ব বা দক্ষিণ- এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং রুহমির সঙ্গে রামুর পরিচিতি দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। রুহমি রাজ্যের সম্পর্কে আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে যে বাংলাদেশের সম্পর্কে প্রযোজ্য সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। হাতি, অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম সুতি কাপড় (যা মসলিনের সঙ্গে তুলনীয়), গণ্ডার (পরবর্তী ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের বর্ণিত ইউনিয়করণ) এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত কড়ি ইত্যাদি সকল সূত্রই প্রমাণ করে যে, রুহমি রাজ্য বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ-দীন সিরাজ, ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং ইংরেজ পরিব্রাজক টমাস বউরীর Countries Round the Bay of Bengal ইত্যাদিতেও বাংলাদেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠে। মাসুদী বলেছেন যে, "রুহমি রাজ্য সমুদ্র ও অন্তবর্তী ভূ-ভাগ উভয় দিকেই বিস্তৃত ছিল। অন্তবর্তী ভূ-ভাগের দিকে কামন রাজ্য এর সীমান্তে অবস্থিত। কামন এবং কামরূপ একই, মাসুদীর এই তথ্যও রুহমিকে বাংলার সঙ্গে

১। Indian Historical Quarterly XVI (1940) 232

২। A Rahim, Social ad Cultural History of Bengal, p. 41.

৩। A History of Chittagong, p 77.

অভিন্ন প্রমাণ করে।

উপরিউক্ত সকল সূত্রই হোদিয়ালার বক্তব্যকে সমর্থন করে। তাঁর মতে ধর্মপাল (মালিক-উদ-ধরহমি) সোলায়মানের সিলসিলা-ত-উত-তওয়ারিখে রুহমি রাজ্যে (মালিক উর-রুহমি) পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ 'দাল'-এর স্থলে 'রে' হওয়ায় এই পাঠ বিভ্রান্তি হয়েছে। আবার আল-ইদ্রিসির সাক্ষ্য মতো এও হতে পারে যে এই শব্দটি 'রুহমি' বা 'ধরহমি' রাজ্য ও রাজা উভয়ের নাম বুঝায়। পাল রাজাদের আমরা পাল বা পাল বংশের লোক রূপে অভিহিত করি, কারণ সকল রাজার নামের শেষে পাল শব্দটি যুক্ত আছে। কিন্তু সমসাময়িককালে তাদের কি নামে ডাকা হতো বা তাদের রাজ্যের নামই বা কি ছিল তা জানা যায় না। তাদের অনেক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এগুলিতে 'পালরাজ্য' বা 'পালবংশ' উল্লেখ নাই। বাংলা বা বাঙ্গালা নাম অর্থাৎ যে নামে বিভাগ পূর্বকালের বাংলা প্রদেশ বা মোগল আমলের সুবা বাঙ্গালা পরিচিত ছিল, প্রচলিত হয় পাল রাজত্বের অনেক পরে, মুসলমান আমলে। বাংলাদেশ তখন রাজধানী গৌড়ের নামে গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত ছিল এবং তাম্রলিপিতে রাজাদের গৌড়েশ্বর বলা হতো। সুতরাং সমসাময়িক আরব ভৌগোলিকদের বিবরণে রাজার নাম বা গৌড়ের নাম পাওয়া স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে হোদিয়ালার মত অনুসারে মালিক-উদ-ধরহমি বা ধর্মপালের রাজ্য লিখিত হয়েছে মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।[১]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, লামা তারানাথের লেখা অনুসরণে শরৎচন্দ্র দাশ বলেন, পুরাকালে চাটিগ্রাম বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল। ত্রিপুরার দক্ষিণে এবং রখনের (আরাকান) উত্তরে অবস্থিত ভূভাগ রম্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অদ্ভুত ছিল। নালন্দা পতনের পর তা বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। শরৎচন্দ্র দাশের এই উক্তির ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো ঐতিহাসিক রম্যকে 'রুহমি' বা রামুর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[২]

ড. করিম এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদিও আক্ষরিক অর্থে শরৎচন্দ্র দাশের দ্বিতীয় বাক্যে রম্ম বা রম্য ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যবর্তী ভূভাগের একটি নাম বুঝায়, তার পরবর্তী বাক্যদ্বয় পড়লে মনে হয় রম্ম শব্দটি চাট্টিগ্রামেরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এই রম্ম বা রম্যকে 'রুহমি'-এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।[৩]

রম্যভূমি হিসেবে রামুর বাইরে ব্যাপক পরিচিতি আছে। এছাড়া রামুকে রম্যভূমি বলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষিত করা হয়। এটি এখানে প্রচলিত একটি বিশেষণ। চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে কখনও কোথাও রম্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। বরং তারানাথ ও শরৎচন্দ্র দাশের রচনা অনুসরণ করলে প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্বে রামুই যে রম্যভূমি হিসাবে চট্টগ্রামকে প্রতিনিধিত্ব করেছে তার যুক্তিসংগত পরিচয় মেলে।

সোলায়মান তাঁর লেখা সিলসিলা ত-উত-তওয়ারিখ গ্রন্থে রুহমি রাজ্যের একটি

১। প্রফেসর আবদুল করিম, *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃঃ ১৬-১৭

২। Indian Historical Quarterly, Vol XVI. p. 232-34.

৩। *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃঃ ১৬

বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, "এই তিনটি রাজ্যস্বম্ব (জুর্জ, বলহার এবং তফক) রুহমি (Rahmi) নামক একটি রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, যা (রুহমি) জুর্জ রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। রাজা খুব সমাদৃত নয়। জুর্জের সঙ্গে যেমন তিনি যুদ্ধে লিপ্ত, তেমনি বলহারের সঙ্গেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। জুর্জ, বলহার ও তফকের চাইতে তাঁর অনেক বেশি সৈন্য-সামন্ত আছে। কথিত আছে যে, তিনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেন পঞ্চাশ হাজার হাতী তাঁর অনুবর্তী হয়। তিনি শুধু শীতকালেই যুদ্ধ করতে পারেন। কথিত আছে যে, তাঁর সৈন্য বাহিনীতে দশ হাজার লোক শুধু কাপড় তৈরী ও ধোলাইয়ের কাজে নিয়োজিত থাকে। তাঁর দেশে এমন এক প্রকার বস্ত্র তৈরি হয় যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই বস্ত্র এতই মিহি এবং সূক্ষ্ম যে এর দ্বারা তৈরী পোশাক একটা আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে ঢুকানো যায়। এই রকম সুতার তৈরী এক খণ্ড কাপড় আমরা দেখেছি। এই দেশে কড়ির মাধ্যমে ব্যবসা চালান হয় এবং কড়িই তাদের প্রচলিত মুদ্রা। তাদের সোনা, রূপা ও অগুরু কাঠ আছে এবং সমারা (সোমরস্) নামে একটি জিনিস আছে যার দ্বারা মাদর (মাদক) তৈরি হয়। ডোরাকাটা (Striped) ভূষণ বা কারকদম এই দেশে পাওয়া যায়। এই জন্তুটির কপালের মাঝখানে একটি মাত্র শিং আছে এবং শিং-এ মানুষের প্রকৃতির মতো একটি আকৃতি দেখা যায়।[১]

আরব ভৌগোলিক আল-মাসুদি বলেন, তফক দেশের অপর প্রান্তে রাহমা নামে রাজ্য অবস্থিত। রাহমা তাদের রাজার উপাধি এবং সাধারণত তাদের রাজার নামও বটে। আল-ইদ্রিসি বলেন, রাজারা সাধারণত বংশানুগত উপাধি গ্রহণ করেন যেমন– চীন দেশের রাজারা শতাব্দিকাল ধরে বাগবুক উপাধিতে ভূষিত এবং এই উপাধি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। ভারতবর্ষে রাজাদের মধ্যে বলহার, জাব, কাফির, হাজর, আবদ, দুমি (রুহমি) এবং কামরুন উপাধি আছে। এই উপাধিগুলি শুধু ঐ সকল রাজপুত ধারণ করে যারা শাসন ক্ষমতা লাভ করে, অন্য কারো এই উপাধি লাভ করবার অধিকার নেই।[২]

ইবনে খুর্দদবা নামক একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রুহমি বা রহম নামের একটি দেশের নাম করেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, এই রুহমি বা রুহমকে কোনো কোনো লেখক মোটামুটি বংগ দেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। আমার মনে হয় এই অনুমান যথার্থ নয়। রুহমি বা রহম প্রাচীন আরাকান।[৩]

তথ্যের স্বল্পতা, প্রাচীন লেখকদের মতের অস্পষ্টতা এবং সমকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অভাব সুস্পষ্টভাবে রুহমি রাজ্যের অবস্থান নির্ণয়ের বড় অন্তরায়। বিদেশী লেখকদের রামুর রাজ্যের সঙ্গে রুহমির সম্পর্ক আবিষ্কার এ কালের গবেষকদের জন্যে নিঃসন্দেহে অনুসন্ধিৎসা নতুন দার উন্মোচন করেছে। রামু এবং রুহমির ভৌগোলিক অবস্থান অভিন্ন বলে মনে করার কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রায় সব লেখকই নির্দেশ করেছেন। নামের ধ্বনিগত মিল ছাড়াও এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। হোদিয়ালার মালিক-উল-ধরহমিকে রাজা ধর্মপালের রাজ্য বলে চিহ্নিত করার

১। Elliot and Dowson : *History of India as told by its own Historians,* VOL. I. p. 5

২। Elliot and Dowson : *History of India as told by its own Historians,* VOL. I. p. 86

৩। *বাঙালির ইতিহাস*– আদিপর্ব– পৃঃ ১৪৮।

ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি করে না। আল-ইদ্রিসি রুহমি এবং ধরহমিকে রাজ্য ও রাজা উভয়ের নাম বুঝিয়েছেন। ঐতিহাসিক হোদিয়ালা মনে করেন, রুহমি রাজ্য বাংলার পালবংশের রাজা ধর্মপালের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলে বর্তমান ঐতিহাসিকরা একমত পোষণ করেন। সোলায়মানের গ্রন্থটি প্রায় তার সমসাময়িক। তা সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে আসা রীতিমত বিব্রতকর যে, রুহমি বংগদেশের সঙ্গে অভিন্ন। বরং ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, রুহমি নিম্ন বার্মা অর্থাৎ প্রাচীন আরাকানের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। রুহমিকে প্রাচীন বঙ্গের অংশ হিসাবে দাবি করলেও তার ভৌগোলিক অবস্থান চট্টগ্রাম থেকে আরাকান উপকূলের মধ্যবর্তী কোন স্থানেই নির্দেশ করতে হয়।

৫. হরিকেল ও পট্টিকেরা রাজ্য

সপ্তম-অষ্টম শতকে সমতটমণ্ডল চট্টগ্রাম শাসন করেছে বলে জানা যায়। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার বড় উঠানে কান্তিদেবের একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। তাম্রলিপির বিবরণ অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ দেশে কয়েকজন বৌদ্ধ নরপতি রাজত্ব করতেন। তাম্রলিপিটি অসম্পূর্ণ, প্রাপ্ত অংশে তিনজনের নাম জানা যায়– ভদ্রদত্ত, তাঁর ছেলে ধর্মদত্ত এবং তাঁর ছেলে কান্তিদেব। কান্তিদেব রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[১] তাঁর মাতা রাজকন্যা ছিলেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, তিনি মাতামহের নিকট থেকে রাজ্য লাভ করেছিলেন। তা না হলে নিজ বাহুবলে রাজ্য গঠন করেন। তাম্রলিপিখানি হরিকেল মণ্ডলের ভবিষ্যৎ রাজাদের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ। হরিকেল রাজ্যের অবস্থান নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে হরিকেল রাজ্য গঠিত ছিল। তাম্রলিপিতে সন-তারিখ না থাকলেও হস্তলিপির বিচারে একে খ্রিস্টীয় নবম শতকের বলে মনে করা হয়। সুতরাং কান্তিদেব নবম শতকে হরিকেলের রাজা ছিলেন এবং কক্সবাজারসহ বৃহত্তম চট্টগ্রাম ঐ সময়ে কান্তিদেবের অধীনে ছিল।[২] ড. আর. সি. মজুমদার মনে করেন, কান্তিদেবের রাজত্বকাল ৮৫০ থেকে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ। আর. সি. মজুমদার বলেন, It is very likely that Kantideva flourished during the decadent period that set after the death of Davepala and to advantage of the weakness of the central authority to found an independent kingdom in East Bengal.[৩]

ম্রোহং-এর সীতাউঙ্গ প্যাগোডায় সংরক্ষিত একটি সংস্কৃত লিপি থেকে জানা যায় যে, দশম এবং একাদশ শতকের প্রথম দিকে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ আরাকান শাসন করেন। জনস্টোনের মতে এই বংশের শেষ রাজা আনন্দ চন্দ্র। তাঁর সময় অষ্টম শতক। আরাকানি উপাখ্যান অনুযায়ী তিনি ১০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হার্ভে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের রাজারা ৭৮৮ থেকে ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন।[৪]

১। A. M. Chowdhury, op. cit,. p. 150.

২। ড. আবদুল করিম, *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃঃ ১০

৩। *History of Bengal*, Vol. 1, p 135.

৪। G.E. Harvey : History of Burma, London, 1925, p. 10.

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাজদা-তু য়ে' বলা হয়েছে, ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ সুলভ ইঙ্গ চন্দ্র 'সুলতন' বিজয়ে বের হন এবং সেই দেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তাঁর নাম রাখা হয় 'চেওগোং' অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[১] কেউ কেউ মনে করেন, এই সুরতন, সুলতান শব্দের আরাকানি রূপ এবং মুসলমানরা চট্টগ্রামে নবম শতকে একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। ডঃ আবদুল করিম একে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না। তিনি মনে করেন, এটি চকরিয়ার নিকটস্থ একটি স্থান ডি বেরোসের মানচিত্রে যাকে 'sore' বলা হয়েছে।[২]

উপরিউল্লিখিত আরাকানি চন্দ্রবংশের সমসাময়িক বাংলাদেশের পট্টিকেরা রাজ্যেও আরেক চন্দ্রবংশ রাজত্ব করছিল। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, এই দুই চন্দ্র বংশ সম্ভবত এক পরিবার থেকে উত্থিত।[৩] অতপর এরা আরাকান এবং পূর্ববঙ্গে আলাদা আলাদা রাজ্য স্থাপন করেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের লেখায়ও বিষয়টির সমর্থন আছে। মহাবীর আরাকানের চন্দ্র বংশের উৎখাত করলে ঐ বংশের একটি শাখা পট্টিকেরায় রাজ্য গঠন করে রাজত্ব করতে থাকেন। এই সম্পর্ক স্বীকার করার পেছনে যুক্তি এই যে, পট্টিকেরা টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রার সঙ্গে আরাকানের মুদ্রায় মিল আছে। এছাড়া পট্টিকেরা চন্দ্রবংশ এবং আরাকান রাজবংশের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কেরও বিবরণ পাওয়া যায়।[৪]

তবে চট্টগ্রাম বা কক্সবাজার চন্দ্রবংশের অধীনে ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরাকানের চন্দ্রবংশের পতনের মূলে বার্মা বা পেগানের Anawrahta দায়ী। তিনি (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিঃ) পেগানের শাসকদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনি বাংলাদেশের কিছু অংশে পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাদের বংশধর সাউন্থ (১০৭৭-১০৮৪), কিয়ানজিথা (১০৮৪-১১১২) এবং আলুং শিথু (Alaung Sithu) the Indian land of Bengal পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে জি. ই. হার্ভে মত পোষণ করেন। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগোর উদ্ধৃতি অনুযায়ী Harvey rightly thinks that the Indian land of Bengal is Chittagong.[৫] তাঁর বিবরণ অনুযায়ী পট্টিকেরা (?) (Pateikhara) রাজা তাকে কন্যা দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী রাজা নরাথু (Narathu) (১১৬৭-১১৭০) পট্টিকেরা রাজার কথায় বিয়ে করেন। তিনি চট্টগ্রামে নিহত হন।[৬]

৬. চাইন্দা রাজা বা চণ্ডীলাহ্ রাজা

ইংরেজদের চট্টগ্রামে কর্তৃত্ব লাভের পর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামাবাদের নিকটে একটি রৌপ্যলিপি আবিষ্কৃত হয়। ইংরেজ কর্মকর্তারা এটি কলকাতা পাঠিয়ে দেন। স্যার

১। *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (Culcutta) 1844, p-36

২। *কক্সবাজারের ইতিহাস*-পৃঃ ১১

৩। *A History of Chittagong*, p 68

৪। *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, VolI -p 5 (1961)

৫। *A History of Chittagong*, p 70

৬। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. IV (1835) p. 404.

জন শোর্ড লিপিটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই লিপির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদের এক অংশে বলা হয় যে, On the 14th Magha 904 Chandi Lal Raja, by the advice of Bowangari Rauli, who was the director of his studies and devotions and inconformitt to the sentiments of twenty eight other Raulis, formed the desing of establishing a place of religious bricks, there cubits in depth and there cubits also in diametre; in which were deposited one hundred and twenty bronge iages of small dimension denominated Languda; There was likewise thamud as, also, twenty bronze images a larger than the former, denominated Languda; There was likewise a large image of stone call (sic) Langudaguri, with a vessel of Brass, in which were deposited two of the bones of thacur.[১]

এই লিপির ঐতিহাসিক সূত্র এই যে, ৯০৪ সালের ১০ মাঘ তারিখে চণ্ডীলাহ রাজা একটি প্রার্থনাস্থান নির্মাণ করেন। একটি গুহা খনন করে সেখানে বিভিন্ন আকৃতির বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন এবং রাউলিদের প্রার্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই লিপির সন সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ আছে। প্রফেসর আবদুল করিম মনে করেন, সনটি শকাব্দ এবং ৯০৪ শকাব্দ = ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।[২] রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র এবং ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, সনটি মঘীসন।

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস এবং ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো চন্দীলাহ রাজাকে চট্টগ্রামে নিযুক্ত আরাকনের গভর্ণর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলে মনে করেন।[৩] ডঃ আবদুল করিম দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে, রাজা শব্দযুক্ত হওয়ায় চন্দীলাহ নিশ্চয় রাজা ছিলেন, তিনি কোনো রাজার অধীনস্ত গভর্নর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন না। প্রাদেশিক শাসনকর্তা আরাকানের রাজার নাম বাদ দিয়ে শুধু নিজ নামে কোন লিপি বা মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে পারতেন না, লিপি বা মুদ্রা উৎকীর্ণ করবার ক্ষমতা শুধু রাজারই ছিল। সুতরাং চন্দীলাহ রাজা নিজেই রাজা ছিলেন এবং খুব সম্ভব তিনি আরাকানের রাজাই ছিলেন।[৪]

এই চন্দীলাহ রাজা কোথাকার রাজা ছিলেন স্পষ্ট করে ড. করিমও সঠিক কোনো নির্দেশ দেন নাই। তিনি বলেন, প্রাচীনকালের বিভিন্ন সূত্রে আরাকান রাজাদের যে নাম পাওয়া যায় তাতে চন্দীলাহ রাজা নামে কোনো রাজার নাম নেই। তাই চন্দীলাহ রাজা পাঠ নির্ভুল কি-না সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে আমরা হয়তো আরাকানের রাজাদের সকল নাম পাইনি।[৫]

রামু থানার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নে চাইন্দা রাজার ভিটা বলে একটি রাজভিটার অস্তিত্ব আছে। এছাড়া চাইন্দা রাজারকূল নামে একটি জনপদের নাম আছে। এই চাইন্দা

১। *Asiatic Researeche.*, Vol II. 1794, p. 299-302

২। *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃঃ ১২

৩। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XIII (1844), p. 40

৪। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. LXVII (1898), p 27

৫। *Indian Historical Quarterly*, Vol IX, p. 282-89

রাজা চন্দীলাহ্ রাজা কি-না এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে চন্দীলাহ্ শব্দটির সঙ্গে চাইন্দা শব্দের ধ্বনিগত মিল রয়েছে। চন্দীলাহ্ শব্দে ধ্বনিগত পরিবর্তন হেতু চাইন্দা শব্দে উৎপত্তি হতে পারে। আরাকানের ইতিহাসে চন্দীলাহ্ রাজার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না বিধায় তিনি প্রাচীন রামুর স্বাধীন নৃপতি ছিলেন বলে মনে করার মধ্যে কিছুটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এই চন্দীলাহ্ রাজা কোত্থেকে এসেছিলেন সে তথ্য পাওয়া না গেলেও স্থানীয়ভাবে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে, তিনি চকরিয়া কিংবা চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন।

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাশ এবং ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগোর মতানুযায়ী ৯০৪ সালকে মঘীসাল মনে করলে এই রাজার সময় দাঁড়ায় ৬৯৩ + ৯০৪ = ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ আর ড. আবদুল করিমের মতানুসারে ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ। চন্দীলাহ্ বা চাইন্দারাজা আরাকান রাজ্যের গভর্নর ছিলেন না। স্বাধীন রাজা ছিলেন। সুতরাং মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে. তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। কেননা আরাকান রাজদের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রেখে তিনি তাঁর রাজ্য সুদূর চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। সমসাময়িককালে Min Bin (Meng Beng) আরাকানের একজন প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। এই সময়টা রামুসহ গোটা চট্টগ্রামের জন্য অত্যন্ত অস্পষ্ট ইতিহাসের পরিচয় বহন করে। তখন চট্টগ্রাম দখলের জন্য বিভিন্ন শক্তি বহুমাত্রিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। একদিকে গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহের দু'সামন্ত খোদাবক্স খান ও আমীর্জা খান, মোগল, পর্তুগিজ, আরাকানি, ত্রিপুরা এমনকি ঈশাখাঁর বংশধর ভাট্টি দেশের সোলায়মান বাইসিয়াসই পরস্পরের প্রতি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পর্তুগিজ সূত্রগুলো থেকে অস্পষ্ট একটি তথ্য পাওয়া যায় যে, নাম না জানা আর একটি শক্তিও এই বিশৃংখল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আমাদের বিবেচনার এই অজানা শক্তিটি রামুর চন্দীলাহ্ রাজা হতে পারেন। রামুতে এই রাজার কোনো লিপি বা মুদ্রা পাওয়া গেলে তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আরকানি উপাখ্যান অনুযায়ী আরাকানের পা-রিম (Pa-rim) শহরে এক রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই বংশের ষষ্ঠ রাজা গাউলিয়া (Gaulya) পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১১৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আরাকানি উপাখ্যানে তাকে বলা হয়েছে 'a price of great power to whom the kings of Bengal, Pegu, Puggean (Pagen) and siam did homeg.[১] সমগ্র বাংলাদেশ এসব রাজার অধীনে চলে গিয়েছিল কি-না তা বলা শক্ত হলেও চট্টগ্রাম তাদের অধীনে ছিল একথা সহজে অনুমান করা যায়। এই রাজবংশের অপর রাজা মিডজা থেং (Midza Theng) (১১৮০) বার্মিজদের বিতাড়িত করে ভারত এমনকি নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত দখল করে নিয়ে ছিলেন।

লামা তারানাথের বিবরণ অনুযায়ী বাবলা সুন্দর (Babla Sundara) নামে এক রাজা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। এটি সম্ভবত তুর্কিদের মগধ দখলের কিছু সময় পরে। এই রাজার প্রথম পুত্র আরাকানের শাসক, দ্বিতীয় পুত্র চাকমাদের দেশ, তৃতীয়

১। *Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.* XIII (1844) p. 41

পুত্র বার্মা, চতুর্থ পুত্র আসাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কাচার এবং ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন।[১] তারানাথের এই তথ্য অন্য কোনো সূত্র থেকে সমর্থিত নয়।

চট্টগ্রামের নাছিরাবাদে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে দেবরাজাদের একটি কপার প্লেট (তাম্রলিপি) পাওয়া গেছে। এই প্লেটটির তারিখ ১১৬৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ। তাম্রলিপিতে বর্ণিত দামাদোর দেব (Damodaradave) তার রাজ্যের সীমা ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন বলে ড. আর. সি. মজুমদার মনে করেন।[২]

আরাকানি উপাখ্যান মতে এই সময় (১২৩৭-৪৩ খ্রিঃ) এলাউঙ্গ ফাইয়ু (Alaung Phyu) বলে আরাকানের এক শক্তিধর রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করে বাংলাদেশের কিছু অংশ দখল করে নেন।[৩] ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, দামোদরদেব অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই Alaung Phyu-এর বাংলাদেশ দখল নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। তাঁর ভাষায়, আমরা মনে করি, চট্টগ্রামকে দুই রাজা দু'ভাগ করে নিয়ে ছিলেন– দেব শাসকরা চট্টগ্রাম এবং Alaung Phyu দক্ষিণ চট্টগ্রাম শাসন করেছিলেন। আরাকান রাজ Alaung Phyu-এর মৃত্যুর (১২৪৩) পর আরাকানের ভাগ্যাকাশে এক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কিছুকাল পর মেং ডি (Meng Di) নামক অপর রাজা অতিশয় শক্তিশালী রাজা হিসাবে আবির্ভূত হন। কথিত আছে থুরাতনের (Thuratan) রাজা Nya pu kheng (Rukunduddin) তাঁকে হাতি ও অশ্ব উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। থুরাতন বাংলাদেশে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। এটি ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দের কথা। রামু ত্রয়োদশ শতকে মোটামুটি আরাকানের অধীন ছিল।

মারকো পোলো (Marco Polo-1295 AD) তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেছেন মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ একজন রাজার অধীনে ছিল। তিনি Kublai Khan-এর করদ রাজা ছিলেন। প্রফেসার ডি. জি. ই. হল মনে করেন, The statement of Marco is imaginary. ঐতিহাসিক রশিদ উদ্দীন লিখেছেন, The country of Rahan (Arakan) is subjected to the Khan. এতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, আরাকানের প্রদেশ হিসাবে চট্টগ্রাম কুবলাই খানের সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়েছিল।

১। *A History of Chittagong*, p. 73

২। Hall, op, cit, p. 225

৩। *History of Indian as told by its own Historians*, H M Elliot and Dowson ed· p. 305

তৃতীয় অধ্যায়
মধ্যযুগের হাওয়া

১. মুসলিম বিজয়

শিহাবউদ্দীন তালিশ তার ফাতেহা-ই-ইব্বরিয়া (Fathya-I-Ibbriys) গ্রন্থে মুসলমান শাসকদের চট্টগ্রাম বিজয়ের কথা বলেছেন। গ্রন্থটি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা। তিনি বলেন, বাংলার সুলতান ফখরুদ্দীন সম্পূর্ণভাবে চট্টগ্রাম (Chatgaon) জয় করেন। ফখরুদ্দীনের সময় চট্টগ্রামের মসজিদ ও সমাধিসৌধ (tombs)সমূহ নির্মিত হয়েছে।[১] পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন একটি নৌবন্দর দিয়ে– যাকে তিনি 'Sadkawan' বলেছেন। তার মতে ঐ সময় ঐ স্থানের রাজা ছিলেন ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ। ইবনে বতুতার Sadkawan চট্টগ্রাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং এটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য সোনারগাঁওয়ের অংশ ছিল। তারিখ-ই-ফিরোজ গ্রন্থে জানা যায়, চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রাম মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ইবনে বতুতার বরাত দিয়ে ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ৭৩৯-৪০ হিজরি অর্থাৎ ১৩৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজয় করেন।[২] তিনি কার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন ইতিহাসে তা স্পষ্ট নয়। আরাকানি উপাখ্যান মতে, চট্টগ্রামের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল সম্ভবত তখন আরাকানের দখলে ছিল। মেংডিং-এর মৃত্যুর পর আরাকানে অরাজকতা চলছিল। সম্ভবত এই সুযোগে ফখরুদ্দীন সম্পূর্ণ চট্টগ্রামে তার রাজ্য বিস্তার নিশ্চিত করেন। ফখরুদ্দীনের শাসন শেষ হয়ে যায় ৭৫০ হিজরী অর্থাৎ ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে। তার পুত্র সুলতান ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু সম্ভবত ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দেই সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের কাছে তার পরাজয় ঘটে।

৭৫৩ হিজরির পর যেহেতু ইখতিয়ার উদ্দীনের কোনো মুদ্রার প্রচলন লক্ষ করা যায় না বরং শামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহের ঐ বৎসরই মুদ্রার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, ৭৫৩ হিজরি অর্থাৎ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে পর তার শাসনের অবসান ঘটে। ইলিয়াস শাহী আমলে চট্টগ্রাম তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কি-না তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সামস-ই-সিরাজ আফিক তার এক বিবরণে উল্লেখ করেছেন, জাফর খান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের জামাতা ইলিয়াস শাহের ভয়ে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পালিয়ে সাগর পথে সিন্ধুর থাট্টায় উপস্থিত হন।[৩] আরাকানের রাজনৈতিক দুর্বলতা রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হতে পারে। ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্র গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের

১। Fathya-I-ibbriya, gt. J. N. Sarkar, p. 182

২। *A History of Chittagong*, p. 127

৩। *History of Indian as told by its own Historians* H M Elliot and J Dowson ed . III 304

আমলে চট্টগ্রাম তার শাসনাধীনে ছিল। এসব দিক বিবেচনা করে ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, সোনারগাঁয়ের সঙ্গে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ চট্টগ্রাম জয় করেন।[১] ঐতিহাসিক সামস-ই-সিরাজ আফিক শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই-বাঙ্গালা, শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান, সুলতান-ই-বাঙ্গালা, সুলতান-ই-বাঙ্গালিয়ান বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐতিহাসিক ড. এ. এইচ. দানি দাবি করেন সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহই প্রথম শাসক যিনি সমগ্র বাংলাদেশকে নিজের শাসনাধীনে নিয়ে এসেছিলেন।[২] পিতা সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের জীবদ্দশায়ই তার পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭-১৩৯০ খ্রিঃ) নামে চট্টগ্রামসহ অন্যান্য জায়গায় মুদ্রার প্রচলন ঘটে।[৩] গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রিঃ) যে চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন তার প্রচলিত মুদ্রায় সে পরিচয় আছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন লেখকের লেখায় জানা যায় বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ওপর তার কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ছিল। অনেক চৈনিক পরিব্রাজক এবং কূটনৈতিক মিশন চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন এবং সুলতানদের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।

গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের পরবর্তী সুলতানগণ যেমন, সাইফুদ্দিন হামজা শাহ (১৪১০-১২ খ্রিঃ), আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ (১৪১৪ খ্রিঃ), জালাল উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪১৬ খ্রিঃ) কেউই সফল শাসক ছিলেন না। তাদের ব্যর্থতার কারণে এই সময়ে রাজা গণেশ বলে এক হিন্দু রাজার আবির্ভাব ঘটে (১৪১৭-১৮)। মুসলিম রাজাদের অদক্ষতার জন্য হিন্দু মন্ত্রীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো বলে মনে হয়। এরাই প্রতাপশালী জমিদার রাজা গণেশকে সিংহাসনে বসায় (১৪১৮-১৯ খ্রিঃ)। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের পর আর পাওয়া যায়নি। তাই মনে করা হয় রাজা মহেন্দ্র এবং তার ভাগ্য বিধাতা মন্ত্রীরা দীর্ঘসময় ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি।[৪] ১৪১৮ খ্রিঃ হতে ১৪৩৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ রাজা গণেশের পুত্র। তিনি ধর্মান্তরিত মুসলিম বলে জানা যায়। চট্টগ্রাম থেকে তার মুদ্রার প্রচলন হয়েছে : As many as fifty four coins of Jalaluddin minted at Chatgoan in 823 A H (1420) have been found out sofar. The coins belonged to three district kinds and mint name is pronounced as chatganw.[৫]

জন. ডি. বেরোসের বিবরণ থেকে জানা যায়, চট্টগ্রামের ওপর রাজা গণেশের কর্তৃত্ব ছিল। রাজা গণেশের সময় হো হিয়েন (Hou-hein) চীনা রাষ্ট্রদূত হিসাবে চট্টগ্রামে আসেন (১৪১৫)। চট্টগ্রাম বন্দরে রাজা গণেশের পুত্র জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানান।

রাজ ওয়াং (radzawang) বা আরাকানি উপাখ্যান থেকে একটি মজার বিষয় জানা

১। *A History of Chittagong*, p. 138

২। *Bengali Literary Review*, April, 1957

৩। Nalini Kanta Bhattasali, op. cit, p. 63

৪। *History of Bengal*, Vol. 1, p. 128

৫। S. K. Kamgo-c. Ilct, p. 143

যায়। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা নর মিখলা (Meng Tsaih, mwun) অনন্থিউ নামক এক সামন্তের বোনকে জোরপূর্বক অপহরণ করেন। অনন্থিউ আভায় ব্রহ্মরাজের নিকট তার প্রতিকার কামনা করেন। ব্রহ্মরাজ আরাকান আক্রমণ করে নর মিখলাকে পরাজিত করেন। পরাজিত হয়ে নর মিখলা চট্টগ্রামে বাংলার গভর্নরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সাহায্য না পেয়ে ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতানের নিকট গমন করেন। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্ তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান। বাংলায় বহুদিন গোলযোগ থাকায় নর মিখলাকে আরো অনেক বৎসর বাংলায় অবস্থান করতে হয়। সুলতান জালাল উদ্দিন শাহ ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে নর মিখলাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। নর মিখলা স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ফলে আরাকান রাজ বাংলার সুলতানের সামন্তে পরিণত হয়।[১]

নর মিখলার পর তার উত্তরাধিকারী মেন খা-রাই বা আলী খান, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৪৩৪-১৪৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মেন খা রাই পিতার মতো বাংলার সুলতানের কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেন নাই। A. P. Phayre-এ সম্পর্কে বলেন, (He) did not submit to the authority of the king of Bengal. He took possession of the country as far as Ramu.[২]

আরাকানি উপাখ্যানে সুনির্দিষ্টভাবে Men Kha-ri-এর রামু বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। তার পুত্র Ba sta phyn কালিমাহ্ শাহ্ চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত দখল করে নেন।[৩]

১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে তার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ. পি. ফেয়ার মনে করেন, আরাকানি রাজারা বাংলার রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে পরবর্তী অর্ধশতাব্দী চট্টগ্রাম দখলে রেখেছে। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দেও উত্তর চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৪] তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকানি শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। বাস্তা ফিয়ো বা কালিমাহ শাহ এবং রুকনদ্দীন উভয়েই শক্তিশালী রাজা ছিলেন। হুসেন শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত এ সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজার আবির্ভাব ঘটে নাই।

সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) বাংলার হুসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ), আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রিঃ), গিয়াজ উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রিঃ) এই রাজবংশের শাসক। ১৫৩৮ খ্রিঃ শের খান এই রাজ বংশের পতন ঘটান। রাজমালা বা ত্রিপুরার উপাখ্যান থেকে জানা যায় ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য এবং বাংলার (গৌড়ের) সুলতান হুসেন শাহের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১৭) চট্টগ্রাম দখল করে নেন। এই মর্মে মুদ্রা চালু করা হয়েছে। এর একটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে রক্ষিত আছে। হুসেন শাহ্ এতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তিনি গৌড় মল্লিকের নেতৃত্বে

১। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, XIII (1844), 4-46

২। A P. p. Hayre, p. 78

৩। Ibid

৪। *A History of Chittagong*, p-151

ধন্যমাণিক্যের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। গৌড় মল্লিক চট্টগ্রাম পুনরায় দখল করে নেন। কিন্তু তা অত্যন্ত কম সময়ের জন্য। রাজমালা অনুযায়ী ধন্যমাণিক্য ব্যক্তিগতভাবে চট্টগ্রাম দখলের জন্য অগ্রসর হন এবং চট্টগ্রাম দখল করে নেন। তিনি রোসাঙ্গ মর্দন নারায়ণ (Rosang Mardan Narayan)কে অধিকৃত অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

২. ত্রিপুরা রাজের আক্রমণ

রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী ধন্যমাণিক্য তার রাজ্যকে সামরিক শক্তির সাহায্যে রাম্বু (রামু) পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটান।[১] অতঃপর আরাকান তার দখলে আসে। রোসাঙ্গ মর্দন রোসাঙ্গ জয় করতে গিয়েছিলেন বলে তার নাম রোসাঙ্গ মর্দন হয়েছিল।[২]

ত্রিপুরা বাহিনীর সঙ্গে বঙ্গসেনাদের কয়েক দফা যুদ্ধ হয়েছে। নাট্যমঞ্চের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখা গেছে একের জয় এবং অন্যের পরাজয়। পর্তুগিজদের বিবরণ থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে এরা চট্টগ্রামে এসে দেখেন চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানদের দখলে আছে এবং একজন মুসলিম গভর্নর চট্টগ্রাম শাসন করছেন। Joao Coetho (১৫১৭-২৮ খ্রিঃ) চট্টগ্রামে এসেছিলেন মৌরীয় এক নৌযানে চড়ে। তিনি গভর্নরের দরবারে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। ডি বেরোস মনে করেন, আরাকান এবং বাংলার সুলতানদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। তবে তিনি বলেছেন, চট্টগ্রাম উপকূলের জেলেরা আরাকান উপকূলে অধিক মাছ পাবার আশায় মাছ ধরতে যেত। গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮ খ্রিঃ) হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান পর্যন্ত চট্টগ্রাম এবং তার দক্ষিণাঞ্চলে শাসন বজায় রেখেছিলেন। ডি. বেরোসের মানচিত্রে দেখা যায় যে, দক্ষিণ চট্টগ্রামের বৃহৎ এলাকা এবং আরাকানের কিছু অংশসহ খোদাবক্স খানের (Codavascam) অধিক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে। খোদা বক্স খান দক্ষিণ চট্টগ্রামে হুসেন শাহী সুলতানের গভর্নর ছিলেন। কর্ণফুলী নদীর উত্তরে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন আমিরজা খান। এদের মধ্যে প্রবল বিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় ডি. বেরোস এবং সমকালীন অন্যান্য লেখকদের লেখায়।

১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় আফগান বা পাঠানদের শাসন কায়েম ছিল। আফগান নেতা শেরখান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় দখল করে নেন। ১৫৭৬ খ্রিঃ শেষ আফগান দাউদ কররানী মোগলের কাছে পরাজিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আফগানরা বাংলা শাসন করেছেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলা, ত্রিপুরা বা আরাকানের একক শাসনাধীনে ছিল না। উল্লিখিত তিনটি শক্তি বারবার একে করায়ত্ত করতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে অথবা পরাজয়ের পর পুনরুদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে আক্রমণ করেছে। শের খান ক্ষমতা দখলের পর চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বিবেচনা করে চট্টগ্রাম আক্রমণের জন্য তার এক সেনাপতি নোগাজিলকে প্রেরণ করেন। নোগাজিল (Nogazil) দুই গভর্নরের (খোদা বক্স এবং আমির্জা খান) বিরোধের সুযোগে

১। রাম্বু আদি ছত্র সীক মারিয়া লইলা রসাঙ্গ নিকটে জাইয়া পুষ্করিণী দিল (দ্বিতীয় লহর ২২)

২। রসাঙ্গ মারিতে গিয়াছিল সেনাপতি। সেই হতে রসাঙ্গ মর্দন নাম খ্যাতি।

সহজেই ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে চট্টগ্রাম দখল করে নেন।[১] তবে এই দখল স্থায়ী হয় নাই। জুলাই মাসে মোগলদের গৌড় দখলের সঙ্গে সঙ্গে আফগানরা বিহারে ফিরে যায় এবং চট্টগ্রাম বন্দর সোনারগাঁও বন্দরের মতোই মোগল সম্রাটদের অধীনে চলে যায়।[২] পর্তুগিজদের বিবরণেও এর সত্যতা প্রমাণিত।[৩]

মোগলদের আক্রমণে নোগাজিল বেকায়দায় পড়ে যান। গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের দুই সামন্ত খোদা বক্স খান ও আমির্জা খান, মাহমুদ শাহের কাস্টম হাউস প্রধান Nuno Fermaadoz Freire, ভাটি দেশের শাসক সোলেইমান বাইসিয়া (Suleiman Baisia) এবং নাম জানা যায় না এমন আরেকটি শক্তির মধ্যে তখন এক বিশৃঙ্খল যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পর্তুগিজ সূত্রগুলো থেকে এ সম্পর্কে অস্পষ্ট সব তথ্য পাওয়া যায়। তবে আরাকানি একটি শিলালিপি থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে ১৫৪০-৪১ খ্রিঃ চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে চলে যায়। Min Bin (Meng Beng) আরাকানের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা চট্টগ্রাম জয় করেন। পর্তুগিজ লেখকদের বিবরণে অজানা শক্তিটি সম্ভবত চণ্ডীলাহ্ রাজা। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা আমির্জা খান, পর্তুগিজ এবং সোলেইমান বাইসিয়াকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করেন। এ. পি. ফেয়ারের বিবরণে আরো জানা যায়, He (King Min bin) in the word of the choronicler, Kept Ramu and Chittagong inspite of raids there by the Tripura while he was engaged by were stuck at Chittagong.[৪] তাঁকে কেউ কেউ 'সুলতান-ই-চাটগাঁও' বলেছেন। এ মর্মে তার মুদ্রারও প্রচলন আছে। তাঁর মুসলমানি নাম ছিল জব উক শাহ্। ড. আবদুল করিম এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মুদ্রাগুলি মিন বিনের নয়। শের শাহের মতো একজন ক্রমশালী সুলতানের সময় তিনি চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এছাড়া মিনবিনের আরাকান রাজ্য দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়। তার পক্ষে চট্টগ্রাম জয় করা সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না।[৫] কিন্তু ফেয়ার মনে করেন, ত্রিপুরা রাজ রামু পর্যন্ত দখল করেন। তবে এটা কম সময়ের জন্য, আরাকানিরা ত্রিপুরারাজ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় : He had penetrated to Ramu, but was now driven back and Meng Beng again occupied Chittagong, coins which bear his name and the title of sultan were struk at the city.[৬] আরাকানি উপাখ্যান মতেও ত্রিপুরা রাজা কিছু সময়ের জন্য ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে রামু পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিলেন। পরে মিন বিন রামু পর্যন্ত পুরো এলাকা দখল করে নেন। ১৫৫৩ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত এ দখল বজায় ছিল।

চট্টগ্রামের পাঠান গভর্নর এক হাজার সৈন্যসহ ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন বলে

১। R. C. Majumder. *An Advanced History of India*, p. 437

২। Riyaz, p. 142

৩। neste tempo chegarao as Mogoresao Gouro-Castanheda. p. 453

৪। A. P. Phayre . *History of Burma*, P. 79

৫। *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃঃ ৩৫

৬। A. P. Phayre, *History of Burma*, p. 79

রাজমালা সূত্রে জানা যায়। ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্য দুই হাজার সৈন্যসহ পাঠান গভর্নরকে নিয়ে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন।[১] এই পাঠান গভর্নরকে নোগাজিন বলে মনে করা হয়। আবার কেউ কেউ তাকে মোহাম্মদ খান সুর বলে মনে করেন।[২] কিন্তু রাজমালা সূত্রে সমারক খান এবং নাম না জানা চট্টগ্রামের পাঠান গভর্নর দক্ষিণ চট্টগ্রাম সবটাই অর্থাৎ আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত জয় করে আরাকান রাজকে বাংলার সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করতে নির্দেশ দেন। তবে পাঠানদের আরাকান দখলের বিষয়টি অস্পষ্ট যদিও আরাকানে মোহাম্মদ খান সুর সামসুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে তার নামে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন, পাঠানরা সম্ভবত রামু পর্যন্ত দখল করেছিল। রামু সে সময় আরাকান সদরের একটি অংশ ছিল। তাঁর ভাষায়, perhaps the Pathans conquered the principality of Ramu and spmee portion of the modern Akyab Divison. Ramu at that time formed a part of Araken proper.[৩] এটি ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। ঐ সময় মিন বিনের পুত্র দিকখা (Dik Kha) আরাকানের শাসক ছিলেন। মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর বিজয় মাণিক্য সমগ্র চট্টগ্রাম জয় করে নেন। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত বিজয় মাণিক্যের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর দৃশ্যত ত্রিপুরা রাজেরা চট্টগ্রাম জয় করেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। ত্রিপুরা রাজের শাসন ১৫৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত টিকে ছিল। এই সময় আরাকানি শাসক মিন বিনের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা তাদের রাজ্যের বিস্তৃতি আরাকানের বাইরে বজায় রাখতে ব্যর্থ হন।

মোহাম্মদ শাহের পুত্র গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান। ১৫৬৪ খ্রিঃ তাজ খান কররানি তাকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দেই তাজখান কররানির শাসনাবসান ঘটে এবং তার ভ্রাতা সোলেইমান কররানি সুলতান হিসাবে ক্ষমতায় বসেন। ইলিশা বাশখালী থানার একটি গ্রাম। এখানে সোলেইমান কররানির আমলে স্থাপিত মসজিদের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সোলেইমান কররানির রাজ্য দক্ষিণ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ড. আবদুল করিম মনে করেন কররানি বংশের সুলতানরা কক্সবাজার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।[৪] ১৫৭৬ খ্রিঃ কররানি বংশের শেষ সুলতান দাউদ খান কররানি মোগল সেনাপতি খান জাহানের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং আরাকান তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

এই সময় ত্রিপুরা এবং আরাকানে দুই পরাক্রমশালী রাজার আবির্ভাব ঘটে। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী তিনি তার

১। চাটিগ্রাম চলিল বিজয় মহারাজা/দুই সহস্য চলিলেক্য সৈন্য মহাতেজ/চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান/প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সমগ্র বঙ্গমান-রাজমালা, দ্বিতীয় লহর, ৪৫

২। Dr. A. Rahim, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, XVIII (1951) 27

৩। *A History of Chittagong*, p. 192

৪। কক্সবাজারের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬

জ্যেষ্ঠপুত্র রাজধর নারায়ণকে প্রধান সেনাপতি করে আরাকানে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে রাজধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর দুর্লভ নারায়ণ, সেনাপতি চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ এবং ছত্রজিত নাজিরকে প্রধান সেনাপতির সহকারী নিযুক্ত করা হয়। এদের সঙ্গে 'দ্বাদশ বাঙ্গালা' এবং ফেরাঙ্গির' সৈন্যরাও ছিল। কর্ণফুলী নদী বাঁধ দিয়ে সৈন্যরা নদী পার হয়। সৈন্যরা অনায়াসে রামু, দেয়াঙ, উড়িয়া প্রভৃতি থানা সমূহ জয় করে নেয় এবং রামুতে ঘাঁটি স্থাপন করে।[১] খবর পেয়ে আরাকানের সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা বাহিনীকে আক্রমণ করে। এতে ত্রিপুরা বাহিনী ভীত হয়ে পড়ে। ত্রিপুরা বাহিনীর ফিরিঙ্গী সৈন্যরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। ফলে সহজেই আরাকানি বাহি-নী অধিকৃত কয়েকটি থানা করায়ত্ত করে নেয়।

এই সময় আরাকানের রাজা ছিলেন মেঙ ফালৌঙ– যার মুসলমানি নাম ছিল সিকান্দর শাহ। তিনি ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ত্রিপুরা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরাকানি বাহিনী গোয়েন্দা সূত্রে সংবাদ পায় যে, ত্রিপুরার রাজা এই বিশাল বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত রসদের ব্যবস্থা না করেই তাদেরকে এই অভিযানে প্রেরণ করেছেন। এই সংবাদের প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা বাহিনী মহাবিপদে পড়ে যায়। সৈন্যও পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে আরাকানি সৈন্যরা ত্রিপুরা সৈন্যদের তাড়া করে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত পার করে দেয়। ত্রিপুরায় বাহিনীর এতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের অনেক সৈন্য আরাকানিদের হাতে নিহত হয়। আরাকানি সৈন্যরা নদী পার হয়ে চট্টগ্রামেও ত্রিপুরা বাহিনীকে ধাওয়া করে। ত্রিপুরা বাহিনীর অধিনায়ক ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। তার সংগঠিত বাহিনী আরাকানিদের প্রচণ্ডভাবে মোকাবেলা করে তাদের পরাজিত করে। এতে আরাকানি বাহিনীর অনেক সৈন্য মারা যায়। এই পরাজয়ের ফলে সিকান্দর শাহ তার অধীনস্থ উড়িয়া রাজাকে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করেন। ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্য নিজেও যুদ্ধ বন্ধের জন্য উৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রস্তাব মোতাবেক সন্ধি স্থাপন করে প্রধান সেনাপতি রাজধর মাণিক্যকে যুদ্ধ বন্ধ করে ত্রিপুরায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আরাকানি রাজের সৈন্যরা আবার যুদ্ধে অগ্রসর হয়। ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্য এ সংবাদ পেয়ে বুঝতে পারেন যে, আরাকান রাজা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সন্ধি করেছিলেন এবং পর্তুগিজদের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। রাজা দেরি না করেই সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধে যাত্রার আদেশ দেন এবং যুবরাজ রাজধর মাণিক্যকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ত্রিপুরা বাহিনীর যুদ্ধে যাত্রার কথা শুনে ত্রিপুরা সৈন্য বাহিনীর খবর জানার জন্য আরাকান রাজ স্বর্ণ-খচিত একটি হাতির দাঁতের টোপর উপহারসহ একজন দূতকে ত্রিপুরা শিবিরে প্রেরণ করেন। তিন রাজকুমার শিবিরে অবস্থান করছেন এমন সময় দূত চিঠি ও উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়। রাজমালার বিবরণ অনুযায়ী রাজধর নারায়ণ মুকুট এবং রাজ দুর্লভ নারায়ণ চিঠিখানি হাতে নেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছু না পেয়ে রাগান্বিত হন– মুকুটের প্রতিই তার লোভ ছিল। তিনি রাগান্বিত

১। রামু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়। দেয়াঙ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়রাজ সৈন্য মন্ত্রণা যে রাম্ভু থানা বসি। হেন কালে মঘ সৈন্য যুদ্ধ দিল আসি। (৩য় লহর, পৃঃ ২৭)

হয়ে বলেন, মগদিগের শৃগালের ন্যায় নিহত করে এবম্বিত সহস্র টোপ হস্তগত করব। দূত চলে যায় এবং রাজাকে এ তথ্য জানায়। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে অবিলম্বে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। যুদ্ধ শুরুতেই কনিষ্ঠ রাজপুত্র বুজার সিংহ হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। প্রধান সেনাপতি শেলের আঘাতে আহত হন। সেনাবাহিনীতে এতে করে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যর্থতার জন্য ত্রিপুরা বাহিনীর পরাজয় ঘটে।

আরাকান রাজের অধীনে ছিল তখন রামু। রামুর শাসনকর্তা ছিলেন আদম শাহ। আরাকান রাজের সঙ্গে বিরোধের কারণে তিনি রামু থেকে পালিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান রাজ যুদ্ধে জয়লাভ করে ত্রিপুরার রাজার কাছে প্রস্তাব পাঠান যে, ত্রিপুরা রাজা আদম শাহকে ফেরৎ পাঠালে তার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজের সম্প্রীতি স্থাপিত হবে। মহারাজ অমর মাণিক্য এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে আবার যুদ্ধ বেধে যায়। অমর মাণিক্য নিজে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন এবং ত্রিপুরার ঘন জঙ্গলের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। আরাকানি বাহিনী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত দখল করে নেয়। রামুর শাসনকর্তা আদম শাহের ভাগ্যে কি ঘটেছিল রাজমালায় তার উল্লেখ নেই। তবে এ কাহিনীটি সত্য বলে মনে করার সঙ্গত কারণ এই যে, ত্রিপুরার ইতিহাসে কাহিনীটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এতে পক্ষপাতিত্ব নেই।

ব্রিটিশ পরিব্রাজক রালফ ফিচ (Ralph Fitch) তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, রামুসহ চট্টগ্রাম ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের অধীন ছিল : From satagaon I travelled the country by the King of Tippera, with whom the Mogores (or Mogen Maghe) have alomost continuall warres. The Mogen which be of the Mingdom of Racon and Rame be stronger than the king of Tippera so that Chatigan or porto Grande, is often times under king of Racon.[১]

সিকান্দর শাহ (মেঙ ফলৌঙ) কখন চট্টগ্রাম জয় করেন রাজমালায় তার উল্লেখ নেই। রালফ ফিচের বিবরণ অনুযায়ী ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই আরাকানিরা চট্টগ্রাম জয় করেছিল। ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো মনে করেন ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই বিজয় সংঘটিত হতে পারে না। কেননা, Bureny Naung বর্মীরাজ আরাকান রাজকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে বর্মীরাজের মৃত্যুর পর তিনি স্বস্তি পেয়েছেন এবং ত্রিপুরা রাজের কাছ থেকে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রামু, চট্টগ্রাম জয় করে নেন।[২]

রাজমালায় বলা হয়েছে 'রাম্বু আদি করি রাজা ছয় খানা লয়/ দেয়াঙ উড়িয়্যা রাজ্য লইবে আশয়।' রামু দেয়াঙ রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ত্রিপুরা বাহিনী তাই দেয়াঙ দখল না করে কি করে রামু জয় করে নিয়েছে– এ নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ত্রিপুরা রাজার পার্বত্য পথে অভিযান অনুকূল ছিল। তাই সম্ভবত রামু দখল করে নেয়।

এই সময় রামুর গুরুত্ব ছিল চট্টগ্রামের পরেই। এই অঞ্চলে যতগুলো রাজ্য ছিল এগুলো সম্পর্কে ইউরোপীয় পরিব্রাজকরা বারবার মন্তব্য করেন। এগুলোর সবগুলোর

১। *Foster, Ralph Fitch*, p. 26

২। *A History of Chittagong*, p. 234

আয়তন এবং মর্যাদা সমান ছিল না। চট্টগ্রাম এবং রামুর অবস্থান ছিল অন্যগুলোর চেয়ে ভিন্ন : the Facts incicate the preeminence of the two 'kingdoms' Chittagong and Ramu over others.[১] রালফ ফিচের বিবরণে রামুর গুরুত্ব বিবেচনা করে আরাকানের সঙ্গে রামুর নাম যুক্তভাবে রাজ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।[২] ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে জনৈক মিশনারি চট্টগ্রাম এসেছিলেন। তিনি রামুকে 'The Kingdom of Ramu' বলেছেন।[৩] ত্রিপুরা উপাখ্যান এবং অন্যত্রও রামুকে রাজ্য বা দেশ হিসাবে বিবৃত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম এবং আরাকান যাওয়ার মাঝখানে রামু আলাদা গুরুত্ব বহন করে।

৩. সেবাস্টিয়ান ম্যানরিকের বিবরণ

আরাকানিরা রামুকে 'প্যানোয়া' বলে জানত। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ ধর্মযাজক ম্যানরিক আরাকানের পথে জালি নৌকায় চড়ে রামুতে আসেন। রামু থেকে অনেক কষ্টে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌছেন। তিনি ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ৫ই জুলাই রামু পৌছেন। রামু পর্যন্ত তার ভ্রমণ কাহিনী নিম্নরূপ :

in the silence of the night, we embarked on a gelia named by powerful rowers. Their strong arms carried us along a narraw, boiling river, acroses the mouths of several streams and arms of sea, all dangerous to navigate owing, as I have remarked, to our being in the depth of winter which in these regions is very tempestuous specially along the coasts. However on the third day of our journey we reached the city of Ramu just at the hour when night was spreding her sable mantle over the earth accompanied by heavy rain lader clouds which discharged their watery produce, giving us no opportunity of landing." ৬ জুলাই ম্যানরিক রামুর গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গভর্নর তাকে আন্ত রিকতার সঙ্গে স্বাগত জানান। (There he was recieved by the governor with every show of courtesy and kindness) তিনি সম্মানিত অতিথি হিসেবে দুই দিন অবস্থান করেন। গভর্নর তাকে নদীপথে যেতে পরামর্শ দেন। ম্যানরিক প্রত্যুত্তরে বলেন, the route along the river bank would be the easiest. কিন্তু এমন বৃষ্টি হচ্ছিল তাতে পানির স্রোত প্রবল বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হাতি দিয়েও নৌকা টেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। গভর্নর তাদেরকে নদীপথে নয় স্থলপথে যাত্রার পরামর্শ দেন। ৭ই জুলাই এরা পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। ঐ দিনেও বৃষ্টি থাকায় এরা একটি আচ্ছাদিত দাঁড় টানা নৌকায় চড়ে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় তার সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল তিরাশি জন। ম্যানরিক এবং তার দলের লোকজন বাঁকখালী নদীপথে গর্জনিয়া– সম্ভবত নৌচলাচলের শেষ মাথা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নিয়েছিলেন। সেখানে এরা হাতির জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। হাতিগুলি বেশ সুসজ্জিত করে আনা হয়েছিল, the ele-

১। *A History of Chittagong*, p. 276

২। *Foster, Ralph Fitch*, p. 25

৩। *Bengal past and present*, XIV. p 148

phants were equipped with howdah, "fully furnished with mattesses. rugs and cuhions and well closed in with wax-cloth above and curtains on the sides."[১] ৮ জুলাই এরা আন্তঃদেশীয় পরিভ্রমণ শুরু করেন। যাত্রার শুরুতে একটি ঘটনা ঘটে। একটি মস্তবড় ভয়ঙ্কর বাঘ (a fierce tiger, as large as young bull) একটি লোককে ধরে নিয়ে আসে। লোকটিকে যখন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে উদ্ধার করা হয় তখন সে মারাত্মকভাবে শারীরিক জখমের শিকার। এখানে বনাঞ্চল তখন এত গভীর ছিল যে এদেরকে বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পথ থেকে বন্য জন্তু তাড়িয়ে অগ্রসর হতে হয় (occasionally firing a short, in order to scare wild animals off the road).

ম্যানরিক যখন পরিভ্রমণে আসেন (১৬৩০ খ্রিঃ) তখন রামুর গভর্নরকে পমাজা (Pomaja) বলা হতো। ম্যানরিকের বিবরণ মতে তখন রামু সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'the chief town in this District, and the usual seat of the Viceroy in charge.[২]

ডঃ সুনীতি কানুনগো Pomaja শব্দটি ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, The word 'Pomaja' originates in 'panwa-sa', the eater of panwa (the Arakanese name of Ramu) that is its fiefholder, who took (ate) the revenues, sending a share to the king (manrique 1, 94. n). The governor was also known as Ramu-sa ro the fiefholder or Ramu (Manrique-91). The term 'sa' meaning ester or holder is current among the tribes man of Chittagong Hill Trackts. The revenue collector in the Magh society is known as Soogree [Journal of the Asiatic Society of Bengal, IV (1835), p. 36]. This is the colloquial form of Sa-gri or the great 'sa' or eater of the revenue (A History of Chittagong, p. 279).

ম্যানরিকের বিবরণ অনুযায়ী গভর্নর আরাকান রাজার পক্ষে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিভাগ বিশেষের (chancery) প্রধান ছিলেন। তিনি সকল প্রকার রাজস্ব আদায় করতেন। বিদেশীদের কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য তার কাছে পেশ করতে হতো। তিনি এগুলো পরীক্ষাক্রমে বৈধ হলে আরাকানে যাবার অনুমতি দিতেন। আরাকানে তাই রামুর ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

সিকান্দর শাহের আমলে গোটা চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে চলে যায় এবং ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন আরাকান রাজের অধীনে থাকে। সেলিম শাহ (Meng Radzagyi) ১৫৯৩-১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ দ্বীপ ফতেখারকুলের স্কুল ছাত্র মনির আহমদ, পিতা জনাব কালু সওদাগর ৩টি পুরাতন মুদ্রা মাঠে কুড়িয়ে পান। মুদ্রাগুলি রামুর খিজারী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক ড. আবদুল করিমের নিকট প্রেরণ করেন। এই মুদ্রাগুলি আরাকানরাজ সেলিম শাহের নামাংকিত। সেলিম শাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যামিনী মোহন ঘোষ বলেন, Salim Shah the King of Arakan became very powerful. He had eleven wives. He married the daughter of the ruler of Chittagong as also the daughter of Tripura king and most strange of all, he married the beauti-

১। *A History of Chittagong*, p. 308

২। *Marique I*, 276

ful sister of Ratta Rai of Sripur.[১] মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, রামু সেলিম শাহের অধীনে ছিল।

তার সময়ে পর্তুগিজদের ক্ষমতা দখল এবং সুবাদার ইসলাম খানের আরাকান আক্রমণের প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পর্তুগিজদের এক নৌবহরের কাপ্তান ছিলেন জনৈক ফতেখান। ফতেখান বিদ্রোহ করে পর্তুগিজদের আখড়া সন্দ্বীপ অধিকার করেন। পর্তুগিজ জলদস্যুদের নেতা ছিলেন গঞ্জালিশ। তিনি সন্দ্বীপ ও তৎ সন্নিহিত চট্টগ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। ফতেখান সন্দ্বীপ অধিকার করে সমস্ত পর্তুগিজকে হত্যা করেন। তখন গঞ্জালিশ দক্ষিণ শাহবাজপুর (বাখরগঞ্জ জেলায়) দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ফতে খানের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সেবাস্টিয়ান পিন্টু (Sabistian Pinto) ফতেখানকে হত্যা করেন।

পর্তুগিজ বিবরণ অনুযায়ী সেলিম শাহের দুই পুত্রের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ আশঙ্কা করে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ অন্নপুরমকে রাজধানী থেকে সরাবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের আল-মানজা বা গভর্নর নিযুক্ত করেন। অন্নপুরম এতে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিংহাসনে বসে তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই চট্টগ্রামে এসেই ভ্রাতার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য সন্দ্বীপের শাসনকর্তা গঞ্জালিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সেলিম শাহের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মেন খামোং আরাকানের সিংহাসনে বসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। অন্নপুরম পরাজিত হয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ সন্দ্বীপে আশ্রয় নেন। অন্নপুরম ও সন্দ্বীপের শাসনকর্তা উভয়ে আরাকানের রাজার সঙ্গে গোপনে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিছুদিন পর অন্নপুরম মারা যান।[৩]

পর্তুগিজ বিবরণটির সঙ্গে মির্যানাথনের তথ্যের পার্থক্য আছে। এই বিবরণে দেখা যায়, অনিক ফাঙ্ক-সেলিম শাহের ভ্রাতুস্পুত্র সন্দ্বীপের শাসনকর্তা গঞ্জালিশের বিরুদ্ধে ইসলাম খান চিশতির সাহায্য প্রার্থনা করেন।[৪] যাই হোক এ বিষয়গুলো আমাদের আলোচনায় মুখ্য নয়। এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় আছে। তা হলো এই যে, উল্লিখিত ফতেখানকে কোনো কোনো লেখক রামুর নরপতি বলেছেন। কবি নরসুল্লাহ খান বলেছেন, 'রাম্বু দেশের নরপতি নামে ফতে খান'। ডঃ মুহাম্মদ এনামুলক হক এই ফতে খাঁনকে রামুর নরপতি বা শাসনকর্তা বলে অভিহিত করেছেন।[৫] ড. আবদুল করিম অবশ্য ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, রামুর নরপতি ফতেখান পর্তুগিজ নৌবহরের কাপ্তান হওয়ার যুক্তি নেই এবং রামুও কখনো স্বাধীন রাজ্য ছিল না।[৬]

১। to make their valid, p. 277

২। Jamini Mahan Ghosh, B. A. Magh Raidies in Bengal-pub-Calcutta, Patna, Allahabad, 1960 p. 14

৩। *Travels of Sebastien Manrique*, vol, I, p 311

৪। Bahar-i-stani-ghaibi, vol, I, (Assam 1936), p 87

৫। মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ১৭২-১৭৩

৬। নসরুল্লাহ বিরচিত *শরীয়তনামা*, পাণ্ডুলিপি চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক, আনিসুজ্জামান, পৃঃ ১৭৮

সেলিম শাহের সঙ্গে পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা গঞ্জালিশের নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোগলদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য গঞ্জালিশ এবং সেলিম শাহের মধ্যে সমঝোতা হয় (১৬১০ খ্রিঃ)। কিন্তু গঞ্জালিশ বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেলিম শাহের নৌবাহিনীকে (২২০ নৌযানে ৪০০০ সৈন্য) এককভাবে যুদ্ধ করতে হয়। ফলে সেলিম শাহের পরাজয় ঘটে। তিনি একটি হাতিতে চড়ে কয়েকজন সৈন্যসহ চট্টগ্রাম দুর্গে পালিয়ে আসেন।[১] গঞ্জালিশ আরাকানি নৌযানগুলি দখল করে নেন এবং কাপ্তানদের হত্যা করেন। শুধু তাই নয় তিনি রামুসহ কয়েকটি দুর্গও লুটপাট করেন : He took possession of the Arakanifleet with which he was entrusted and murdered all Arakan captains. What is more, with, a bold effrontery he set out with his fleet and plundered all the forts on the Arakan coast especially those of Chittagong, Maju and Ramu.[২]

সেলিম শাহের মৃত্যুর পর মেঙ খামৌং (১৬১২-১৬২২ খ্রিস্টাব্দ) (হোসেন শাহ) আরাকানের শাসনভার গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে তাকে প্রথমে অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছে– সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পর্তুগিজদের বিরোধিতাও লাভ করেছিলেন। মোগলদের সঙ্গে তার যুদ্ধ বেধেছিল। নোয়াখালী ফেনী এবং উত্তর চট্টগ্রামেই এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। মেঙ খামৌং এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র Thiri Thudranma বা দ্বিতীয় সেলিম শাহ (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ) আরাকানের অধিপতি হন। তাঁর সময়ে ম্যানরিক রামুতে আসেন। ম্যানরিকের বিবরণ পূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে। ম্যানরিক রামুর গভর্নরের ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ এবং প্রীত হয়েছিলেন। আরাকানের রাজদরবারেও সম্মানজনকভাবে ম্যানরিককে গ্রহণের পেছনে রামুর গভর্নর কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। ম্যানরিক তাকে an enlightened ruler and great friend of the Portuguese বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু চট্টগ্রামের গভর্নর সম্পর্কে আপাত বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের গভর্নর (নাম উল্লেখ করা হয় নাই) ১৬২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েই চট্টগ্রাম এবং দিয়াঙ এর সকল পর্তুগিজ নেতাদের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন। রাজকীয় সম্মানে অতিথিদের বরণ করা হয়। শহরের দ্বারপ্রান্তে গভর্নর তাঁর হস্তি বাহিনী এবং বাদ্যমন্ত্রী দলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রেরণ করেন। গভর্নর তার বক্তব্যে পর্তুগিজদের সহযোগিতা করেন। অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করার পর অতিথিদেরকে ম্যানরিকের ভাষায়, a magnificent feast which Lasted most of the night accompaning it with every indication of pleasure and good will.[8] পরিবেশন করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময় তিনিই একে evil intentions ছাড়া আর কিছু নয় বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ তার ভাষায় গভর্নর at once began to intrigue so as to destroy Portuguese. পর্তুগিজদের সঙ্গে

১। *Danvers* op. cit, II, 146

২। *Campos,* op. cit. 87

৩। *Menrique* I. 88

৪। *Manrique,* p. 89

এই বিরোধের চিত্রটি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। গভর্নর আরো সৈন্য চেয়ে আরাকানের রাজার কাছে চিঠি পাঠান। নৌবহরের ক্যাপটেনকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পর্তুগিজদের বন্দি করতে নির্দেশ দেন। যদি এতে ব্যর্থ হয় Karamkari কে নির্দেশ দেয়া হয় যে, to besiege them (the portuguese) with as large a force as he could raise, placing the navy in charge of the Governor of Ramu.[৫] ম্যানরিকের বিবরণে আরো জানা যায় যে, ম্যানরিকে আরাকান রাজের কাছে পর্তুগিজদের এই ভয়াবহ অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করে বলায় (২ জুলাই ১৬৩০ খ্রিঃ) আরাকান রাজ Karamkari কে অবরোধ তুলে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন এবং চট্টগ্রামের গভর্নরকে চাকরি থেকে অপসারণ করার প্রতিশ্রুতি দেন।[৬] সম্ভবত রাজানুজ মানগাট রাইকে (Mangat Rai) চট্টগ্রামের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

১৬৩৮-১৬৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের আরাকানি শাসন বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল হলেও রক্তাক্ত। রাজা Thiri Thudhamma-এর পুত্র Meng Tsa-ni সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার আটাশ দিনের মাথায় বিধবা রাজপত্নীর প্রেমিক Narapadigyi এর হাতে নিহত হন।

Narapadigyi সিংহাসন দখল করেন এবং ১৬৩৮-৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র Thado Min-tar সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পর্তুগিজদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে জানা যায়। থাডু মিনটার-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র চন্দ্র সুধর্মা (Thudhamma) আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ' নানা কারণে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন। তাকে 'one of the most enlightened kings of the Mrauk-u dynesty' বলা হয়েছে।[৩]

এছাড়া তিনি বৃহত্তম চট্টগ্রামে সার্বভৌমত্বের অধিকারী শেষ আরাকানরাজ।

৪. মোগল আক্রমণ

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের চট্টগ্রাম প্রবেশ করার সময় আরাকানি রাজার চাচাতো ভাই চট্টগ্রামের গভর্নর ছিলেন বলে শিহাবুদ্দীন তালিশ তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন। এই সময় আলমগীরনামা অনুযায়ী আরাকান রাজের ভ্রাতা রাউলি (Rawli) রামুর গভর্নর ছিলেন।[৪]

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান আরাকানিদের পরাজিত করেন এবং চট্টগ্রাম জয় করেন। শায়েস্তা খানের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রধান সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খান ঐ বছর ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম দুর্গে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেন। কর্ণফুলী নদী পার হয়ে মোগল সৈন্যরা আরাকানি দুর্গসমূহ দখল করে নেয়। অনেক মুসলিম আরাকানিদের কাছে বন্দী ছিল। এই সুযোগে ছাড়া পেয়ে এরাও আরাকানিদের তাড়া করে।

১। *Munrique*, p. 90

২। *Munrique*, p. 55

৩। Maung San Shwe Bu, The report of the Superintendent, Arachaelogical Survey of Burma (1921), Rangoon, p. 37

৪। *Studies*, p. 212

আরাকানিরা রামু দুর্গে আশ্রয় নেয়। বুজুর্গ উমেদ খান তার সেনাপতি মীর মর্তুজাকে রামু দুর্গ অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। আলমগীরনামায় বলা হয়েছে রামুর পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম এবং বন্ধুর। এই দুর্গম পার্বত্য এলাকা বারো দিনে অতিকষ্টে অতিক্রম করে মীর মর্তুজা রামু দুর্গ অবরোধ করেন। আরাকান রাজের ভাই রাউলি– যিনি দুর্গের গভর্নর ছিলেন– যুদ্ধ করে পরাজিত হন। তিনি তার সৈন্য বাহিনীসহ পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নেন। মীর মর্তুজা আরাকানি সৈন্যদের তাড়া করে হত্যা করেন এবং মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করেন।

আরাকান রাজ রামু দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন সৈন্য প্রেরণ করেন। বুজর্গ উমেদ খাও মীর মর্তুজার সাহায্যের জন্য সিয়ানা খান ও দিলজাক খানের অধীনে নতুন সৈন্য প্রেরণ করেন। এদের সঙ্গে এক বিরাট গোলন্দাজ বাহিনী আসে। আরাকানি বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে গোলন্দাজ বাহিনীকে হটিয়ে দেয় এবং বিপদগ্রস্ত করে অগ্রসর হয়। এতে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধে আরাকানি বাহিনী পরাজিত হয় এবং রামু দুর্গ মোগল বাহিনীর হাতে যায়।

এই সময় বর্ষা এসে যায়। পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব নয় ভেবে বুজুর্গ উমেদ খান মীর মর্তুজাকে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। রামু দুর্গের অবরোধ তুলে নেওয়া সম্পর্কে আলমগীরনামায় বলা হয়েছে, As the space between and intersected by one or two streams which can not be crossed with out boats and as in the rainy season the whole path is fooded and this year there was only a small stave of provisions and the rainy season was near, therefore the sending of Mughal army into Arakean was put off.[১] ইংরেজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত রামু আরাকানের অধীনে থেকে যায়।

৫. চাকমা বিজয়

সুগত চাকমা 'চাকমা পরিচিতি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরি আরাকানের রাম্বু পর্যন্ত জয় করে নেন। রামু জয় করে চট্টগ্রাম ফেরার পথে শুনতে পান তার পিতা মারা গেছেন। সে সুযোগে তাঁর ছোট ভাই সমরগিরি সিংহাসন দখল করে নেন। এতে বিজয়গিরি মর্মাহত হয়ে স্বসৈন্যে স্বদেশে না গিয়ে বিজয় করা রাজ্যে রাজত্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরাকানের দিকে রওয়ানা দিয়ে রামুর অদূরে সা-প্রে-কূল নামক স্থানে গিয়ে তাঁর অনুগত সৈন্যদের সেখানে বসবাসের ও স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করার অনুমতি দেন। উপরে বর্ণিত সা-প্রে-কুলই আমাদের আজকের রামুর চাকমারকুল গ্রাম।

'সাম্ব' সম্ভবত সাক (Sak) চাকমা শব্দের অপভ্রংশ, বার্মিজ শব্দ 'প্রেম্ব' অর্থ রাজ্য। সম্পূর্ণ শব্দ সা-প্রে-কুল অর্থাৎ চাকমা রাজ্যের কূল। মনে করা হয় বাঁকখালী নদীর উত্তর পাড় পর্যন্ত চাকমা রাজ্য এবং দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত আরাকান রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত সে কারণেই বাঁকখালী নদীর উত্তর পাড়ে চাকমারকুল এবং দক্ষিণ পাড়ে রাজারকুল

১। S. N. H. Rizvi, *Chittagong District Gazetteer*, p. 48

নামের দুটি গ্রামের পত্তন বলে অনেকেই মনে করেন। শেরমন্ত খাঁ ও জবরদস্ত খাঁর নামে রামুতে দুটি জমিদারি ছিল। চাকমাদের ইতিহাসে শেরমন্ত খা এবং জবর দস্ত খাঁ নামে দু'জন রাজার কথা বলা হয়েছে। তাঁদের রাজত্বকাল অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ। জবরদস্ত খাঁ শেরমন্ত খাঁর ছেলে। চাকমা লোকগাথায় শেরমন্ত খাঁ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

আদি রাজা শেরমন্ত খাঁ, রোয়া ছিল বাড়ী
তার পরেতে শুকদেব বান্দে জমিনদারী।

৬. শাহসুজা সড়ক

সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যকার উত্তরাধিকার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে বাংলা ত্যাগ করে আরাকানে আশ্রয় নেন। পরাজিত হয়ে ৬ রমজান ১০৭০ হিজরি (৬ মে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ) ঢাকা ত্যাগ করেন। ৩ জুন চট্টগ্রাম বন্দরের বিপরীতে দিয়াঙ পৌছেন। ২৬ আগস্ট আরাকানের রাজধানী ম্রহাং পৌছেন। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। পাহাড়ি বন্ধুর পথে এই যাত্রা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর।

শাহ সুজা যখন পালিয়ে চট্টগ্রাম আসেন তখন চন্দ্র সুধর্মা আরাকানের রাজা ছিলেন। শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণ অনুযায়ী রাজার চাচাতো ভাই চট্টগ্রামের গভর্নর ছিলেন। এ ছাড়া আলমগীরনামা অনুসারে রাজার ভ্রাতা রাউলি ছিলেন রামুর গভর্নর। মনে করা হয় যে, আরাকানের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুজা আরাকানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ চট্টগ্রামে এসে সুজা তার সঙ্গীদের নিয়ে যে পথ অনুসরণ করেন তা কিন্তু এই মত সমর্থন করে না।

আলমগীরনামা অনুসারে আরাকান রাজের নির্দেশ কতগুলো আরাকানি এবং পর্তুগিজ যুদ্ধ নৌকায় করে চট্টগ্রামের গভর্নর শাহসুজা এবং তার সঙ্গীদের আরাকানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।[১] ঐতিহাসিক কাফিখান বলেন, দু'টি নৌকায় করে শাহসুজা সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ও মনি মাণিক্য নিয়ে এসেছিলেন।[২] Maneel's বলেন, পর্তুগিজ জলদস্যুরা আরাকান উপকূলে সুজার এই সব ধন-সম্পদ লুট করে নেয়।[৩] ইংরেজ এবং ডাচদের বিবরণ অনুযায়ী শাহ সুজা বাংলা থেকে দিয়াঙ এসেছিলেন আরাকান রাজের যুদ্ধ জাহাজে চড়ে।

কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন সুজা আসাম, ত্রিপুরা (কুমিল্লা) এবং চট্টগ্রামের পাহাড়ী বনাঞ্চল দিয়ে আরাকান গিয়েছিলেন। Riyaz us salatin গ্রন্থের লেখক বলেছেন, Sultan Shuja with a number of followers took the road Assam and from thence proceeded to (Arakan). Charles Steuart বলেন, having enred the wild moutains of Tippera, after along and weari some Journey he reached Chittagong. আলেকজান্ডার ডাও, এ. পি. ফেয়ার, L, SSO. Malley এই মত সমর্থন করেন।

১। *Alamgirnama*, p. 556, 562
২। *History of India as told by own Historians*, ed. H. M Elliot and Dowson, VII. 254
৩। *Manucci*, I. 370

পাহাড়ি ও বনাঞ্চলের পথ অনুসরণের বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আরাকান রাজের সঙ্গে শাহ সুজার পূর্ব যোগাযোগ প্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত শাহ সুজা পাহাড়ি বনাঞ্চল অনুসরণ করে নতুন রাস্তা নির্মাণ করে আরাকানে পৌঁছেছিলেন।

প্রাচীনকালের মানচিত্রে চট্টগ্রাম হতে আরাকানের ভিতর দিয়ে নিম্ন বার্মার প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাস্তার অস্তিত্ব দেখা যায়। ড. নীহার রঞ্জন রায়সহ অন্যান্য পণ্ডিতরা মনে করেন এটি নবম থেকে একাদশ শতকের কোনো এক সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে। তখন চন্দ্র বংশীয় রাজারা আরাকান শাসন করতেন। চট্টগ্রাম অধিকারের পর এ রাস্তাটি নির্মিত হয়। প্রাচীনকালের মানচিত্র দেখে বর্তমান রাস্তাটির অবস্থান নির্ণয় বেশ কঠিন হলেও চট্টগ্রাম আরাকান সড়ক নির্মাণের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। শাহ সুজা কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত রাস্তা সর্বত্র ব্যবহার করেননি। ড. আবদুল করিম আরাকান সড়ককেই শাহ সুজা সড়ক বলে অভিহিত করেছেন। বর্ণিত অবস্থায় তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়ার জো নেই। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৩ খ্রিঃ) রামুর উপর দিয়ে সুজা সড়ককে দেখানো হয়েছে। অন্যত্র কিন্তু তার অস্তিত্ব নেই। দীর্ঘ তিনশত চৌত্রিশ বছর পরও রামুর তিনটি ইউনিয়নে প্রলম্বিত রাস্তাটির অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শাহ সুজা এবং তাঁর সঙ্গীরা বেশ কিছু সময়, বলা যায়, মাসাধিককাল এখানে অতিবাহিত করেছেন। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী লোকালয়হীন শ্বাপদ সংকুল এই এলাকাকে এরা অবস্থানের জন্য নিরাপদ মনে করেছেন। পাকিস্তান আমলে গর্জনিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অর্থে শাহ সুজার অবস্থানের স্থানগুলোর হেফাজত করা হতো।

ড. আবদুল করিম কক্সবাজারের ইতিহাসে বলেছেন, কক্সবাজার জিলার শাহ সুজা রোডের ধারে কয়েকটি স্থানের নাম আছে যেমন– ঈদগড়, ঈদগাহ, ডুলাহাজারা এবং শাহপরী নামে একটি দ্বীপ আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে এই স্থানগুলি শাহ সুজার স্মৃতি বিজড়িত। বলা হয় যে, ঈদের আগে শাহসুজা এবং তার সহযাত্রীবৃন্দ ঈদগড়ে পৌঁছেন এবং সেখানে অবস্থান নেন ও ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করেন। এই জন্য স্থানগুলি যথাক্রমে ঈদগড় এবং ঈদগাহ নামে পরিচিত হয়। তিনি আরো মনে করেন যে, রমজান মাসের ৬ তারিখে (৬ মে) (ড. করিম ১৬ মে বলে উল্লেখ করেছেন সম্ভবত ভূলক্রমে। কারণ তাঁর উদ্ধৃত সিদ্দিক খানের লেখায় ৬ রমজান তারিখে ১৬৬০ ইংরেজি সনের ৬ই মে বলে উল্লেখ করা হয়েছে) ঢাকা ত্যাগ করেন। চট্টগ্রামে পৌঁছেন ৩ জুন। চট্টগ্রামে পৌঁছার পর ১০ জুন রমজানের ঈদ সম্পন্ন হয়। এই তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ ৬ই মে তারিখে ৬ রমজান হলে ৭ জুন ঈদ হবার কথা, চাঁদের ২৯ দিনে ঈদ হলে আরো একদিন আগে ঈদ হবার কথা)। অনুরূপভাবে কোরবানীর ঈদের তারিখ ১৭ আগস্টও সঠিক নয়। অবশ্য সৈয়দ মর্তুজা আলী মনে করেন, শাহসুজা কক্সবাজারে ঈদ-উল ফিতরের নামাজ পড়েন।[১] এ তথ্যটি সঠিক বলে ধরে নেয়া যায় এবং ঐ দিন ছিল ৭ জুন। ঈদের নামাজ আদায় করে তিনি আরাকানের উদ্দেশে রওনা হন। সম্মুখে রামুর গভর্নর রাউলিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যই সম্ভবত পথ পরিবর্তন করেছিলেন।

১। S.M Ali, *History of Chittagong*. p-51

আরাকান রাজের সঙ্গে পূর্ব যোগাযোগের প্রেক্ষিতে তার আরাকান যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে রামুর গভর্নরকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। বরং মনে করা যায় যে একটি সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াবার জন্যই তিনি আরাকান সড়ক পথে না এসে বিকল্প পথ সৃষ্টি করে পাহাড়ি পথে আরাকান চলে গেছেন।

ঈদগড়ে অবস্থানকালে ১০৭০ হিজরীর ১০ই জিলহজ কোরবানীর ঈদের নামাজ আদায় করেন। আর এই জন্য স্থানটির নাম ঈদগড় হয়ে থাকবে।

কক্সবাজারের ঈদগাঁও নামক স্থানে শাহ সুজা ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন বলে প্রফেসর করিম মত প্রকাশ করেছেন। তা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। আমাদের বিবেচনায় শাহ সুজা এবং তার সফরসঙ্গীগণ ঈদগাঁও এলাকায় যান নাই। কারণ আরাকানে পালাবার সময় শাহ সুজা যে রাস্তা নির্মাণ করেন এই রাস্তার অস্তিত্ব বর্তমানে ডুলাহাজারা থেকে পাহাড় ও বনাঞ্চল দিয়ে রামুর ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া ইউনিয়নেই বিদ্যমান। ডুলাহাজারা থেকে ঈদগাঁয়ের দূরত্ব ৯ কিলোমিটার এবং ঈদগড় থেকে ঈদগাঁওর দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। নিজেদের নির্মিত রাস্তা বাদ দিয়ে এত দূরে শাহ সুজা কিংবা তার লোকজনের অনাবশ্যকভাবে ঈদগাও এলাকায় তখন শুধু নৌ পথেই আসা সম্ভব ছিল। বাস্তবে তা ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রফেসর করিম আরাকান সড়ককে শাহ সুজা সড়ক মনে করায় এই বিভ্রান্তি হতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়
ইংরেজ আমল

ইংরেজ শাসনের সূচনা

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর কাসিমের এক রাজকীয় ফরমান মূলে বাংলার সঙ্গে চট্টগ্রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রাম শাসনের প্রথম দিকে দলিল দস্তাবেজে দেখা যায় রামুসহ সারা কক্সবাজার চট্টগ্রামের অধীন ছিল। কোম্পানি রামু পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। আরো জানা যায় যে, চট্টগ্রামের সীমা নাফ নদী পর্যন্ত যে বিস্তৃত ছিল একথা কোম্পানির জানা ছিল না। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বিষয়টি অবগত হয়ে নাফ নদীর সীমা পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব বিস্তৃত করে।

কোম্পানি আমলের শুরুতেই এ অঞ্চলে পর্তুগিজদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। তবে আরাকানি মগদের দস্যুবৃত্তি বেড়ে যায়। কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রথম প্রধান (চিফ) হ্যারি ভেরে লেস্ট আরাকানের রাজার নিকট চিঠি লিখে এই দস্যুবৃত্তি বন্ধের জন্য অনুরোধ জানান।[১]

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কমিটি অব সার্কিট চট্টগ্রামকে নয়টি চাকলায় বিভক্ত করে। এই চাকলাদারী ব্যবস্থা কিংবা পাঁচশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি ব্যবস্থায়ও এখানকার ভূমির ব্যবস্থাপনা বা কোম্পানি শাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথম দিকে কোম্পানি রামুর প্রতি এতটা মনোযোগী ছিল বলে মনে হয় না। কিছুসংখ্যক জমিদার সম্ভবতঃ পরবর্তী সময় রামু এবং চকরিয়ার কয়েকটি তরফ বন্দোবস্তি নেয়।

আরাকানের মতোই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রামুকে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক হেড কোয়াটার হিসাবে বিবেচনা করে। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রামু একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক থানার মর্যাদা লাভ করে। সম্ভবত আরাকানি মগদের দস্যুবৃত্তির জন্য এখানে একটি থানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে এই থানা স্থানান্তরিত করে কক্সবাজার নিয়ে যাওয়া হয়। এ থানায় স্থানীয় থানাদাররাও চাকরির সুযোগ লাভ করতেন। ফ্রান্সিস বুকানন এ রকম একজন থানাদারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

I here a visit from Puran Bisungri, the Tannader of Ramoo who although a Hindoo was born in Arakan, aequainted with that country and writes with facility its Language. On the Burma invansion (1784) he fled and having been useful tc Colonel Erskine, Whilst the Burma Troops were in this province. He has been appointed to his present office, is the case of the police in the District of Ramoo.[২]

১. A. M. Serajuddin, *The Revenue Administration of East India Company in Chittagoong*, P 21-22

২. *Francis Buchanan in South East Bengal* (1798) edited by Willem Van Schendel, P 79

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে রামু শুধু প্রশাসনিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল না, এখানকার গুরুত্ব বার্মা সরকার এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের জন্যেও। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি সরকার প্রকাশ্যে বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইস্তেহার ঘোষণা করে। কোম্পানি সরকার তাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রধানকে রেঙ্গুনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে বর্মিদের আধিপত্য আছে এমন স্থানগুলোর ওপর লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্মীপক্ষে মহাবন্দুলার নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে আরাকান হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের তুলনায় ইংরেজ সৈন্য সংখ্যা কম হলেও ইংরেজদের আস্থা ছিল এই যে, এরা চট্টগ্রাম কেন আরাকানকে পর্যন্ত বশীভূত করতে পারে। এই ডিভিশনের একটি অংশ যাতে সৈন্য সংখ্যা ছিল পদাতিক ৩০০ এবং কয়েকশ' স্থানীয় সৈন্য, ক্যাপ্টেন মরটুনের নেতৃত্বে রামু এসে পৌঁছায়। এরা বর্মি সৈন্যদের দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়।

বর্মি সৈন্যবাহিনী ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নাফ নদী অতিক্রম করে রামুর ১৪ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মহাবন্দুলার নেতৃত্বাধীন ৪০০০ সৈন্য এই অভিযানে অংশ নেয়। ১৩ মে বর্মি বাহিনী রামু থানার অন্তর্গত একটি ছোট নদী অতিক্রম করে বাঁকখালী বা খুরুলিয়া পৌঁছায়। ১৫ মে এরা বাধার সম্মুখীন হয়। ১৭ মে ভোরে এরা ক্যাপ্টেন মরটুনের ক্যাম্পের ১২ মাইলের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় মরটুনের নেতৃতাধীন প্রশিক্ষণবিহীন স্থানীয় সৈন্যরা পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মরটুনের একটি সিপাহী দলকে ঘেরাও করলে এরা তিন দিন যুদ্ধ করে অবশেষে পেছনে হটে যায়। কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে ক্যাপ্টেন মরটুন এবং তার পাঁচ অফিসারসহ বহু সিপাহীকে প্রাণ দিতে হয়। এই যুদ্ধে মরটুনের বিচ্ছিন্ন বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[১] বর্মিরা এখনো এই যুদ্ধকে 'Battle of Penowa' বলে এবং এই দিনটি উদ্‌যাপন করে। পরাজয়ের এ খবর পূর্ববঙ্গের সর্বত্র– এমনকি কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা এক সময় আরাকান অধিকার করেছিল ঠিকই; কিন্তু রামুর এই যুদ্ধে পরাজয় তাদের ইতিহাসে গ্লানির এক বড় তিলক হিসাবে আজও বিরাজমান।

ইংরেজ আমলে যুদ্ধবিগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে রামু আবার বিবেচনায় আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। মিত্রশক্তি রামুতে ঘাঁটি স্থাপন করে। এখানে একটি বিমান বন্দরও স্থাপন করা হয়। রামুতে অসংখ্য প্যাগোডা বা কেয়াং থাকায় মিত্রশক্তি ধরে নেয় যে, জাপানিরা এগুলোর ওপর বোমা হামলা করবে না। কার্যত তাই হয়েছিল। রামুর অদূরে আরাকান এলাকায় জাপানিরা অবস্থান নিলেও এখানে বোমা হামলা করে নাই। জানা যায় আইয়ুব খান এ অঞ্চলে মিত্র শক্তির অফিসার ছিলেন। রামকোট এলাকায় মিত্রশক্তি একটি টাকশাল স্থাপন করে। এর অস্তিত্ব এখনো বর্তমান।

২. আরাকানি উদ্বাস্তু সমস্যা

আরাকানি উদ্বাস্তু সমস্যা দীর্ঘকালের সমস্যা। বর্তমানে কক্সবাজারে বার্মা থেকে আগত প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু অবস্থান করছে। রামুর চারটি ক্যাম্পে (ধেচুয়া-১,

১। *Eastern Bengal District Gazetteers*, P 28, by 'O' Malley, Calcutta 1908

ধেচুয়া-২, ধোয়াপালং এবং মহেষকুম) প্রায় ৪০,০০০ হাজার উদ্বাস্তু অবস্থান করছে– যদিও প্রত্যাবাসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আরাকান বা বার্মা থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের প্রথম ইতিহাস জানা যায় অষ্টাদশ শতকে। এই শতকের চার দশক হতে আরাকানে দেখা দেয় বিদ্রোহ, হত্যা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আরাকান রাজসভার সভাপদ হারি আরাকান রাজ থামাদাকে অপসারণকল্পে বার্মার আলাওপায়া রাজবংশের রাজা বোধপায়াকে আমন্ত্রণ জানান।[১] রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইংরেজ কিংবা ফরাসিরা আরাকান অধিকার করে বর্মার জন্য হুমকি হতে পারে এই আশঙ্কায় বোধপায়া ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান আক্রমণ করে নেন।

এরপর বিজয়ী বাহিনী বিজিত বাহিনীর ওপর অত্যাচার আর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। আরাকান রাজ থামাদা নৌকাযোগে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়েন। বর্মিরা ব্যাপক হারে আরাকানিদের গ্রেপ্তার করে পুরুষদের হত্যা করে এবং স্ত্রী লোকদের বার্মা পাঠিয়ে দেয়।[২] হাজার হাজার আরাকানি এই অবস্থায় বাংলাদেশে চলে আসে।[৩]

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারিত আরাকানিরা প্রাক্তন রাজবংশের ওয়েসো নামে জনৈক বংশধরকে রাজা হিসাবে মনোনীত করে বর্মি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বর্মিরা এই বিদ্রোহ দমন করে। এরপর অত্যাচার আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। এ সম্পর্কে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইরাস্কিন বলেন, বর্মিরা বিজিত ও নিরীহদের ওপর অত্যাচারের জন্য দায়ী। আমার আদৌ সন্দেহ নেই যে হাজার হাজার নর-নারী ও শিশুকে সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যা করা হয়েছে।[৪]

বর্মি সৈন্যদের অত্যাচারে আরাকানি উদ্বাস্তুদের দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা রামুসহ কক্সবাজারে আশ্রয় নেবার পেছনে রতন লাল চক্রবর্তী কতিপয় কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমত, ভৌগোলিক দিক হতে চট্টগ্রাম আরাকানের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামের সঙ্গে ছিল আরাকানের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক। তৃতীয়ত, চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকানিদের বিদ্রোহ পূর্ব বসতি উদ্বাস্তুদের চট্টগ্রাম আগমনে উৎসাহিত করে। চতুর্থত, তুলনামূলকভাবে তৎকালীন পরিস্থিতিতে আরাকান অপেক্ষা চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা জোগায়। পঞ্চমত, আরাকানে ব্যাপক অরাজকতার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়।[৫]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বস্তুত আরাকানি উদ্বাস্তুদের তাদের শাসন এলাকায় বসতি দানের নীতি গ্রহণ করেছিল– যদিও বার্মা সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পত্র যোগাযোগ বা সমঝোতার উদ্বাস্তু ও বিদ্রোহী সর্দারদের প্রশ্রয় না দিয়ে বার্মায় ফেরত পাঠাবার আভাস

১। D.G.E. Hall, *Burma* (London-1950) p. 94

২। A Aspinal, English Relations with Burma in the time of Cornwallis and Shore (1786-1798) Bangla past and present, p 101

৩। G. F. Harvay, *Burma* P. 149

৪। Colonel to the Commander *in chief* P. c 25 April, 1794 No 14 M. S K E. P.P VOL. I P 94

৫। *বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক* পৃঃ ১১-১২

পাওয়া যায়। কোম্পানির প্রদত্ত আহার্য, ভূমি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার পেছনে দুটি দিক স্পষ্টত ফুটে ওঠে। এর মধ্যে মানবতাবোধ থাকলে ও দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি চাষোপযোগী করে তোলা এবং জনবসতি বাড়িয়ে তোলা কোম্পানির লক্ষ্য ছিল।[১] জনবসতি এবং কর্তনযোগ্য জমি বাড়লে কোম্পানির ঈপ্সিত রাজস্ব বাড়বে এটি কোম্পানি স্পষ্টই বুঝেছিল। এছাড়া স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কোম্পানির ইপ্সিত ও উচিত রাজস্ব পাচ্ছিল না বলে মনে হয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে কোম্পানি কলকাতার সুপ্রিম কাউন্সিলের মতামত অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বতন কোণ রামু ও পার্বত্য এলাকায় বসতি দিতে চেষ্টা করে।[২] কিন্তু ক্রমে ক্রমে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করে। ১৭১৮ খ্রিঃ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উদ্বাস্তু সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪০,০০০। পরে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায় এবং এক সময় রামুতেই লক্ষাধিক উদ্বাস্তু আশ্রয় নেয়। বর্মিদের অত্যাচারের ভয়াবহতা এর কারণ। কোম্পানি এলাকা ছেড়ে উদ্বাস্তুরা কোনো অবস্থাতেই আরাকান যেতে চাইত না এই কারণেই। এ সম্পর্কে ম্যালকম জন বলেন,[৩] উদ্বাস্তুদের ঘোষণা ছিল, "আমরা আর আরাকানে ফিরে যাব না। আপনারা যদি এখানে আমাদের বধ করেন, আমরা বধ্য হতে রাজি। যদি আপনারা আমাদের বিতাড়ন করেন, আমরা বন্য পশুর বাসস্থান বিশাল পাহাড়গুলোতে, বনজঙ্গলে আশ্রয় নেব।

ব্যাপকহারে উদ্বাস্তু আসার ফলে ক্ষুধা, রোগ ও জীর্ণতায় বহু লোক মারা যায়। নাফ নদীর তীরবর্তী রাস্তায় স্তূপীকৃত জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ ও মাতা-শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।[৪] একই প্রসেডিংয়ে বলা হয়েছে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে মৃত্যুর ভয়াবহতা বিরাজমান। প্রতিদিন বিশ থেকে ত্রিশটি শিশুর প্রাণহানি ঘটেছে। দরিদ্র উদ্বাস্তুদের অবস্থা খুবই সংকটজনক।[৫]

৩. উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করে। এর আগে কক্স রেংগুনে কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন।[৬] আরাকানি উদ্বাস্তুদের চট্টগ্রাম আগমন এবং বর্মি সরকারের এতদসংক্রান্ত মনোভাবের কথা তার জানা ছিল। এখানে তাঁর মূল কাজ ছিল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নীতিমালা প্রণয়ন, স্থান নির্ধারণ এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে জীবিকা ও জমি

১। Lieutenant to the 2nd Battallion to Governor General, 28 December, 1794, B.S.R.C D, Vol 443, P-28.

২। রতন লাল চক্রবর্তীর *বাংলাদেশ বার্মা সম্পক*, পৃঃ ১২

৩। *Political History of India* (London, MDCCI: XXVI) vol-11, P. 550

৪। Extract from the proceeding of the vice president in Council, 1 March, 1799, B.S R.C.D. Vol 515, P. P. 49, 102 Para-6

৫। *Ibid.* Para-9

৬। খ. পরিশিষ্টে কক্স-এর বার্মা মিশন সম্পর্কে রতন লাল চক্রবর্তীর একটি তথ্য বিবরণ সংযোজন করা হলো।

বণ্টন। এছাড়া উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক ত্রাণ তৎপরতা তো আছেই।

সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে কক্স-এর চট্টগ্রাম আগমনের কথা ব্যাপকভাবে জানিয়ে দেবার জন্য দক্ষিণ কর্ণফুলীর জমিদারদের প্রতি কোম্পানি নির্দেশ আরোপ করে।[১] উদ্বাস্তুরা তখন এক জায়গায় না থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কোম্পানির মনোভাবের প্রতি স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান এবং স্থানীয় জমিদাররা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এমন কি স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানরাও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন মেনে নেয়নি। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ এপ্রিল ফ্রান্সিস বুকানন রামু ভ্রমণ করেন। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা ভ্রমণের ওপর তার ভ্রমণ বিবরণীতে উদ্বাস্তু সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানদের বিরূপ মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য বারপালং ও নাফ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি জেলা গঠনসহ উদ্বাস্তুদের নিজস্ব কর্মচারী দ্বারা এটি পরিচালনার প্রস্তাব করেন।[২] জমিদাররা ভূমির স্বত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করেন। এই অঞ্চলের জমির স্বত্ব নিয়ে শের মোস্তফা, কালীচরণ, সাদুদ্দীন, গৌরীশঙ্কর, শিবচাঁদ প্রমুখ জমিদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। জমির ভুয়া দাবিদারও ছিলেন কেউ কেউ। জমির মালিকানা নিশ্চিত করবার জন্য কক্সকে কমিশনারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কক্স-এর স্থান নির্বাচন ছিল সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। কোম্পানি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কক্স সরকারি মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলেই পুনর্বাসনের স্থান নির্ধারণ করেন। দক্ষিণাঞ্চলে ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্বাস্তুরা বসবাস শুরু করে দিয়েছিল ; উত্তরাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করার পক্ষে পূর্বে বোর্ড অব রেভেনিউ সদস্য টমাস গ্রাহাম জোর সুপারিশ রেখেছিলেন। তিনি দক্ষিণাঞ্চলে পুনর্বাসনে প্রতিবন্ধকতার প্রশ্ন তোলেন।

তিনি মনে করেন– (১) দক্ষিণকূল পুনর্বাসন করলে বার্মা সরকারের সঙ্গে কোম্পানির দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে, (২) বার্মা সরকার কোম্পানির এই ব্যবহার উস্কানিমূলক মনে করতে পারে, (৩) দক্ষিণাংশে বসতি দেওয়া হলে উদ্বাস্তুদের আরাকান হামলায় কোম্পানি যে পরিমাণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তদানুপাতে দক্ষিণাংশের নয়াবাদে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সুবিধা হবে না।[৩] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেন। বলেন, জমিদার ও রায়তের স্বার্থহানি না করে আরাকানি উদ্বাস্তুদের এই অঞ্চলে পুনর্বাসনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, আরাকানি উদ্বাস্তুরা এই অঞ্চলে চাষাবাদে রাজি হবে না। কারণ কৃষক হিসাবে চাষাবাদে শ্রমানুপাতে উৎপাদন কম হবে। এছাড়া স্থানীয় জমিদাররাই তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে

১। Magistrate of Ctg. to the collector of Ctg, 7 February, 1799, B. S R C.D, vol 516, PP 59-60

২। *Francis Buchanan's Journey through Chittagong to Tippera* 1798, India office Manuscripts ADD 19286 Sch-65754. তাঁর ভ্রমণ বিবরণীটি অবশ্য Willem Vam Schendd-এর সম্পাদনায় University Press Limited বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। রামুর অংশটি পরিশিষ্ট ক-তে সংযোজন করা হলো।

৩। Board of Revenue to Governor General, p. c. 27 February 1795, No. 3. H. S K. C. P Vol-2 PP 330-32

উদ্বাস্তুদের চাষাবাদে উৎসাহী করে না।[১] চট্টগ্রামের কালেক্টর মি. ফ্রায়ার বোর্ড অব রেভিনিউ এবং এডওয়ার্ড কোলব্রুকের মতামতের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

ক্যাপ্টেন কক্স-এর দক্ষিণাঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কারণ ছিল এই যে, (১) চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে চাষাবাদ ও বসতি সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন, (২) উদ্বাস্তুদের বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবে পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে এরা একে-অন্যের সাহায্য করতে পারবে এবং নিজেদের প্রাচীন আইনের মাধ্যমে শাসিত হয়ে বনভূমি আবাদ করে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে, (৩) উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগতভাবে পুনর্বাসন সাময়িকভাবে লাভবান করবে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্বাস্তুদের জীবন হবে দরিদ্র ও ভবঘুরের মতো এবং তারা এই নিরাপত্তাহীন জীবন বেশিদিন পছন্দ করবে না।[২] তাই তিনি উদ্বাস্তুদের রামু নদী অথবা নাফ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুনর্বাসনের স্থান নির্বাচন করেন। এই অঞ্চল নির্বাচনের পেছনে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, (১) উদ্বাস্তুরা নিজেরাই এসব জায়গা পছন্দ করছে, (২) এখানকার অধিকাংশ জমিই অনাবাদী এবং সম্ভবত যে কোনো বৈধ দাবি হতে মুক্ত (৩) জঙ্গল পরিষ্কার কষ্টসাধ্য হলেও আবাদ করে কোম্পানির রাজস্ব এবং আয় বৃদ্ধি সম্ভব, (৪) এই অঞ্চলে পূর্ব থেকে বসবাসকারী আরাকানিরা উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতে পারবে, (৫) এই অঞ্চল সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় উদ্বাস্তুদের মৎস্য শিকার এবং বাণিজ্য সুবিধা রয়েছে (৬) উদ্বাস্তুদের এই অঞ্চলে পুনর্বাসনে তিনি একটি প্রশাসনিক সুবিধাও দেখেন। আর তা এই যে তাদের জঙ্গি স্বভাব মুগ, বর্মি বা পার্বত্যবাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে লাগবে। তবে তিনি কিছু অসুবিধাও লক্ষ করেন। প্রথমতঃ কোম্পানির প্রতি বর্মি সরকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ আরাকানি বিদ্রোহী সর্দারদের আক্রমণের প্রবণতা। সমকালীন নথিপত্রে তার প্রমাণ না থাকলেও বার্মা মিশনে কক্স এর তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্ভবত তাকে উদ্বাস্তুদের এ অঞ্চলেই পুনর্বাসিত করে বর্মি সরকারের মাথাব্যথার কারণ সৃষ্টি করার কাজে উৎসাহী করে তুলেছে। কক্স-এর বার্মা মিশনটি ছিল মোটামুটি ব্যর্থ এবং মর্যাদাহানীকর। কখনো কখনো তাকে অদক্ষ অফিসার মনে হতে পারে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল বলিষ্ঠ এবং তৎপরতা ছিল বেগময়। তিনি বার্মা সরকারের যে কোনো আক্রমণ মোকাবেলার জন্য রামু নদীর তীরে (বাঁকখালী) মাহেরকুলে সেনা ঘাটি স্থাপনের সুপারিশ করেন।[৩] তিনি রামু হতে উলিয়াঘাট ও নাফ নদী পর্যন্ত তীর হতে ত্রিশ মাইল দূরত্ব রেখে একটা রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব করেন। অবশ্য পূর্বে লেফটেনেন্ট টমাস ব্রগহাম এই রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব করেছিলেন।[৪] এই রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব বোর্ড অব রেভিনিউ

১। Ibib

২। *Proceedings of the vice Precident*, 1 March, 1799, B.S.R C.D. Vol 515, P P 49-102, Para, 16-13 Passim

৩। *Proceedings of the vice Precident*, 1 March, 1799, B S R. C D Vol 515, P P 49-102, Para, 18-25 Passim

৪। *Commander to the Governor Genaral* P, C 9 January 1725, no-47 M S. K. e P.P.Vol-2, pp-264-70

সমর্থন করে।[১] রাস্তা নির্মাণের কাজে কক্স উদ্বাস্তুদের নিয়োগ করেন। রামু হতে উলিয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের জন্য বোর্ড অব রেভিনিউ ঢাকার কালেক্টরকে ৩৫০০ কোদাল প্রেরণের নির্দেশ দেন।[২]

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কক্স চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী আরাকানি উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নিরূপণের জন্য জমিদারদের প্রতি নির্দেশ দেন। জমিদারদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক সংখ্যা দাঁড়ায় মোটামুটি ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)। এরপর তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন এই মর্মে যে, যারা চট্টগ্রামে বসবাস করতে চায়, তারা যেন তাদের দলীয় বা পরিবার প্রধানের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা এবং পছন্দনীয় এলাকা কোম্পানিকে জানায়। এই বিজ্ঞপ্তির ফলে ২২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে ১,৬৬৫ জন পুরুষ, ৭৯৫ জন মহিলা এবং ৬২৫ জন শিশু তালিকাভুক্ত হয়। এরা চাষাবাদে আগ্রহ দেখায়।[৩] উদ্বাস্তুদের সংখ্যা তুলনায় তালিকাভুক্তির চিত্র নগণ্য। তার কারণ এই যে, উদ্বাস্তুরা শঙ্কিত ছিল যে, পাছে তাদের বার্মা পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এ কারণে কক্স প্রথমেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেন নাই।

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মালিকানা সম্পর্কে বোর্ড অব রেভিনিউ সরাসরি মন্তব্য করে যে, আরাকানি উদ্বাস্তুদের বন্দোবস্ত দেবার জন্য পতিত জমির উপর কোনো ব্যক্তিবর্গেরই প্রকৃত স্বত্ব নেই। কোম্পানিই মৌলিকভাবে চট্টগ্রামের জমিদারির স্বত্বাধিকারী এবং এই অঞ্চলের জমি কোনো ভূমধ্যকারীর সঙ্গে বন্দোবস্তী করা হয়নি। যারা পতিত জমির স্বত্ব দাবী করতে চায় এরা সরকারের প্রতিষ্ঠিত আইনে আদালতের আশ্রয় নিতে পারে।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে জমি বণ্টন করা হয়। ৪/৫ জন উদ্বাস্তু সদস্য নিয়ে গঠিত প্রতি পরিবারের জন্য ৬ কানি বা তৎকালীন হিসাবে ১,০০৬৮০ বর্গফুট জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই জমির প্রধান ফসল ধান। এছাড়াও মরিচ, তামাক, মটরশুটি প্রভৃতি ফসল জন্মে। প্রতি কানিতে প্রথম ফসল ৪০ হাড়ি বা ১০ মণ ধান, দ্বিতীয় ফসল ২০ হাড়ি বা ৬ মণ ২০ সের ধান জন্মে। একজন উদ্বাস্তু ৫১৮৪০ বর্গফুট জমি লাভ করে। প্রত্যেক পরিবারকে ছয় মাসের জন্য অগ্রিম খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়। উল্লেখিত পরিবার প্রতি ৮০ হাঁড়ি ধান যার তৎকালীন বাজার মূল্য ৬ টাকা ১২ আনা প্রদান করা হয়। একজন উদ্বাস্তুকে দেওয়া হয় ৩০ হাড়ি বা ৯ মন ৩০ সের– যার মূল্য ২ টাকা ৮ আনা।[৪]

উদ্বাস্তুদের মধ্যে কৃষির বাইরে যারা পেশাজীবী ছিলেন তাদের জমি দেবার অনাবশ্যক তাগিদ বোধ করেননি ক্যাপ্টেন কক্স। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের নিজ নিজ

১। Collector of Chittagong to the Board of Revenue, 21 August, 1799, B S R C. D Vol 515 pp 217-26

২। *Board of Revenue to the Collector of Ducca*, Date nil, B, Sir, C D Vol 515, P 207

৩। *Proceedings of the vice Precident* 1 March, 1799, B,S,R, C.D. Vol. 515, P P 49-102, Para, 13-15 Passim.

৪। *Proceedings of the vice Precident*. 1 March, 1799, B S R. C.D. Vol. 515, P P 49-102, Para 28-30 Passim

পেশায় সহজ শর্তে নির্দিষ্ট হারে অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করেন। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাদের ধর্মযাজক 'ফুংগি' এবং অন্যান্য যারা এসেছিলেন এদেরও অগ্রিম জীবিকার ব্যবস্থা করেন মি. কক্স। তিনি মনে করেন, এই ব্যবস্থায় মানবিক দায়িত্ব পালন করা হবে, দুর্বলেরা ধীরে ধীরে শ্রমিক হয়ে উঠবে, অলসতার দোষ পরিহার করে তাদের যৌথ উদ্যোগ জনগণের স্বার্থ বয়ে আনবে।[১]

উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত জীবনে তাদের আইন ও প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এখানকার আইনকে, প্রথাকে উপেক্ষা করা হয়নি– সমন্বয় সাধনের একটি শর্ত লক্ষ করা যায়। ক্যাপ্টেন কক্স সঠিকভাবে কোম্পানির স্বার্থ স্বীকার করে পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করেন। তিনি রামু হতে উখিয়ারঘাট পর্যন্ত প্রস্তাবিত রাস্তার দুই পার্শ্বে উদ্বাস্তুদের বসতি দেবার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি আদর্শ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[২] বনভূমি পরিষ্কার ও আবাদের জন্য উদ্বাস্তুদের ২০০ কুঠার, ১০০ কাঁটারি, ১২ খানা বড় কাঁচি, ২০টি করাত, ৫০টি সুচালু কুঠার, ১০০টি কোদাল এবং ৪টি বড় শান পাথর দেওয়া হয়।

ফ্রান্সিস বুকাননের সঙ্গে ক্যাপ্টেন কক্স-এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথা জানা যায় না। তা সত্ত্বেও বুকাননের মতামতের সঙ্গে কক্স-এর কাজের মিল রয়েছে। স্থানীয় সরকারি কর্মচারী ও জনগণের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্বার্থ চেতনা নিয়ে সংঘাত দেখা দিয়েছিল। জানা যায় স্থানীয় উদ্বাস্তুদের অভিযোগক্রমে চট্টগ্রামের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট জন স্টোন হাউজ স্থানীয় থানাদারকে অন্যত্র বদলি করেছিলেন। এই থানাদার ক্যাপ্টেন রিডের প্রয়োজনে উদ্বাস্তুদের এলাকায় আসলে এদের মধ্যে উত্তেজনা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। ক্যাপ্টেন কক্স পুনরায় এই থানাদারের অপসারণ দাবী করেন। স্থানীয় কর্মচারী ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে কক্স পৃথক তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। এই তদন্ত কাজে স্থানীয় অধিবাসী, থানাদার বা কাজী অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।[৩] কোম্পানি ক্যাপ্টেন কক্সকে কমিশনার নিযুক্ত করেন। তবে কোম্পানির নির্দেশ থাকে যে, মারাত্মক অপরাধগুলোর বিচার নিয়মিত আদালতে হতে হবে। এই পর্যায়ে কোম্পানি কমিশনারকে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়ানী সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব সংক্ষিপ্ত ও সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করে। কমিশনারকে দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার উদ্বাস্তুদের আইন ও প্রথানুসারে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়।[৪]

আরাকানি উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে পুনর্বাসনের পূর্বেই ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স মারা যান। তিনি ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। রামু বাঁকখালী তীরে কক্সকে সমাহিত করা হয়েছিল বলে রামুতে একটি কথা প্রচলিত আছে। নদী ভাঙ্গনে নাকি সেই সমাধি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কচ্ছপিয়া নামটি 'কক্স প্রিয়া' থেকে হয়েছে বলে অনেকে

১। Proceedings of the vice President, 1 March, 1799, B S.R. C.D. Vol. 515, P P 49-102 Para, 28-30 Passim

২। রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ৩৫

৩। *Proceedings of the vice President*, 1 March, 1799, B S R C.D. Vol 515, P P 49-102, Para, 34-37 Passim

৪। রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক* পৃ. ৩৬-৩৭

মনে করেন। জনশ্রুতি আছে, কক্স নাকি প্রিয়া সন্দর্শনে বাঁকখালী নদী হয়ে গর্জনিয়া যেতেন। কক্স-এর প্রতি এখানকার মানুষের ভালোবাসাই এসব কথা উপকথার জন্ম দিয়েছে সন্দেহ নেই। উদ্বাস্তু তো বটেই, স্থানীয় লোকদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর কাজকর্মে। বার্মা মিশনের একজন ব্যর্থ কর্মকর্তার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে প্রভূত সাফল্য আর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন দলিলগুলোতে। পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স-এর নামানুসারে 'কক্সবাজার'-এর পত্তন ঘটে।

কক্স-এর মৃত্যুর পর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন ঢাকার রেজিস্টার মি. কার। তিনি রামু হতে উখিয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আরাকানি উদ্বাস্তুদের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাদের জন্য ঢাকা হতে নৌকা এবং বাকেরগঞ্জ থেকে চাল আমদানি করতে হতো। কেবল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে লক্ষ্মীপুর ও বাকেরগঞ্জ থেকে ১৪৫০০ মণ চাল আনা হয়েছিল।[১] ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন হতে ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত আরাকানি উদ্বাস্তুদের জন্য রামুতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫০২৯-২১ সিক্কা টাকা।[২] আরাকানি উদ্বাস্তুদের জীবন-যাপনের মান উন্নত ছিল না। চাষবাস ছাড়া অন্যান্য সামান্য পেশায় এরা নিয়োজিত ছিল। কোম্পানি উদ্বাস্তুদের চাকরিও দিয়েছিল যোগ্যতা অনুসারে। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট জন স্টোন হাউজ প্রুন নামে এক আরাকানিকে রামুর দারোগা নিয়োগ করেন। উদ্বাস্তুদের ভাষা, রাজনীতি, কৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রুন কর্ণেল ইরাস্কিনের সহায়তা করেছিলেন। বর্মি প্রতিক্রিয়ার মুখে তাকে রামু থেকে সাতকানিয়া বদলি করা হয়।[৩] ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম-এর ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রামুতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের জীবিকার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। তাদের অনেকেরই চাষযোগ্য জমি আছে। এদের একদল ব্যবসা করে এবং অন্যান্যরা জমিদারদের অধীনে শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে।[৪]

উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে রামুসহ গোটা কক্সবাজারে একটি আরাকানি উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

৪. আরাকানি সর্দারদের বিদ্রোহী তৎপরতা

আরাকানি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আরাকানের বিদ্রোহী সর্দারগণ বার্মা সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। কোম্পানি শাসিত বাংলাদেশ তাদের জন্য নিরাপদ ছিল এবং বর্মিদের আক্রমণের জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। আরাকানি সর্দাররা বার্মা অধিকৃত আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করে লুটতরাজ করত। এরা মাঝে মধ্যে কোম্পানি এলাকায়ও আক্রমণ ও লুটতরাজ চালাত। সমসাময়িক লেখক এইচ.

১। B.S.R.C.D. Vol. 516, P P 579

২। Inspecter of Public Granaries to the Collecter of the Ctg. 29 November, 1800. B.S R.C D. Vol. 519. PP 339-40

৩। Magistrate of Ctg. to Secretary to the Government, P. C, 7 August, 1747, No-3, M. S. K C. P. P. Vol-2. P. 512

৪। Magistrate of Ctg. to Secretary to the Government, P. C, 5 November, 1801, No-18, M. S. K. C. P. P. Vol-5 PP. 1334-37

এইচ. উইলসন মন্তব্য করেছেন, তাদের প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর এবং তাদের আক্রমণ রাজনৈতিক নয় বরং লুটতরাজমূলক।[১] মগ জলদস্যুদের লুণ্ঠনের কলঙ্কিত ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্তে কয়েক শতাব্দী ধরে এই লুটতরাজ স্থায়ী ছিল। তা সত্ত্বেও আরাকানি সর্দারগণ দস্যুবৃত্তিতে তৎপর ছিলেন না, চট্টগ্রামে অবস্থান করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই এরা বর্মিদের উপর আক্রমণ চালান। এই আক্রমণ এক সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ লাভ করে। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পি. ডব্লিউ. পিচেল আরাকানিদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে স্বীকার করেছেন।[২]

আরাকানি সর্দারদের কোম্পানি এলাকায় আশ্রয় এবং বার্মা আক্রমণ কোম্পানি সরকারের সঙ্গে বর্মি সরকারের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কওতি নামে এক আরাকানি সর্দার কোম্পানি এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্মি গভর্নর কওতিকে আশ্রয় না দেবার জন্য কোম্পানিকে অনুরোধ করেন। এক পর্যায়ে কওতির সন্ধানে বর্মি সেনারা কোম্পানি এলাকায় ঢুকে পড়ে। কোম্পানি মেজর এলাকাকে সীমান্ত রক্ষার জন্য কালেক্টর ক্রফটস ঢাকার কালেক্টর মেথিউকে নৌকা সরবরাহ করার জন্য চিঠি পাঠান। এই সময় কওতি কোম্পানি এলাকায় বর্মি সেনার গুলিতে নিহত হন। বর্মি সেনারা আরাকানে ফিরে যায়।[৩] ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে আরেকজন বিদ্রোহী সর্দার কোম্পানির পরোক্ষ সহায়তায় বর্মিদের হাতে ধরা পড়ায় বর্মি সরকারের সঙ্গে কোম্পানি সরকারের সম্পর্ক সহজ হয় এবং পারস্পরিক উপহার বিনিময় হয়।[৪]

কিন্তু তা ছিল সাময়িক। কেননা, বর্মিরা সন্দেহ শুরু করে যে, হানাদার সর্দারগণ কোম্পানি কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত না হলেও তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পেছনে কোম্পানির হাত আছে। কোম্পানি বস্তুত এই পর্যায়ে বিদ্রোহী সর্দারদের কর্মকাণ্ড প্রশ্রয় না দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল বলেই মনে হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো অনাবশ্যক সমস্যায় কোম্পানি বার্মা সরকারের প্রতিপক্ষ হতে চায়নি। তবে চেষ্টা করেও কোম্পানির সামরিক কর্মচারীবৃন্দ ও পুলিশ সর্দারদের গেরিলা আক্রমণ বন্ধ করতে পারেনি। এখানকার প্রাকৃতিক কারণ বিদ্রোহীদের বনে-জংগলে লুকিয়ে যেমন আক্রমণে সহায়তা করেছে তেমনি কোম্পানির ভারতীয় সেনা বা পুলিশের তুলনায় সর্দাররা অধিক শক্তিশালী ছিল। বার্মা সরকারের সঙ্গে বাণিজ্যিক শীতল সম্পর্ক মাঝে মধ্যে এই তৎপরতায় যেমন নির্লিপ্ততা এনে দিয়েছে তেমনি ছোট খাটো ঘটনাগুলো বৈরিতাকে দিয়েছে উস্কে। সীমান্তে বেড়েছে প্রবল উত্তেজনা। চট্টগ্রামের কালেক্টর শিয়ারম্যান বার্ড এই অবস্থায় সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বর্মিদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের জন্য গভর্নর জেনারেল জন শোর কর্নেল ইয়াস্কিনকে সেনাপতি হিসেবে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন এবং কলকাতা ও ঢাকা

১। Wilson, H.H. Narrative to the Burmese war in 1824-26 (London-1852) PP-3-4

২। রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১৩।

৩। Colonel to the commander in chief P C 25 April, 1794, No 14 M.S K.L PP, Vol. 1 P. 94

৪। Colonel to the Secretary to Govt P C 10 November, 1794, No 11. M.S.K E PP, Vol 1 P. 234

থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন।

তবে গভর্নর জেনারেল জন মোর বৃহত্তর বাণিজ্যিক স্বার্থে বার্মা সরকারের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি মনে করেন, বর্মিদের আক্রমণাত্মক কাজ শত্রুতার অভিসন্ধিতে নয় বরং একে ভ্রান্ত উদ্দেশ্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।[১] তিনি বিদ্রোহী এ্যাপোলংকে তার দু'জন সহকর্মীসহ বর্মি সরকারের কাছে বন্দী করে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মনে করেন, এ্যাপোলং এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যদি বিশ্বাসযোগ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা হয় তাহলে বর্মিদের নিকট তাকে হস্তান্তর করতে বাধা থাকতে পারে না।[২] বর্মিদের আরাকান দখলের পর এ্যাপোলং বোধপায়া সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে বার্ষিক কর প্রদানে সম্মত থাকায় এ্যাপোলংকে একটি দ্বীপের স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। ১৭৯৩ খ্রিঃ শ্যাম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে অতিরিক্ত রাজস্ব ও খাদ্যশস্য দাবি করলে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং কোম্পানি এলাকায় চলে আসেন। গভর্নর জেনারেল জন শোরের এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে এ্যাপোলং এবং তার দু' সহকর্মীকে দক্ষিণ আরাকানের সান্ডোয়া মিয়োসার নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৩] গভর্নর জেনারেলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন জি. ই. হার্বে, এ পি ফেয়ার, বেফিল্ড প্রমুখ বার্মার ইতিহাস প্রণেতাগণ।[৩] এতে বর্মি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিক হয়।

৫. চিন পিয়ানের তৎপরতা

এ্যাপোলংকে বর্মি সরকার নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপর দীর্ঘদিন আরাকানিদের বিদ্রোহী তৎপরতা স্তিমিত হয়ে থাকে। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে আরাকানি নেতা চিন পিয়ানের নেতৃত্বে সবচেয়ে শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। চিনপিয়ানের ছদ্মনাম ছিল কিং বেরিং। তার পিতা ঈ খান দি ছিলেন বর্মিরাজের একজন শাসনকর্তা। শ্যাম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অধিক হারে রাজস্ব ও খাদ্যশস্য দাবি করায় তিনিও বর্মিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সীমান্তের এ পাড়ে চলে আসেন।

কোম্পানির গভর্নর জেনারেলকে লেখা চিনপিয়ানের এক চিঠিতে দেখা যায়, ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স চিনপিয়ান এবং তার অনুগামীদের মধ্যে টাকা-পয়সা, গো-মহিষ এবং কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি বিতরণ করেন।[৪] প্রথমটায় এরা উদ্বাস্তু হিসাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন বলে মনে হয়। যাই হোক, চিন পিয়ানের তৎপরতায় কোম্পানি সরকার এবং বার্মা সরকার অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ম্যাজিস্ট্রেট পি. ডব্লিউ. পিচেল চিন পিয়েনকে সীমান্তে অপসারণের সুপারিশ করেন। শুধু তাই নয়, ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে হারভাং থেকে পাঁচশ আরাকানি উদ্বাস্তু টেকনাফে বসবাসের জন্য স্থানান্তরে উদ্যোগী হলে চিন পিয়ানের সঙ্গে যোগ দিতে পারে এমন আশঙ্কায় মিচেল স্থানান্তরের ওপর

১। Secretary to the Govt. to the commander in chief, P. C 7. April, 1794, No-37. M.S K.C.P.P Vol 1., P. P. 166-67

২। Boards Remark, P C 11 August, 1794. No-12, M.S.K.C.PP. Vol-1, P-232

৩। A.P. Phayre, *History of Burma* (London - 1883) P 197

৪। Envoy to the court of Ara to the Viceroy of Pegu, P C. November, 1811, No- 4. M S K C P P, Vol-5, P. 1303

নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। চিন পিয়ানকে গ্রেপ্তারের জন্য চাপরাশী প্রেরণ করা হয়। অপর দিকে চিন পিয়ান কোম্পানির নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁর মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি জানান আরাকানের চার-পঞ্চমাংশ তার অধিকারে রয়েছে এবং আরাকান সম্পূর্ণভাবে দখল করা হলে তিনি কোম্পানিকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করবেন। তিনি কোম্পানির নিকট হতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।[১] কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো চিন পিয়ানের সমস্ত প্রস্তাব দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।[২] ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি রাজধানী ব্যতীত প্রায় সমগ্র আরাকান চিন পিয়ানের হস্তগত হয়। বর্ষাজনিত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চিন পিয়ান রাজধানী ম্রোহং জয়ের চেষ্টা করেন। কোম্পানি চিন পিয়ানকে সাহায্য দিতে অস্বীকৃতি জানালেও চিন পিয়ান প্রচার করেন যে, তিনি কোম্পানির সাহায্যপুষ্ট হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। তা প্রমাণ করার জন্য তিনি কোম্পানি সৈন্যদের লাল পোশাক তৈরি করে তার সৈন্যদের দেন এবং কোম্পানির কিছু সৈন্যকে ভাতা প্রভৃতি দেওয়ার মাধ্যমে হাত করে নেন। এই অবস্থায় কোম্পানি বাংলাদেশের লোকদের আরাকানে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৩] চিন পিয়ান ম্রোহং অবরোধ করলে বর্মি সৈন্যদের আত্ম সমর্পণের শর্তসমূহ পালন করা হয়নি– যার জন্য তার জয় স্থায়ীত্ব লাভ করেনি। বর্মি সৈন্য এবং বর্মি অনুগত আরাকানি জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করার কারণে সংঘবদ্ধ প্রতি আক্রমণে চিন পিয়ানকে পিছু হটে আসতে হয়।[৪]

পরাজিত হয়ে চিন পিয়ানের অনুসারীরা চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্যাপ্টেন ক্যানিং চিন পিয়ানকে তার অনুসারীসহ চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তবে লর্ড মিন্টো চিন পিয়ানের অনুসারীদের চিহ্নিত করেন, আলাদা শ্রেণীতে সনাক্ত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। চিন পিয়ানের প্রতি কোম্পানির মনোভাবটি স্পষ্ট নয়। কেননা, ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে চিন পিয়ান টেকনাফের দারোগার হাতে ধরা পড়েও পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।[৫] এতে বর্মিদের মনোভাবে আবার পরিবর্তন দেখা দেয়। কোম্পানি আবার চিন পিয়ানকে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা নেয়। এ পর্যায়ে কর্নেল মর্গান চিন পিয়ানের পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে চিন পিয়ানকে গ্রেপ্তার করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতে আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ গ্রেপ্তারকৃতদের বর্মি সরকারের হাতে হস্তান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কোম্পানি সদস্যদের হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক ছিল না। ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ বর্মি সরকার ক্ষুব্ধ হতে পারে। ফলে তাদের ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৬] চিন পিয়ানকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে এবং অন্যদের ধরিয়ে

১। প্রাগুক্ত পৃ. ১৩০৬-১২

২। প্রাগুক্ত

৩। B. R. Peam, King Berring, T.B R.S Fiftieth Anniversary Publications No-2. P 450

৪। Anil Chandra Benergee, *The Eastern Frontier of India,* P. P. 157 and 163-64

৫। Magistrate of Ctg. to the secretary to govt. S. E. 8 May, 1812, No. 18, M.S.K.E.S.P. Vol-2, P. P. 604-605.

৬। Magistrate of Ctg. to the Secretary to govt. S. C. 30 November, 1812, No. 78, M. S.K.C.S.P vol- 5, P. P. 1325-31

দেওয়ার জন্য ৫০০০ এবং ১০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। এছাড়া তাকে সাহায্য করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। এ সময় চিন পিয়ান পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে টেকনাফ এলাকায় হোলিয়া পালং, রাজা পালং, রত্না পালং এবং জালিয়া পালং দখল করে নেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে চিন পিয়ানের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। লে. ইয়ং এবং অনসিল ক্যাম্বেল একটি বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন এবং রামুর সুবেদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কক্সবাজার আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।[১] এর থেকে মনে হয় সমস্ত কক্সবাজার এলাকা চিন পিয়ানের দখলে চলে গিয়েছিল। এই অভিযানে কোম্পানি কক্সবাজার দখল করে নেয়। চিন পিয়ান আরাকানের দিকে অগ্রসর হন। আরাকানের মঙ্গল সাই নামক স্থানে বর্মিদের সঙ্গে এক যুদ্ধে চিন পিয়ান পরাজিত হয়ে পুনরায় রামুর পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামুতে তার তৎপরতা সম্পর্কে হেমিলটনের হিন্দুস্থান (১৮২০) গ্রন্থ থেকে জানা যায়–

–from this period commenced an innossant migration of Maghs of Arakan in this district, which was also selected as an asylum by all the adjacent in surgent 31. chief from the Burma dominions especially a leader named king berring, whose adherents were estimated at 3000 men. In April 814, a parly of 500 Burmese troops pursued this chief into Chittagong and proceeded to Gajania, where, in less than 24 hours, they crected a double stockade, above 120 yards square filled in the interior with crow's feet and sharpen stakes. With in the second stockade they dug a trench, bordered by a parapet 1F (1,2) feet thick and nearly high enough for protection against musguetry. One additional days work would have rendered the stockade a most for midable military positon, but on the approch of 125 of the company's tropps under captain Fogo, they lost heart and retreated.

রামুর মধ্য সমভূমি হতে পাহাড়িয়া অঞ্চলে চিন পিয়ানকে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হতো বলে জানা যায়।[২] এখান থেকে তিনি গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন এবং বলেন যে, তার শাস্ত্রে আছে তিন বছর যুদ্ধ করলে তিনি নিশ্চিতভাবে আরাকান জয় করতে পারবেন।[৩] কোম্পানি চিঠিগুলো বার্মা সরকারের কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

চিন পিয়ানের বিরুদ্ধে কোম্পানি সৈন্যদের বার বার ব্যর্থতা লক্ষ্য করে গভর্নর জেনারেল ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্মি সাহায্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তাই বর্মি সৈন্যরা গর্জনিয়া অভিযান চালায়। গর্জনিয়া গ্রামে এরা লুটতরাজ চালায়। কিন্তু দাবী করে যে, এই লুটতরাজের জন্য চিন পিয়ান দায়ী। বর্মি সেনারা নয়, চিন পিয়ানের লোকেরা এই লুটতরাজ চালিয়েছে বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু কোম্পানি বিষয়টি অনুধাবন করে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব করে। বর্মি সরকার তা

১। উদ্ধৃত Eastern Bengale Rist. Gazetteers, by L.S.S.O. Malley, P. 119 (Calcutta-1908)

২। Commander to the Lieutenant colonel, S. C. 12, November, 1813, No 26, M. S. K. C. S. P. Vol-6 P 1744.

৩। King Berring to the Magistrate of Ctg. P. 1746

প্রত্যাখ্যান করে।[১]

এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ফগো কোম্পানির নিকট একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন, উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠন করতে হবে এবং রামু এলাকার সমতল ভূমিতে তাদের বসতি দিতে হবে। আর তা হলেই রামুর পাহাড়ে চিন পিয়ানকে খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট পিচেল রামুর উদ্বাস্তুদের গর্জনিয়ার সমভূমিতে বসতি দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[২]

রামু উখিয়ার ঘোনার আঁধার মানিকে কানা রাজার সুড়ং বলে পাহাড়ের ভিতর একটি বড় লম্বা সুড়ং আছে। এটি বর্তমানে পাহাড়ের মাটি ভেঙে ভরাট হবার পথে। প্রায় দু'শ বছর আগে সেখানে ঘনজঙ্গল ছিল। আজকে জঙ্গল নেই। এমনকি উত্তরের পাহাড় কেটে জমি বানিয়ে ফেলা হয়েছে। চারদিকে পাহাড় তার মাঝখানে কিছুটা সমতল জায়গা। তখন পশ্চিম দিকের সুউচ্চ পাহাড়টি কেটে সমতল জায়গা এবং অতঃপর পূর্ব পাহাড়ে সুড়ং করতে হয়েছে। গোটা পরিবেশটা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই পাহাড় কেটে সোজাসুজি সুড়ংটি খনন করা হয়েছে। যারা এটি কিছুটা ভিতরে গিয়ে দেখেছেন বলে দাবি করছেন তাদের বক্তব্য অনুসারে সুড়ং পথের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ঘর খোদাই করা হয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে হাঁটাহাঁটি করা যায়। সুড়ং-এর বাইরেটা বেশ সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্যও বটে। আমাদের বিবেচনায় এটি চিন পিয়েন বা কিং বেরিং-এর শেষ সময়কার আশ্রয় বা দুর্গ ছিল। 'কিং বেরিং'কেই সম্ভবত স্থানীয় জনগণ 'কানা রাজা' বলে আসছে। রামুর সমতল ভূমি থেকে এর দূরত্ব খুব বেশি নয়– অথচ দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি এলাকা ছিল এক সময়। এখানে সমতল ভূমি থেকে রসদ এবং অস্ত্র পাঠানো সম্ভব ছিল। গর্জনিয়ার চিন পিয়ানের সসৈন্যে উপস্থিতির ঐতিহাসিক সাক্ষ্য উখিয়ার ঘোনায় তার অবস্থানের কথা প্রমাণ করে।[৩] এখান থেকে সরে যাবার সময় পালং চরালের পাহাড়ি এলাকায় ১৮১৫ খ্রিঃ ২৫ জানুয়ারি চিন পিয়ান অসুস্থতাজনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১। B. R Peam, King Berring, P 470

২। প্রাগুক্ত।

৩। উখিয়াব ঘোনা আন্ধার মানিক সুড়ং এখানে একটি উৎসাহ এবং জিজ্ঞাসার বিষয় এবং তা রহস্যজনকও। স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় এখানে বাতি জ্বালাত এক সময়, এখনো জ্বালিয়ে থাকে। রামুব ইতিহাসে একজন রাজা এবং দু'জন শাসনকর্তাকে ভাগ্য বিপর্যয় বা পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। চণ্ডীলাহ বা চাইন্দা রাজা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বেশি কিছু জানা না গেলেও রামুতে তাব শেষ দিনগুলো কেটেছে উৎকণ্ঠায়, এ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে। রামুর শাসনকর্তা আদম শাহ আরাকানি পক্ষ ত্যাগ করার পর ত্রিপুরা বাজ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে রাজমালায় উল্লেখ আছে। আদম শাহের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা জানা যায় না। বুজুর্গ উমেদ খানের আক্রমণে আরাকান রাজেব রামু শাসনকর্তা রাউলি পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এদের কারো সম্পর্কেই আত্মগোপন করার জন্য এই সুড়ং করা হয়েছে মর্মে তথ্য কিংবা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শাহ-সুজাকে তার নির্মিত শাহ সুজা সড়ক থেকে টেনে এই সুড়ং পর্যন্ত আনা যায় না। তবে মগ জলদস্যু বা পর্তুগিজ জলদস্যুদের আস্তানা করার একটি সম্ভাবনা থেকে যায়। ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে তাও নিশ্চিত করে বলা শক্ত যে এ রকম দুর্ভেদ্য দুর্গের একটি কঠিন কাজ দস্যুবা করেছে।

৬. ইংরেজ আমলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

আরাকানিদের শাসন আমলে রামুর প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল– একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তখন রাজস্ব আদায়ে আরাকানি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রামুর শাসনকর্তাকে পমাজা অর্থাৎ রাজস্বের ভক্ষক বলা হয়েছে। এর থেকে একটি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শাসনকর্তা প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। কোম্পানি আমলে এই প্রশাসনিক গুরুত্ব বজায় থাকে। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রামু ও কক্সবাজার সদর থানা নিয়ে রামু একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক থানায় রূপ লাভ করে। ব্রিটিশ সরকারের আমলে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম C.S. (Cadestal Survey) জরিপ রামু থেকে শুরু হয়। এই জরিপ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে সমাপ্ত হয়।

কোম্পানি আমলে বর্তমান কক্সবাজার জেলার ভূমি ব্যবস্থার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় আরাকানি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিবরণে। মোগলদের ভূমি-ব্যবস্থা অত্যন্ত নিখুঁত ছিল। কিন্তু তা রামুতে কখনো প্রবর্তিত হয় নাই। কারণ মোগলরা কিছু সময়ের জন্য আরাকানিদের রামু দুর্গ দখল করে নিলেও এই দখল দীর্ঘ সময় বজায় না থাকায় রাজস্ব আদায়ের কোনো ব্যবস্থা চালু হয় নাই– শুধু লুটপাট হয়েছে। চকরিয়া এলাকায় এরও আগে অর্থাৎ সুলতানি আমলে খোদা বক্স খানের জমিদারির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জমিদারি রামু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না–একথা স্পষ্ট করে বলা যায়। তখন রামু স্পষ্টতই আরাকানের অধীনে ছিল।

১৭৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে চিফ চার্লেস বেন্টলির রাজস্ব বিষয়ক চাকলাদারি ব্যবস্থা ও পাঁচশালা বন্দোবস্তি বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি অনুযায়ী কক্সবাজারে কোনো তরফ নেই। ১৭৯০ সালের জরিপে রামুতে ৫৩২ দ্রোণের একটি তরফ দেখা যায়। এই তরফটি শেরমস্ত খাঁর নামে। চকরিয়ার তিনটি তরফে ৮০ দ্রোণ জমি দেখা যায়।

কোম্পানি কর্মকর্তাদের উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের পূর্বে কতিপয় জমিদার রামুসহ গোটা কক্সবাজার এলাকায় বনাঞ্চল এবং নিচু জমির জমিদারি রাতারাতি লাভ করে। এগুলির মধ্যে কিছু ভূয়া জমিদারিরও পরিচয় মিলে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনকালে এদের সঙ্গে কোম্পানি কর্মকর্তাদের বিরোধ বাঁধে। এই বিরোধের কথা ফ্রান্সিস বুকাননের কাছ থেকে জানা যায়। তা সত্ত্বেও কোম্পানি কর্মকর্তারা বনাঞ্চল পরিষ্কার করে অধিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন জমিদারি স্টেটে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করেন এবং প্রতি পরিবারকে ছয় কানি বা ১০০৬৮০ বর্গফুট পতিত জমি বন্দোবস্ত দেন। ২৯ জানুয়ারি ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের রেকর্ডে রামু থানায় বিভিন্ন জমিদারিতে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের একটি চিত্র পাওয়া যায়।[১] চিত্রটি নিম্নরূপ :

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ১২ মে তারিখে কোম্পানি এক আদেশবলে কোম্পানির সকল লোককে পতিত ও অনাবাদী জমি চাষাবাদের উপযুক্ত করার আহ্বান জানায়। এর জন্য চাষীদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা বলা হয় প্রথম পাঁচ বৎসর কোন খাজনা দিতে হবে না। পাঁচ বৎসর পরে দেশের অন্যান্য জমির অনুপাতে খাজনা নির্ধারণ করা হবে।

১। S. C. 29 January, 1813 No-29, M S.K.P.S.P., Vol. 5, P. 1429 A

সরকারের নিকট প্রস্তাবিত আবাদী জমির বিবরণ দিয়ে সদর কাচারিতে তালিকাভুক্ত করার জন্য বলা হয়। আবাদকারীদের আরো বলা হয় যে, এরা যে বিভিন্ন সময়ে তাদের আবাদকৃত জমির তালিকা কোম্পানি সরকারের নিকট পেশ করে এবং সরকারের নিকট থেকে জমিদারি স্বত্ব সংকলিত পাটটা গ্রহণ করে।[১] এই নতুন আবাদকৃত জমি নোয়াবাদ নামে পরিচিত।

কোম্পানির এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে নোয়াবাদ জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চট্টগ্রামের দেওয়ান ছিলেন গোকুল চন্দ্র ঘোষাল। তিনি তার ভাইপো জয় নারায়ণ ঘোষালের বেনামে জয়নগর জমিদারি বা জয়নগর এস্টেট নামে বিতর্কিত এক জমিদারির মালিকানা দাবী করেন এবং তিনি এ মর্মে কোম্পানি থেকে সনদ পান বলে দাবি করেন। এই জমিদারিটি ভূয়া বলে আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন।[২]

মোগলরা মগদের মোগল এলাকায় বসবাস পছন্দ করত না। তাই এরা মগদের ওপর মগজমা নামে একটি কর বসায়। চট্টগ্রামে এই করের পরিমাণ ছিল ১,৩৫৮/= টাকা।[৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শাসন আমলে এই কর প্রত্যাহার করে নাই। কক্সবাজার বা রামু এলাকায় মোগলদের শাসন কায়েম না হলেও মোগলদের প্রবর্তিত রাজস্ব আইন উদ্বাস্তু তথা সমস্ত আরাকানি লোকদের ওপর বর্তাবার আশংকায় আইনটি প্রত্যাহার করা হয়। উদ্বাস্তুদের জন্য যে চাষাবাদের জমি দেওয়া হয়েছিল তা উর্বর ছিল না। ফলে উদ্বাস্তুরা জমির খাজনা দিত না। এই অবস্থায় সুযোগ পেয়ে কিছু লোক এই সকল জমি অধিকার নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়। কোম্পানি সরকার ম্যাজিস্ট্রেট পিচেলের সুপারিশক্রমে ১৮১৭ সালে ১০ এপ্রিল উদ্বাস্তুদের জন্য একটি করমুক্ত শহর গড়ার পরিকল্পনা করেন এবং এই মর্মে একটি সমন জারি করেন যে, কক্সবাজার নামে এলাকাটি সরকারি সম্পত্তি এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীদের জন্য করমুক্ত। এই এলাকার উপর সম্পূর্ণ দাবি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রামু থানার ভূমি রাজস্ব পুনঃনির্ধারণের প্রসঙ্গে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড কর্মকর্তা সি. জি. এইচ. এল্যান পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও কৃষি বিভাগ বরাবরে প্রতিবেদন তৈরি করেন।[৪]

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মূল রাজস্ব নির্ধারণ প্রস্তাব সংবলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। ঐ প্রস্তাবের ওপর ঝিলংজা, খুরস্কুল, চাকমারকূল, ফতেখাঁরকূল, রাজারকূল, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া প্রভৃতি মোজা থেকে আপত্তি আসে। আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাজস্ব কমিয়ে বিভিন্ন তালুকের রায়তি খাজনা নির্ধারণ করা হয়। তার একটি ছকও প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তীতে রামুর সকল জমিতেই রাজস্ব ধার্য করা হয়।

১। A.M Sirajuddin, *The Review of Administration of the East India Co in Chittagong* 1761-1785 P. 118-121

২। *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃ. ৫২

৩। রতন লাল চক্রবর্তী, বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, পৃঃ ২৬

৪। প্রতিবেদনটি পরিশিষ্ট 'গ'তে সংযুক্ত করা হলো।

পঞ্চম অধ্যায়
সামাজিক ইতিহাস

১. রামু নামের উৎপত্তি

রামু থানায় বর্তমানে বিশেষ কোনো স্থানের নাম রামু নেই। অতীতে ছিল কি-না তাও জানা যায় না। রামুর ভৌগোলিক সীমানা অতীতে অনেকবার ছোট-বড় হয়েছে। রামু নামের ধারণাগত বিশেষত্ব এর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। রামু নামের উৎপত্তির মূলে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এখানে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে (ধান্যবতী রাজবংশের ইতিহাস মতে), গৌতম বুদ্ধ রাজা চান সুরিয়ার আমলে সেবক আনন্দকে নিয়ে ধান্যবতীতে এসেছিলেন। এখানে এক ধর্ম সম্মেলনে সেবক আনন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আনন্দ! ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে পাহড়ের উপর আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন এর নাম হবে 'রাং উ'। 'রাংউ' বর্মি শব্দ। 'রাং' অর্থ বক্ষ, 'উ' অর্থ অস্থি। রাংউ অর্থ বক্ষাস্থি। ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং অর্থগত দিক থেকে রামু শব্দের সঙ্গে রাংউ শব্দের মিল রয়েছে।

রামুর রামকোট নামক স্থানে পাহাড়ের উপর পুরনো একটি বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিটি গৌতম বুদ্ধের বক্ষাস্থি সংবলিত বলে লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। শ্রীলংকা থেকে প্রত্যাগত জগৎ চন্দ্র মহাস্থবির বলেন, রামকোটের সধাতু বড় বৌদ্ধ বিহার সম্রাট অশোকের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। সম্রাট অশোকের স্থাপিত ৮৪ (চুরাশি) হাজার ধাতু চৈত্যের একটি এই রামু চৈত্য।

রামু নামকে কেন্দ্র করে অপর একটি কিংবদন্তি এখানে চালু আছে। কোনো কোনো লোক বিশ্বাস করে যে, বনবাসে থাকাকালে রামসীতা রামকোট এলাকায় এসেছিলেন এবং রামের নাম থেকে রামকোট কিংবা রামুর নামকরণ করা হয়েছে। সেখানে একটি রাম-সীতা মন্দির রয়েছে। ৫টি বড় বড় বটগাছ নিয়ে সেখানে পঞ্চবটী বন রয়েছে। সীতার মরিচ বাটার পাটা মনে করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন একখানা পাথরের পূজা করে। এখানে বাৎসরিক ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে আরও একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে, মুসলমানদের ভারতবর্ষ বিজয়ের আগেই একটি বিদেশী জাহাজ রণবীদ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে যায়। ঐ জাহাজে মুসলমান আরবীয়গণ 'রহম' 'রহম' বলে আরবি ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এই 'রহম' থেকে রামু শব্দ এসেছে বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করে। আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান রাজ-দা-তুয়ে উল্লেখ আছে যে, মহৎ ইঙ্গ চন্দ্রের আমলে (৭৮৮ হতে ৮১০ খ্রিস্টাব্দ) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রণবীদ্বীপে ভেঙে যায়। জাহাজের মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। এরা সেখানে গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করে।[১]

১। *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1944, P 36

প্রাচীনকালে আরব লেখকদের লেখায় রাহমি বা রুহমি নামে একটি রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রচিত আরব ভূগোলবিদ সোলাইমান রচিত সিলসিলাত-উত তওয়ারিখ গ্রন্থে রুহম রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ একে রুহমি, রাহমা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছেন। স্যার এ. পি. ফেয়ার, আর. সি. মজুমদার এবং ড. এ. রহিম রামু থেকে রুহমি বা রাহমার উৎপত্তি বলে মনে করেন।[১]

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাশ পালি সাহিত্য থেকে আবিষ্কার করেন যে, বৌদ্ধ যুগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল। রম্য ভূমি হিসাবে রামু বর্তমানে সমধিক পরিচিত। ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচ রামুকে Rames the country of the mogen বলে উল্লেখ করেছেন। 'রামেস' সম্ভবত রামস্থান শব্দের অপভ্রংশ।[২] লামা তারানাথ বলেন, পাল যুগে চট্টগ্রাম রম্যভূমি নামে পরিচিত ছিল।

আলমগীরনামা, ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা এবং মধ্যযুগের পুরনো দলিল-দস্তাবেজে রামুকে 'রাম্ভু' বলা হয়েছে। ফারসি ভাষাভাষীদের প্রভাবের ফলেই রামু 'রাম্ভু' হয়েছে।

সেবাস্টিয়ান ম্যানরিকের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সম্পাদকদ্বয় বলেন যে, 'রাজমিউ' থেকে রামু শব্দ এসেছে। 'রাজমিউ' আরাকানি শব্দ। তার অর্থ রাজশহর। রামু রাজা বা শাসনকর্তার আবাসস্থল ছিল বলে এটি রাজশহর হিসাবে পরিচিত ছিল।

পূর্বে রামুর আরাকানি নাম ছিল প্যানোয়া। আরাকানিরা রামুর শাসনকর্তাকে বলতেন পমাজা। পমাজা শব্দটি পানওয়াসা থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। পাওয়াসা অর্থ রাজস্বের ভক্ষক। স্থানীয় লোকেরা শাসককে রাজস্ব ভক্ষক রূপে মনে করত। কারণ লোকদের থেকে এরা রাজস্ব আদায় করতেন।

২. সমাজ ব্যবস্থা

ক. কৌম সমাজ ঃ মৌর্যদের শাসনকালের আগেও বাংলায় মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। অতিপ্রাচীনকালে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় প্রথাসিদ্ধতা মানুষের মজ্জাগত। জৈবিক প্রয়োজনে পারিবারিক ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। প্রেম, স্নেহ, ভালোবাসা বন্যতাকে অতিক্রম করে মানুষকে একত্রে বসবাসে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরিবার নিয়ে সমাজ। সমাজ প্রথাগত পারিবারিক নেতৃত্বের অতিরিক্ত নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে। যখন রাজা ছিল না কৌম সমাজ ছিল। সে সমাজে শাসন পদ্ধতি ছিল। বাঙালি সমাজের নিম্নস্তরে কোমদের মধ্যে দলপতি নির্বাচন, সামাজিক দণ্ডবিধান. আচারানুষ্ঠান, ভূমি বিলি বন্দোবস্ত পদ্ধতির পরিচয় মিলে। কৌম শাসনের রূপরেখা দেখে একালের ঐতিহাসিকদের এটা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ঐতিহাসিককালের বহু কীর্তিত এবং বহু জ্ঞাত রাষ্ট্র যন্ত্র, রাষ্ট্র বিন্যাস তথা সমাজ বিন্যাসের বাইরে বহু লোক কৌম সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার

১। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1844, P 36

২। *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ–ইসলামাবাদ*, প্রকাশ-ঢাকা, ১৯৬৪ সাল। পৃঃ ৮ ও ৯

মধ্যে বাস করেছে। আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতি শাসনযন্ত্র প্রাচীন কৌম সমাজের দান। পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দলপতিই কৌম শাসনযন্ত্রের একনায়কত্ব করতেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ও তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে মৌর্য অধিকারের পূর্বেই বাংলাদেশে কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মহাভারতে পৌন্ড্রকবাসুদেব নামে পুণ্ড্রদের এক রাজার কথা, ভীম কর্তৃক পৌন্ড্রধিপের পরাজয়ের কথা, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি কৌম রাজাদের কথা, দুর্যোধন সহায় এক বঙ্গরাজ্যের কথা, রামায়ণে প্রাচীন বাংলার কয়েকটি রাজবংশের কথা প্রভৃতি বাংলার আদি রাজতন্ত্রের পরিচয় বহন করে। দীপবংশ মহাবংশের বঙ্গ ও রাঢ়াধিপ সীহবাহুর কথা প্রভৃতি হতে মনে হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতক হতেই বাংলার বিভিন্ন কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হচ্ছিল। গ্রিক ইতিহাসে গঙ্গারাষ্ট্রের বিবরণ থেকে (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতক) রাজতন্ত্রের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের সুশাসন এবং জনকল্যাণের কথা সর্বজনবিদিত।

তৃতীয় চতুর্থ শতকে গৌড়বঙ্গের রাজঅন্তপুর ও নাগর সমাজের পরিচয় বাৎসায়নের কামসূত্রে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচয়ের পূর্বে ১ম ও ২য় শতকে পেরিপ্লাস গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে রাষ্ট্র ও সমাজগত বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার পরিচয় মেলে। সামন্ত-মহাসামন্তের পরিচয় গুপ্ত আমলেই পাওয়া যায়। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টলিতে কথিত মহাসামন্ত বিজয় সেন। সামন্ত নরপতি শাসিত জনপদ ছাড়া বাকি দেশ খণ্ড রাষ্ট্রের অধিকারে ছিল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি। প্রত্যেক ভুক্তি কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে, প্রত্যেক বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই সর্বনিম্ন দেশ বিভাগ।

আরাকানের প্রাচীন উপাখ্যান মতে কয়েক হাজার বছর ধরে চন্দ্রসূর্য রাজবংশ আরাকান শাসন করেছে। তার সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় তাই আরো আগের। অশোকের শাসন আমলের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ব্যাপক ছিল। এখানেও রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে কৌম সমাজব্যবস্থার বিকাশকে কেন্দ্র করে। কিন্তু একটি অবাক ব্যাপার এই যে, পাহাড়ে বসবাসকারী জাতি কিংবা উপজাতি জনগোষ্ঠীর পারিবারিক জীবন শিথিল না হলেও জুম চাষের জীবনযাত্রা সমাজের (যে সমাজ অর্থে গ্রাম সমাজকে বুঝায়) কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আটকে রাখতে পারেনি। হাজার হাজার বছরের সভ্যতার বিকাশেও এদের জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এসেছে সামান্যই। তাই কৌম সমাজের সুস্পষ্ট পরিচয় এদের মধ্যে আজও বিদ্যমান। সমাজপতি, রাজা, সামন্ত রাজা, শাসনকর্তা প্রভৃতি পরিচয়সমূহ বঙ্গ কিংবা প্রাচীন আরাকান সাম্রাজ্যে মূলত একই মূল্য বহন করে। আরাকানিরা প্যানোয়ার (রামু) শাসনকর্তাকে 'পমাজা' বা রাজস্ব ভক্ষক বলত।

প্রাচীন সমাজের রীতিনীতি অনেকটাই প্রথাগত এবং অলিখিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন এই রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারপরও ধর্মীয় বিভেদরেখা অতিক্রম করে কিছু নিয়ম ও অনুশাসন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। ভাষা ও কৃষ্টিগত ঐক্য এই ক্ষেত্রে মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে।

খ. বাঙালি সমাজ

আজকে বাঙালি সমাজের ভৌগোলিক সীমানা ব্যাপক বিস্তৃত হলেও অতি প্রাচীনকালে বিশেষ করে আরাকানি শাসনামলে কক্সবাজার বা রামু এলাকায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস খুব অল্পই ছিল। আরাকানি অবাঙালি জনগণ বিশেষ করে রাখাইন (যাদের স্থানীয় বাঙালিরা মগ বলে থাকে) সম্প্রদায়ের লোকজন এ অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বলে স্বীকৃত ছিল। আরাকানিদের বহু বছরের শাসন এবং রামুকেন্দ্রিক শাসন পরিচালনা এদেরকে এখানে বসবাসে উৎসাহিত করেছে। ইংরেজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই সংখ্যাধিক্য বরাবরই বজায় থাকে। কবে বাঙালিরা এতদঞ্চলে এসে বসতি শুরু করেছে এটা আজকে নিশ্চিত করে বলা শক্ত। ইংরেজদের আগমনের পূর্বেও যে এখানে বাঙালিদের বসবাস ছিল এটা ফান্সিস বুকাননের ভ্রমণ বিবরণীতে জানা যায়। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের কাব্যগ্রন্থগুলো প্রমাণ করে মধ্যযুগে শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যাও এ অঞ্চলে কম ছিল না। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বহু জাতি এ অঞ্চলে হানা দিয়েছে। পাল রাজেরা বৌদ্ধ হলেও বাঙালি ছিলেন। এদের উদ্ভব রামু থেকে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এদের পূর্ব পুরুষরা কে ছিলেন, কোথা থেকে এসেছিলেন এ সম্পর্কে ইতিহাসের ধারণা স্পষ্ট নয়। তবে যে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ অর্থাৎ সেনাবাহিনীর লোক ছিলেন এটা অনুমান করা যায়। মগধ থেকে আসা সামন্ত চন্দ্রসূর্য তাঁর রাজত্ব কায়েম করেছিলেন আরাকানে দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে। তার সৈন্যবাহিনীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক ছিলেন। নব্যভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর দুহিতা বাংলায় তখনও জন্ম হয়নি, প্রদোষ কাল চলছিল। এর কয়েক শ' বছর পর এই ভাষার উত্তরাধিকারী হয়ে কোনো পাল পালোয়ানের জন্ম হয়েছিল কিনা সে কঠিন এক গবেষণার বিষয়। হরিকেল ও পট্টিকেরা রাজ্যের বঙ্গাধিপতিগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বসবাসে উৎসাহিত করেছেন তা সহজ সত্য। এরপর ত্রিপুরা রাজেরা তিনবার রামু আক্রমণ করেছেন। সুলতানি আমলে তুর্কি পাঠান, এমনকি ঈশা খাঁর বংশধররাও চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। মোগলরা হানা দিয়েছে শক্তভাবে। কিন্তু এদের কারো শাসনই স্থায়ী হয়নি।

শাহ সুজা আরাকানে পলায়নকালে তার সঙ্গীরা কেউ কেউ বনে-জঙ্গলে থেকে গেছে, এক সময় স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এদের ভাষা বাংলা ছিল না। বাংলাদেশে আমরা যাদের বাঙালির আপন বলে জানি যেমন, শাহ্ সুজা, সিরাজউদ্দৌলাহ, এমনকি রাজা রামমোহন– এদের কারো ভাষা বাংলা ছিল না, ছিল ফারসি। বাংলা বরাবরই অন্তজ জনের ভাষা ছিল। তার বিকাশ সমাজের নিম্নস্তরে। নিম্ন সমাজের লোকজনই এ ভাষার চর্চা করেছে ব্যাপকভাবে এবং তা অনিবার্য কারণেই। অবাক ব্যাপারই এই যে, কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের শরিয়তনামা কাব্যের ভাষা বাংলা হলেও তা আরবি হরফে লেখা হয়েছে। মুসলমান সমাজের উঁচুস্তরে তখন আরবি ফারসি চর্চা ছিল আভিজাত্যময়। যাই হোক, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বেই সমাজের উঁচু কিংবা নিম্ন পর্যায়ে বাংলা ভাষাভাষিদের আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়েছে। সে সময়কার

কয়েকজন হিন্দু এবং মুসলিম জমিদারের পরিচয় পাওয়া যায় যাদের ভাষা ছিল বাংলা। এদের কিছু পাইক-পেয়াদার সঙ্গেও ইতিহাসের পাতায় সাক্ষাৎ মিলে যারা বাঙালি ছিল।

মোগল আমল থেকে গোটা চট্টগ্রামেই বাঙালিদের ব্যাপক বিস্তার ঘটতে থাকে। এ সময় 'মগ ধাওনী' একটি শব্দের জন্ম হয়। ব্যাপকভাবে মগরা চট্টগ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে থাকে। এ সময় মোগলরা 'মগজমা' বলে মগদের ওপর অতিরিক্ত একটি কর আরোপ করে। তবে রামুতে মোগলদের শাসন কায়েম না হওয়ায় সেখানে তার প্রভাব পড়েনি। মূলত দেশ বিভাগের সময়ই মগরা রামু ত্যাগ করে চলে যায়। বাঙালিরা ক্রমান্বয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। প্রাচীন দিয়াঙ থেকে লোকজন গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল বলে রাজারকূল ইউনিয়নে দিয়াঙপাড়া বলে একটি জনপদ রয়েছে।

৩. ধর্ম

ক. প্রাচীন ধর্মীয় ধারণা

আদি মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক ভয়াবহতা ও বিস্ময় ধর্মানুভূতি ও ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। আদিবাসীরা তাই বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, সূর্য, ফুল, পশু, পাখি, অগ্নি, বিশেষ স্থান প্রভৃতির ওপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা-অর্চনা করেছে। এখনো খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, পুন্যে, শবর প্রভৃতি কৌম লোকেরা তাই করে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজে তুলসীগাছ, সেওড়া ও বটগাছের পূজা হয়। ব্রত অনুষ্ঠান হয়। পানখিলি, গুটি খেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, খৈ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাপি স্থাপনা, দধি মঙ্গল প্রভৃতি আদিবাসীদের দান। ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনীপূজা, শ্মশান-শিব ও ভৈরবের পূজা, শ্মশান কালী পূজা প্রভৃতি আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস থেকে পাওয়া গেছে।[১] পল্লীর কৃষিনির্ভর জীবন ব্যবস্থায় কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেমন, মাঠে হাল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াবার দিনে, চারা লাগাবার দিনে, ফসল তোলার দিনে ধর্মীয় নয় কিন্তু পালন করা হয় এমন আচারানুষ্ঠান; ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, পুনর্জন্মে বিশ্বাস, প্রজনন শক্তি বাড়াবার পূজা, জাদুশক্তি প্রভৃতি প্রাচীন ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

সনাতন ধর্ম দীর্ঘদিনের। কিন্তু জৈন ধর্ম, আজীবিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় করে প্রাচীন বাংলায় আর্য ধর্মকর্মের প্রাথমিক সূচনা। এই তিন ধর্মই বেদবিরোধী এবং বেদের অপৌরুষত্বের অবিশ্বাসী তবে আর্যধর্মাশ্রয়ী।[২] আরাকানে ব্যাপারটি ভিন্ন। এখানে শুধু বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রসার ঘটেছে প্রাচীনকালে। তারও আগের ধর্ম বিশ্বাসে ভেদ রেখাটানা মুস্কিল।

খ. বৌদ্ধ ধর্ম

রামুতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দ্বিতীয় স্থানে। বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা এবং বৌদ্ধ সমাজ-জীবনের ইতিহাস এখানে সুদীর্ঘকালের বলা যায়। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন

---

১. ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃঃ ৪৭৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮০

কি-না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা শক্ত হলেও বুদ্ধের অস্থি সংবলিত একটি মূর্তির কথা এখানে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, গৌতম বুদ্ধ তাঁর সেবক আনন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন রামুতে তাঁর বক্ষাস্থিত স্থাপিত হবে। বৌদ্ধ কৃষ্টির পরিচয় এখানে বেশ প্রাচীন। লামা তারানাথের বিবরণ অনুসারে বৌদ্ধবিশ্বে রম্যভূমি রামু চট্টগ্রামের পরিচয় বহন করেছে। নালন্দার পতনের পর চট্টগ্রাম অঞ্চল বৌদ্ধ কৃষ্টির অন্যতম তীর্থ স্থলে পরিণত হয়। রামুর রামকোটে স্বধাতুক বুদ্ধমূর্তি এবং আশ্রম প্রাচীনকালের বৌদ্ধকৃষ্টির স্মৃতি বহন করে। মধ্যযুগ এবং আধুনিককালের অনেক দৃষ্টিনন্দন বৌদ্ধকীর্তির স্থাপত্য শিল্প রামুতে পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে মগধের সামন্তরাজা চন্দ্রসূর্য আরাকান অধিকার করে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আগত বৌদ্ধরা চট্টগ্রামের আদিমবাসিন্দাদের মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করে এবং এদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার সাধিত হয়। কিন্তু আরাকানি উপাখ্যান এবং স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে রামুতে সম্রাট অশোকের সময় স্থাপিত চুরাশি হাজার ধাতু চৈত্যের একটি রামু চৈত্য। তাহলে চট্টগ্রামের প্রায় ৩/৪ শত বৎসর আগেই রামুতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হবার কথা। কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য অনুমানের ওপর নির্ভর করে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসেই রূপ নিয়েছে যে, গৌতম বৌদ্ধ চট্টগ্রামের চক্রশালা (পটিয়া) এবং চকরিয়ায় জীবিতকালে এসেছিলেন।[১] বলার অপেক্ষা রাখে না গৌতম বুদ্ধ প্রচলিত ধারণা মতে ধর্ম প্রচার করতেই এসেছিলেন।

ওমলি সম্পাদিত চট্টগ্রামের গেজেটিয়ারে একটি তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যটি কবি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র দাসের ভ্রাতা শরৎচন্দ্র দাসের। তিনি বলেন, Budhism is a living religion in Ctg. Proper in the Hill Tracts, and in Tippera, it was introduced in these districts about the ninth century A. D. direct from Magadha, when the Eastern provinces of Bengal, extending from Ragpur to Ramu (Ramya Bhumi) in Ctg. were under the sway of a Rajput prince named Gopipala. The earlier headguasters of the Ctg. Buddhists were at Mahamuni in Pahartali and the later at Rmau.[২]

রামুসহ সমগ্র চট্টগ্রামে দু'ধরনের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছে। বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ এবং মগ বা রাখাইন বৌদ্ধ। চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম উৎখাতকালে মগধের আধুনিক বিহারের বৈশালী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় গোত্রের বৃজি বা বজ্জি বৌদ্ধ নর-নারী প্রাণ রক্ষার্থে আসাম গমন করে। পরে আসাম থেকে শত শত বৌদ্ধ নর-নারী আরাকান শাসিত চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মতে এরাই বড়ুয়া। এদের ভাষা বাংলা। অবশ্য বড়ুয়া পদবি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির বলেন, ব্রিটিশ আমলে একজন বড়ুয়া বিচারক চট্টগ্রামে আসার পর থেকে চট্টগ্রামে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে বড়ুয়া উপাধি ধারণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।[৩]

১। ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮০

২। G. E. Harvey, *History of Burma*, P. 23

৩। L. S. S. O Melly, *Ctg Dist Gazetteers* p. 38.

রামুতে অপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী হচ্ছে রাখাইন সম্প্রদায়। এরা মূলত প্রাচীন আরাকানের অধিবাসী এরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত– যাদের চেহারা এবং শারীরিক গঠনের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগোষ্ঠীর লোকেদের শারীরিক এবং ধর্মীয় মিল রয়েছে। এরা বাঙালি বৌদ্ধদের চাইতে নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজা বোধপায়া আরাকান আক্রমণ করলে এরা ব্যাপক হারে তৎকালীন কোম্পানি এলাকায় প্রবেশ করে। স্যার ওয়াল্টার হেমিল্টনের রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রামুর শরণার্থী শিবিরে প্রায় লক্ষাধিক আরাকানি শরণার্থী দেখেছিলেন।

রামুর বড়ুয়া বৌদ্ধদের চেহারা অন্যান্য বড়ুয়া বৌদ্ধদের চাইতে ভিন্নতর। চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফের অভিমত হলো এরা আরাকানিই। এরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে। নাম, পোশাক-আশাক, আরাকানি খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা প্রভৃতি থেকে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বস্তুত কিছুদিন আগেও মংপ্রু বড়ুয়া, ছাতাং প্রু বড়ুয়া প্রভৃতি নামে বড়ুয়াদের নাম রাখা হতো। রামুর বড়ুয়াদের সম্পর্কেও এই অনুমান খাটে।

গ. হিন্দু ধর্ম

উপমহাদেশের সর্বত্রই হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং প্রসার বেশ প্রাচীন। মনে করা হয় যে, খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে রাজা চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে মগধ থেকে আগত আর্যবংশীয় হিন্দুদের সঙ্গে চট্টগ্রামের আদিম জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উদ্ভব ঘটে। রামুতে এদেরই বংশধররা প্রথমে বসতি স্থাপন করে। রামুর রামকোর্টে বৌদ্ধ মন্দিরের পাশাপাশি একটি প্রাচীন রাম-সীতা মন্দির রয়েছে। কে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজকাল তা আবিষ্কার করা শক্ত। তবে ধারণা করা যায় যে, রাজা চন্দ্র-সূর্যের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সৈন্যরাই রামকোট দুর্গ এলাকায় অতিপ্রাচীনকালে এই দুটি মন্দির পাশাপাশি স্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, বনবাসে থাকাকালে রাম এবং সীতা এই রামকোটে এসেছিলেন। সীতার মরিচ বাটার পাটা মনে করে হিন্দু সম্প্রদায় একটি পাথরের পূজা করে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যেমন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য বহিরাগত। লেখক পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী মনে করেন, এরা আনুমানিক পাঁচশ' বছর আগে চট্টগ্রামে আগমন করেন।[১] রাজনৈতিক উত্থান-পতন বিশেষ করে হিন্দু রাজন্যবর্গের আক্রমণ, অধিকার ও বসতি স্থাপনের ফলে এরা বসবাসের সুযোগ পেয়েছে। সেটেলমেন্ট অফিসার সি. জি. এইচ. এলেন তাঁর সার্ভে রিপোর্ট এবং গেজেটিয়ারের লেখক ও মলি চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে লিখেছেন, এখানকার শাসকগোষ্ঠী আরাকানি রাজন্যবর্গ, গৌড়ের সুলতান, মোগল, ইংরেজ সকলেই রাজস্ব বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য কায়স্থ ও বৈদ্যদের রাঢ় ও গৌড় থেকে এনেছিলেন।[২] রামুতে এদের বিস্তার ঘটেছে মূলত চট্টগ্রাম থেকে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন হিন্দু জমিদারের

১। *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭

২। L. S. S. O. Malley, *Ctg. Dist Gazetteers*, P. 38

অধীনে রামুর কয়েকটি পুরোনো জমিদারি ছিল। তাদের নায়েবগোমস্তারা রামুতে অবস্থান করেছে। এছাড়া অনেকে (উচ্চবর্ণের কিংবা নিম্নবর্ণের) ভাগ্যান্বেষণে রামুতে গেছে। এখানকার অনেক কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবার সুলতানি কিংবা মোগল আমলে পেশাভিত্তিক খেতাব পেয়েছে। খাস্তগির, মজুমদার, সরকার, মল্লিক, দস্তিদার, কানুনগো এর মধ্যে অন্যতম।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের পেশাভিত্তিক গোত্র পরিচয় রয়েছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, গণক, ভট্ট, নাপিত, ধোপা, তেলী, কামার, বণিক, হাতিয়ালা, কুম্ভকার, বারুই, ডোম, চাড়াল, কৈবর্ত্য, শাখটে, পুষ্পাঞ্চলি, ধাইয়া, শূত্র, ডিঙ্গর, বালামী, গোয়ালা, মালাকার, জোলা, যোগী, নট, চরকুইট্যা-দাস হাড়ী, ভূইয়ালী, সুতার, বংদেশী, চামার, সাহা, বক্ষিত্রী, সুইন্দাল, গোপ, গুড়ি, গোট্টা, ছত্রী, ভব অন্যতম। চট্টগ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় সামবেদী, যজুর্বেদী ও অগ্রদানী– এই তিনটি ধর্মীয় বিভাগে ৬৮ গোত্র ও ২৫৪ প্রবরে বিভক্ত।[১] রামুতে অবশ্য সকল গোত্র ও প্রবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে না।

অতীতে হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রবল রূপটি দেখা গেছে। আচারানুষ্ঠানে সামাজিক সিঁড়ি প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তা কড়াকড়িভাবে পালন করা হতো। উচ্চস্তরের লোকজন নিম্নস্তরের লোকদের বাড়িতে সামান্যই যেত। নিমন্ত্রণে গেলেও যাওয়ার সময় পারিবারিক গোলাম বা দাসী-বান্দীর দ্বারা নিজেদের ব্যবহৃত থালা, ঘটি, বাটি নিয়ে যেত। বর্ণ-বৈষম্যবোধ তো সব সময়ই ছিল। এছাড়াও হিন্দু সমাজে ছুতরাই ছিল অসম্ভব রকমের। অবশ্য আজকাল বর্ণবৈষম্যবোধ এবং ছুতরাই শিথিল হতে চলেছে। পারিবারিক রক্ষণশীলতা শিক্ষা-দীক্ষার নতুন আলোয় তিরোহিত হতে চলেছে।

ঘ. ইসলাম ধর্ম

চট্টগ্রামে মুসলমানদের আগমন সুদীর্ঘকালের হলেও এ কথা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে, কখন মুসলমানরা প্রথম এখানে আগমন করে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, খ্রিঃ অষ্টম শতকে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবদের প্রথম বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূল সুরাটের মতো পূর্ব উপকূল চট্টগ্রামে তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এখানে এরা স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে এবং সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয়। খ্রিস্টীয় দশম শতকে চট্টগ্রামে আরবদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, এই অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই রাজ্যের অধিপতি সুলতান উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। আরাকানের উপাখ্যান অনুযায়ী রাজা সুরাতইঙ্গ চন্দ্র (৯৫১-৫৩ খ্রিঃ) সুরতনকে (সুলতানের অপভ্রংশ) পরাজিত করেন।[২]

ড. আবদুল করিম অবশ্য এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবের মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল তা আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়; কিন্তু নবম শতকে চট্টগ্রামে মুসলমানদের আরব রাষ্ট্র গঠন একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৩] যাই হোক, যেহেতু আন্তর্জাতিক নৌবন্দর খুব

১। পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০

২। *এনামুল হক ও আবদুল করিম : আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য*, পৃঃ ৪

৩। *কক্সবাজারের ইতিহাস*, পৃঃ ১১

প্রাচীনকাল থেকে ছিল, তাই এখানে আরবের নাবিক-বণিকদের বংশধর থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াংয়ে বর্ণিত আছে যে, রাজা মহত ইঙ্গ চন্দয়-এর রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) একটি আরব জাহাজ ভেঙে যায়। এ সময় প্রাণে রক্ষা পাওয়া আরব বণিকদের দক্ষিণ চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করা হয়। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন, স্থানটি সম্ভবত রামু।[১] মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই রামুতে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল এ তথ্য তার প্রমাণ। মুসলিম বিজয় দীর্ঘ সময় স্থায়ী না হলেও বিজিত এলাকায় ধর্মীয় প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়ে গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন ছিল। সে হিসাবে মুসলমান সমাজে গোড়া থেকেই শ্রেণী বিভাগ লক্ষ করা গেছে। এই শ্রেণী মূলত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল– (১) অভিজাত শ্রেণী, (২) অনভিজাত বা স্থানীয় ভুঁইফোড় শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা বহিরাগত ছিলেন। সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মোগলরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সকলেই আভিজাত্য ও কৌলীন্যের অধিকারী। অবশ্য এদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ ছিল। ড. নাজমুল করিম বলেন, হিন্দু সমাজের শ্রেণীভেদের মতোই এই শ্রেণী বিভাজন। তাঁর ভাষায়, The Indian Muslims used to divided themselves usually unto (1) Syed, (2) Mughat, (3) Sheikh and (4) Palhan, the Indu counter part being (1) Brahmin (2) Khashtiya (3) Vaishya and (4) Sudra.[২] তবে মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই বিভাজন, হিন্দু সমাজের বিভাজনটি অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। এক সময় চট্টগ্রামের মুসলমানরা কৌলীন্য বা আভিজাত্যের গর্বে অন্ধ ছিল। সামাজিক সম্পর্ক ও বিবাহসহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে এই পরিচয় ফুটে উঠত।[৩] মুসলমান সমাজে ভুঁইফোড় শ্রেণীর লোকেরা এদেশের ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। তাদের প্রতি অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের আচরণ এবং সামাজিক গলগ্রহতা আজকের সভ্যতার দৃষ্টিতে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন।

রামুতে মুসলমান শাসকদের অধিকার ও শাসন কখনোই স্থায়ী হয়নি। বরাবরই আরাকানি শাসকদের শাসনাধীনে ছিল। ফলে চট্টগ্রামি মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগ যেখানে প্রযোজ্য নয় সেখানে মুসলমানরা অভিবাসী হয়ে বসতি স্থাপন করেনি এমন নয়। চট্টগ্রামবাসীরা তাদের অভিজাত্য স্বীকার না করে রোয়াইঙ্গা বলে অভিহিত করেছে। আরাকানি রাজাদের প্রদত্ত খেতাব যেমন, রোয়াজা, খোয়াজা, সিকদার প্রভৃতি এরা অর্জন করেছে এবং সে হিসাবে জমির মালিক হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রাম থেকে অভিজাত, অনভিজাত দু'শ্রেণীর মুসলমানই জীবিকার তাগিদে রামুতে এসে বসবাস শুরু করেছে। বলাবাহুল্য রামু এখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ। অতীতে বর্মি রাজের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয়ে বহু আরাকানি মুসলমান (রোয়াইঙ্গা) বাংলাদেশে

১। *সৈয়দ সুলতান ও তাঁর গ্রন্থাবলী*, পৃঃ ১০

২। Dr. A. K. Nasmul Karim; *Changing in India Pakistan and Bangladesh*, P. 115

৩। আবদুল হক চৌধুরীর সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থের ৩২-৩৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেখুন

চলে আসে। রামুসহ কক্সবাজারে এ ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশি। কক্সবাজার জেলায় বসবাসকারী আরাকানি বর্ণসংকর 'থাম্ভরগ্যা' মুসলিম গোত্রের লোকেদের পরিচয়ও রামুতে পাওয়া যাবে।

তবে সেখানে শ্রেণী বৈষম্যনীতি গোত্র বা আভিজাত্য বোধের চাইতে আর্থিক শ্রেণী বৈষম্যের মধ্যে পরিদৃশ্যমান বেশি।

৪. জীবনযাত্রা

ক. কৃষি নির্ভরতা

প্রাগৈতিহাসিককালের জীবনযাত্রায় শিকার এবং ফলমূল খেয়ে জীবিকা নির্বাহের পরিচয় পাওয়া গেলেও কালক্রমে সভ্যতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কৃষি উৎপাদনে মনোযোগী হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা সবাই প্রায় একমত যে, কৃষিই সভ্যতার সূচনা করেছে। বলাবাহুল্য এই সূচনা বহুকাল আগের। ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। এই অভ্যাস ও সংস্কার আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতার ও সংস্কৃতির দান। একটি চর্যায় পাওয়া যায়, হাঁড়িতে ভাত নাহি, নিতি আবেশী। প্রাকৃত পৈঙ্গলে আছে, 'ওগ্‌গরা ভত্ত রম্ভ অ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা/মোইলি মচ্ছা নালি গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা (ই) পুনবন্তা।' অর্থাৎ কলা পাতায় গরম ভাত, ঘাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করতে পারেন তার স্বামী পুণ্যবান।

পন্ডিতেরা মনে করেন, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দ হতে খ্রিঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের মধ্যে কৃষিকর্মের উদ্ভব ঘটে। মাটির বুকে চাষাবাদই কৃষি ব্যবস্থার মূলকথা। জমিতে ধান, বার্লি, গম, জোয়ার, মসুর প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হতো। চাষাবাদে ব্যবহৃত পাথর বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি মানুষ ক্রমান্বয়ে উদ্ভাবন করেছে। পশু পালন শিখেছে। বন থেকে ফল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও পাশাপাশি সংগ্রহ করা হতো।

অধিবাসীদের যুগে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি জমিতে 'জুম' চাষ করা হতো। পাহ-াড়ী এলাকায় এ চাষ পদ্ধতি এখনো চালু আছে। ফ্রান্সিস বুকানন তার ভ্রমণ বিবরণে রামুতে জুম চাষীদের কথা বলেছেন।

প্রাচীনকালে দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজবর্ণ পাত্রে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল, বরযাত্রীরা ভাবলেন শাকান্ন পরিবেশন করা হয়েছে– এতে একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেতেই কন্যাপক্ষ বললেন, আপনাদের শাকান্ন পরিবেশন করা হয় নাই। পাত্রটির বর্ণ সবুজ বিধায় অন্ন ব্যঞ্জন সবুজ দেখাচ্ছে। কবি শ্রী হর্ষ এই ভোজে যেসব ব্যঞ্জনের তালিকা দিয়েছেন তা লক্ষ করার মতো। দই ও রাই সরিষার প্রস্তুত ঝালযুক্ত শ্বেতবর্ণ ব্যঞ্জন খেয়ে অনেক অতিথিকে মাথা ঝাঁকড়াতে এবং তালু চাপড়াতে হয়েছে। হরিণ, ছাগ ও পক্ষীর মাংস দিয়ে তৈরি ব্যঞ্জন, মাছের ব্যঞ্জন, কর্পুর মিশ্রিত সুগন্ধি জল, মসলাযুক্ত পান– এই উচ্চকোটির বিয়ের অনুষ্ঠানে আভিজাত্যের মাত্রা যুক্ত করেছে। তবে বাঙালি মাত্রেই ভাত, মাছ আর শাকান্ন ভোজনে অভ্যস্ত। আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত হতো। চীন, জাপান,

ব্রহ্মদেশ, আরাকান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল দেশেই ভাত আর মাছ প্রধান খাদ্য। আর্যরা কিন্তু তা প্রীতির চোখে দেখেনি। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে আছে রোহিত, শকর (পুঁটি), সফুল (সাল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস ব্রাহ্মণদের ভক্ষ। ইলিশ এদের প্রিয় ছিল।

বান বা বাইম মাছ ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। শুটকি মাছও এরা খেতেন না। নিম্নকোটির লোকেরা এসব ভক্ষণ করত। বঙ্গালদেশের লোকেরা সিহুলী বা শুকনো মাছ খেতে ভালোবাসত–একথা টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলেছেন। আদিবাসী লোকেরা শামুক, কাঁকড়া, কাদাবাসী মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করত।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হতেই খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে (বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তো বটেই) একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। আর্য ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিশ আহার্যের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। রামুর বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে এর উত্তরাধিকার লক্ষ করা যায়। কিন্তু মুসলমান সমাজ মাংস ভক্ষণে অপেক্ষাকৃত উৎসাহী বলে মনে হয়। তবে সকলের মধ্যেই সামুদ্রিক মৎস্য ভক্ষণের প্রবণতা রয়েছে। শুঁটকি মাছ খাওয়া প্রায় অপরিহার্য বলা চলে।

আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর লোকজন যেসব তরিতরকারি খেয়েছে– সেগুলোই উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা খাচ্ছি। যেমন, বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কাঁকরুল, কচু ইত্যাদি। পর্তুগিজরা আলুকে খাদ্য হিসাবে এনেছে এবং বলাবাহুল্য চট্টগ্রাম দিয়ে তার শুরু।

রামুতে বাঙালি অ-বাঙালি সকল লোকের মধ্যেই কিছু সংখ্যক মদপানে অভ্যস্ত। মগেরা অবাধ মদ বানাবার এবং খাবার অধিকার রাখে। তাদের দেখাদেখি বাঙালি সমাজে তা সংক্রমিত হয়েছে। এছাড়া ওম পাতার রস মদ হিসাবে ব্যবহারের আরেকটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সুন্দরবন এবং রামুতেই এ ধরনের ওম পাতার চাষ হয়। অবাঙালিদের মধ্যে তাঁতে কাপড় বুনবার বনেদি পেশা বিদ্যমান। বাঙালিরাও কেউ কেউ এই কাজে অভ্যস্ত।

প্রাচীনকাল থেকে রামুর জমিদার ও কুলিনেরা নিজের জমি চাষ করত না। কারণ চাষাবাদ তখন ঘৃণ্য ব্যাপার ছিল। চাষ করলেও দিনমজুররা করত। এরা বর্গা চাষী ছিল। এ প্রথা এখনও বর্তমান আছে। বর্গাচাষ দু'ধরনের– মোকরা বর্গা ও আধিবর্গা। বর্ষাকালে চাষাবাদের শুরু। এখানে এ সম্পর্কে কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বলেন–

আষাঢ়ের সপ্ত দিনে রজঃ পৃথিম্বিরে।
উদরত্তুন ভগসথলী নিকালে বাহিরে।
তে কারণে সপ্তদিনে হাল ন জুড়ির।
হাল জুড়ে সে সঙ্কল নরকে পড়িব॥

ধান রোপণের প্রথম দিনে কচুশাক খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। একে শাকান্ন বলা হতো। চাষের প্রথম দিনে কিংবা ধান কাটার দিনে কেউ কিছু চাইলে দেওয়া হতো না। কবি বলেন, যেদিন লামান্ত হাল কিংবা জলাচলে কিবা গুছিলয়, কিবা ধান্য আগা লইলে।

কেহ দ্রব্য খুঁজিলে সে দিন ন দেঅন্ত (নসরুল্লাহ খোন্দকার)। 'সোম শুক্কুরে রোয়ে ধান/বুধ বিশুদে ঘরে আন'।– এ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

খ. ভূমি ব্যবস্থা

কৃষিপ্রধান সভ্যতায় ভূমি ব্যবস্থা সমাজ বিন্যাসের গোড়ার কথা। তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থার পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাংলার পট্টোলীগুলোতে দেখা যায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলো ভূমিদান ও বিক্রয় সম্পর্কিত। সে সময় ভূমি ক্রয় করতে হলে রাজসরকারের কাছে আবেদন করতে হতো। পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ নাথ শর্মা ও তার স্ত্রী রামী একই সঙ্গে ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন। রাজসরকার এই আবেদন পাবার পর পুস্তপালের নিকট তা পাঠাতেন। পুস্তপাল ভূমি রেকর্ডপত্র দেখে– এ ভূমি কারো ভোগদখলে আছে কি-না, অন্য কেউ ক্রয়ের আবেদন করেছে কি-না সরকারের কোনো স্বার্থ আছে কিনা, সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কি-না– যাচাই করে পক্ষে অথবা বিপক্ষে মতামত দিতেন। যথারীতি মূল্য গ্রহণের পর রাজসরকার ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দিতেন। গ্রামপ্রধানরা এই ভূমির সীমানা নির্ধারণ করে দিতেন। এ সময় রাজ সরকারের লোক এবং ক্রেতার ব্রাহ্মণ কুটুম্বরা উপস্থিত থাকতেন। এর পর বিভিন্ন শর্তাবলির অধীনে জমি হস্তান্তর করা হতো।

তখনকার দিনের ভূমির প্রকারভেদ, মাপ ও মূল্য চাহিদা, সীমা নির্দেশ, উপস্বত্ব, কর, উপকর, ভূমি স্বত্বাধিকার, রাজা-প্রজার অধিকার, খাসপ্রজা, নিম্নপ্রজা প্রভৃতি বিষয়ে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী লিপিগুলোয় প্রধানত তিন প্রকার জমির উল্লেখ আছে বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। এ সকল ভূমির ধারণা আমাদের বর্তমান কালের মতোই। দামোদর দেবের চট্টগ্রাম লিপিতে বাস্তকে 'ব্যাভূম্ব' বলা হয়েছে। ক্ষেত্রভূমিকে 'নালভূ' বা 'নাভূ' বলা হয়েছে। চাষের জমিকে আজও নাল জমি বলা হয়। খিলভূমির ব্যাখ্যার দরকার নেই। ঐসব লিপিতে ভূমি মাপের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ ভূমি মাপ ছিল কূল্য বা কূল্যমাপ। তারপর দ্রোণ এবং সর্বনিম্ন মাপ আঢ়বাপ। লক্ষ্মণ সেনের আমলে বৃষভ শংকর নল দ্বারা ভূমি পরিমাপ করা মতো। সম্ভব বিজয় সেনের হাত মেপে নলের দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয়েছিল। ফরিদপুর পট্টোলীর দত্ত ভূমির প্রতি কূল্য মাপের মূল্য ছিল চার দিনার। গুপ্তযুগ এবং পালযুগে রাজারাই ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন, জমিদাররা ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী।

আরাকান অধিকৃত অঞ্চলে প্রাচীন ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে রাজারা শাসনকর্তাদের মাধ্যমে প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন একথা ম্যানরিকের বিবরণে পাওয়া যায়। শাসককে তখন পমাজা বলা হতো।

রামুসহ সমগ্র চট্টগ্রামেই (নিজামপুর পরগনা ব্যতীত) মঘী কানির মাপ প্রচলিত ছিল। মঘী ভূমি পরিমাপে একক হচ্ছে ধূলি। ৭ ধুলিতে ১ দন্ত, ৬ কণ্ঠ, ৩ কণ্ঠে ১ কড়া, ৪ কড়ায় ১ গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় ১ কান, ১৬ কানিতে ১ দ্রোণ। পরিমাপে এখানেও ৮ হাত নল ব্যবহার করা হতো। ১২ স ১০ নলে ১ কানি।

গ. ব্যবসা বাণিজ্য ও মুদ্রা ব্যবস্থা

মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেসলি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্লেট পাথরে উৎকীর্ণ একটি লিপি পাওয়া গেছে। পাথরটির

মাঝখানে উৎকীর্ণ বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি। তার দুই পাশে লিপি উৎকীর্ণ। পঞ্চম শতকের এই লিপিতে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের কথা আছে। তার বাড়ি রাঙ্গামাটি। ড. নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন এই রাঙ্গামাটি চট্টগ্রামের। তাঁর ভাষায়, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক পরিবেশের কথা মনে রাখলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রতীরের দেশে এই অনুমানই তো বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়। খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে আরম্ভ করে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এ সময়টা বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। জাতক মালার সুপারগ জাতকে পূর্বভারতের বণিকদের সুবর্ণভূমি বা নিম্নবার্মায় যাত্রার কথা আছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননের ফলে লালমাই ময়নামতিতে প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ মুদ্রাগুলো আরাকান, বার্মা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছে বলে ড. নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন। তিনি বলেন, আরাকানের সঙ্গে ময়নামতির ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্য সূত্রেই প্রাচীন আরাকানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। লালমাই ময়নামতির পট্টিকেরা নগর ও রাজ্য সেই বাণিজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎস এবং তা অষ্টম শতকের।[১]

টলেমির ভূগোলে রামুকে ট বটর বা ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রামকোটে সমুদ্র বন্দর ছিল বলে অনায়াসে আন্দাজ করা যায়। এটি সম্ভবত রামপোর্ট ছিল। রামকোট হয়ে গেছে কালক্রমে। তবে ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র ছিল বলে এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব স্বতঃস্বীকার্য।

খ্রিস্টীয় শতকের পূর্ব থেকে বাংলাদেশে মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। মহাস্থানগড়ের শিলাখণ্ড লিপিতে 'গণ্ডক' নামে এক প্রকার মুদ্রার কথা জানা যায়। 'কাকনিক' নামক আরেকটি মুদ্রার কথাও ছিল এতে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা-বন্দরে ক্যালটিল নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের কথা জানা যায় পেরিপ্লাস গ্রন্থে। গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রা প্রচুর পাওয়া গেছে। এ সময় মুদ্রার নিম্নমান ছিল কড়ি। পাল আমলে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের কথা জানা যায়। এই সময় স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার একেবারেই নেই। তাম্র মুদ্রাব ব্যবহার আছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রৌপ্য মুদ্রার সূতিকাগার আরাকান রাজ্যের অংশ বিশেষ প্রাচীন রামু থেকে পাল বংশের উদ্ভবের পক্ষে এটি আরেকটি যুক্তি। কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে পাওয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মজুদ এটা আরো প্রমাণ করে যে, আরাকানের চন্দ্র বংশের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ময়নামতির চন্দ্র বংশের রাজারা রৌপ্যমুদ্রা বানাবার প্রযুক্তি লাভ করেছিল। কতগুলো মুদ্রার গায়ে পট্টিকেরা এবং কতগুলোর গায়ে হরিকেল কথাটি লেখা রয়েছে। ড. নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন, মুদ্রাগুলোর প্রায় সব ক'টিই দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের (দশম ও একাদশ শতকের)। পট্টিকেরা ও হরিকেল তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান তখন চন্দ্র বংশীয় রাজারা শাসন করতেন। আরাকান রাজাদের রাজধানী প্রাচীন বৈশালীতে প্রাপ্ত বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তির সঙ্গে ময়নামতির সাম্প্রতিক উৎখনন থেকে প্রাপ্ত মূর্তির অনেকগুলির আশ্চর্য মিল রয়েছে। উভয়ের সময় দশম শতাব্দী।

১। ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, পৃ, ১৫৮, ১৬৯

ঘ. ভাষা ও সংস্কৃতি

রামুতে চট্টগ্রামী উপভাষা এবং রাখাইন ভাষা অর্থাৎ আরাকানি ভাষার প্রচলন আছে। বাঙালি এবং রাখাইন জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা ভাষা দু'টি। তবে রাখাইন জনগোষ্ঠীও বাংলা ভাষা এবং চট্টগ্রামী উপভাষা দুই-ই জানে। চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও লেখার ভাষা বাংলা সাধু বা চলিত ভাষা।

মাগধী প্রাকৃত থেকে চট্টগ্রামী উপভাষার জন্ম বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মগধের আর্যবংশীয় রাজা চন্দ্র-সূর্য আরাকান এবং চট্টগ্রামে রাজ্য স্থাপন করার পর থেকে এখানে প্রথম আর্য ধর্ম, ভাষা ও সভ্যতার প্রসার ঘটে। এর পূর্বে এখানকার মানুষের ভাষা কি ছিল নির্ণয় করা মুশকিল। তবে আদিম জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা আর্য ভাষার প্রভাবের ফলে ব্যাপক পরিবর্তিত হয়ে এই অবস্থায় এসেছে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উপভাষার সকল গুণাগুণ এর মধ্যে আছে। আরব বণিকদের আগমন, পর্তুগিজ ও ইংরেজদের নৌবাণিজ্য এখানকার ভাষাকে শব্দ সমৃদ্ধি দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

রামুসহ চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের এই উপভাষা আরাকানি প্রভাবে ভিন্নতর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন 'করেছে'-এ শব্দটিকে উত্তর চট্টগ্রামে বলা হয় 'কৈর্য্যে' আর রামুতে বলা হয় 'কৈরগে'। এরকম আরো অনেক শব্দ আছে যেগুলো ভিন্নতর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে আলাদাভাবে চিহ্নিত।

সংস্কৃতি

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের স্ব স্ব ধর্মের বলয়ে চট্টগ্রামের এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। চট্টগ্রামের মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত 'পুরানা হাস্তর' বলে খ্যাত। শাস্ত্র শব্দ থেকে আঞ্চলিক শব্দ 'হাস্তর'। পুরোনো শাস্ত্রের অনুশাসন মনে করেই এখানকার লোকজন প্রচলিত আচারানুষ্ঠানকে অবশ্যকরণীয় ভেবে নিয়েছে-তাই জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এসব রীতি-রেওয়াজ একাত্ম হয়ে গেছে।

সংস্কৃতির ওপর রাজনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য। অতি প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত রামু আরাকানের অধীনে ছিল বলে এখানকার জনজীবনে আরাকানি প্রভাব লক্ষ করবার মতো। তবে মিশ্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রামুর জন-জীবনেও আছে। এছাড়া আছে অরণ্য সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন ঐতিহ্য।

পোশাক-পরিচ্ছদ : আদিবাসী লোকেরা পশুর চামড়া, গাছের বাকল, গাছের পাতা এক সময় পরিধান হিসাবে ব্যবহার করতো। বস্ত্রের আবিষ্কার সভ্যতার সূচনা লগ্নে। সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে প্রচলিত ছিল না। সেলাই বস্ত্র পরা হতো। পুরুষদের ধুতি ও মেয়েদের শাড়ি পরতে হতো। ধুতি হাঁটুর উপর পরা হতো। পুরুষরা বাবরী চুল রাখত, ঝুঁটি বাঁধত। চট্টগ্রামে আরাকানি প্রভাবে পুরুষ-মহিলা সকলেরই থামি ও লুঙ্গি পরবার রেওয়াজ চালু ছিল। বর্তমানে মহিলাদের শাড়ি এবং পুরুষদের অন্যান্য পোশাক পরিধান পরতে দেখা যায়। রামুসহ কক্সবাজারে পোশাক-পরিচ্ছদে সাধারণ্যে

আরাকানি রেওয়াজ এখনও চালু আছে। বিশেষ করে অবাঙালি রাখাইনরা তাদের পুরোনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। সাধারণ্যে জুতা পরার প্রবণতা নেই। পাহাড়ি জীবনযাত্রার সঙ্গে পুরুষদের লেংটি পরবার রেওয়াজ বহু পুরোনো হলেও এটি আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে বলে মনে করা যায়।

প্রসাধন ও অলংকার : প্রাচীন বাংলায়ও নারীরা প্রসাধন ব্যবহার করত। নারীরা ফুলের মালা ব্যবহার করতো। খোঁপায়ও ফুল গুঁজে দিত। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হয়ে পড়ায় আনত নয়না কথাঞ্চিত লজ্জা নিবারণ করছে তার গলার ফুলের মালা দ্বারা বক্ষ ঢেকে। নারীদের বক্ষযুগলে কর্পূর ও মৃগলাভি ব্যবহারের কথা জানা যায় বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে। 'সদুক্তি কর্ণামৃত কাব্যে বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার পরিচয় পাওয়া যায়– দেহে সূক্ষ্মবসন ভুজ বন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ, গন্ধতৈল সিক্ত মসৃণ কেশদাম, মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মতো করে বাঁধা, তাতে ফুলের মালা জড়ানো, কানে নবশশি কলার মত নির্মল তালপাতার কর্ণাভরণ। পল্লীর মেয়েরাও সাধ্যমতো সাজগোজ করত। কবি চন্দ্র চন্দ্রর কাব্যে আছে কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দকিরণ সাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠা ফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধ কেশ কবরীতে তিলপল্লব– অনাগর বধূদের এই বেশ দেখে পথিকদের গতি মন্থর হয়ে আসে। চট্টগ্রামের পল্লী গ্রামের মেয়েদের কর্ণে ফুলের ব্যবহারই কি একটি নদীর নাম দিয়েছে কর্ণফুলী? (কাজকর্মের সময় চট্টগ্রামে পুরুষেরা ঠেঁডি ধুতি পরত, অবসরে তহকন্দ। গায়ে জামার পরিবর্তে চাদর ব্যবহারের রীতি ছিল। হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ সকলেরই মজলিসের পোশাক ছিল ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদর। মেয়েরা আরাকানি প্রভাবে গামছা ও চাদর ব্যবহার করত।)

প্রাচীন বাংলায় অলংকার পরবার আয়েশও লক্ষ করা যায়। নর-নারী সবাই কর্ণকুণ্ডলী, কর্ণাঙ্গুরী, কণ্ঠাহার, বলয়, কেয়ুর, মেঘলা প্রভৃতি পরিধান করত। নারীরা শঙ্খ বলয় ব্যবহার করত সোনা-রূপা ছাড়াও মুক্তার হার, পাথরমালা, হিরক, নীলকান্ত মণি, চুনী, মরকত প্রভৃতি খচিত অলংকারের ব্যবহার ছিল। রামুসহ চট্টগ্রামে নারীরা হাতে মতিচুর, বসন্ত, বাহারচুর, কালসী, বাজুবন্দ, তোড়ল, পৈচি, গলার হাঁসুলী, চন্দনহার, পুষ্পহার, গজমতিহার, নাকে মক্কি, বেশর বালি; কানে বিভিন্ন বারি, ঝুমকা; মাথায় টিক্কা, বিন্দু, অর্ধচন্দ্র; কোমরে শিকল; পায়ে মল, ছনলুয়া প্রভৃতি পরিধান করত।

বিয়ে অনুষ্ঠান : বিয়ের অনুষ্ঠানটি যে কোনো সমাজে একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এতে সে সমাজের রুচি ও কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে। প্রাচীনকালে উচ্চকোটির লোকেরা কিভাবে সাজাত তার একটি বর্ণনা আছে নৈষধ চরিতে। এতে দেখা যায়, প্রথমে কুলাচার অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাইতে গাইতে কন্যাকে স্নান করাত এবং শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাতো। সখীরা তখন দময়ন্তী কপালে মনঃ শিলার তিলক, সোনার টীপ, কাজল এঁকে দিত চোখে, কর্ণযুগলে পরাতো দুটি মণিকুন্ডল, ঠোঁটে আলতা, কণ্ঠে সাতলহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আলতা। মেয়েরা বিয়ের স্থলে আলপনা আঁকতো, শিল্পীরা নানা প্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়ে তৈরী ফুলের নগরের পথঘাট সাজাতো, বাড়ির দেয়ালে নানা ছবি আঁকতো। বাদ্যযন্ত্র বাজাতো

যেমন, বাঁশি, বীণা, করতাল, মৃদঙ্গ। বরযাত্রা কালে নগরীর রমণীরা বরকে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে এসে দাঁড়াত। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের উভয় পার্শ্বে কদলীস্তম্ভ রোপন করা হতো। বাসরঘরে আজকার মতোই তখনও চুরি করে চুপি দেওয়া ও আড়ি পাতা হতো। বর-কন্যার গাঁটছাড়াও বাঁধা হতো। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজন পরিবেশন করত পুরনারীরা। এদের নিয়ে বরযাত্রীরা ঠাট্টা-রসিকতা করত তবে তা মার্জিত ছিল না। পুরনারীরা নানাভাবে বরযাত্রীদের ঠকাত। শ্বশুরবাড়িতে বর এবং বরযাত্রীরা ৪/৬ দিন কাটাত। এ সময়ও এরা বার সুন্দরীদের সঙ্গলাভ করতো। আর তা খুব দোষের কারণ ছিল না।

প্রাচীনকাল থেকেই রামুসহ চট্টগ্রামের সর্বত্র হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ সমাজে বিয়েশাদি ও শুভকাজের অভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক হিসাবে মঙ্গলঘট ও বরণকূলা বা ডালা ব্যবহার করে আসছে। বাড়ির দরজায় দু'পাশে দু'টি কলাগাছ রোপন করে তার গোড়ায় দুটি জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করে মুখে দুটি আম্র পল্লব রেখে তার উপর দুটি ডাব বা নারিকেল দিয়ে মঙ্গলঘট স্থাপন করা হতো। মঙ্গলঘটে ব্যবহৃত উপাচারগুলো মাঙ্গলিক বোধ থেকে যেমন, কলাগাছ ও আম্রপল্লব দীর্ঘায়ু, জল জীবন, ডাব বা নারকেল প্রজনন শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত। চট্টগ্রামে একে ঘড়ার মুখে আম সরতী বলে। বরণকূলা নতুন বর-বধূর সামনে স্থাপন করে বরণ করা হতো। বরণ কূলায় বিভিন্ন উপাচার রাখা হতো। গবেষক আবদুল হক চৌধুরী হিন্দু, মুসলিম এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহৃত বরণকূল্য বা ডালার উপচারের আলাদা আলাদা তালিকা দিয়েছেন। এগুলো নিম্নরূপ :

হিন্দু বিয়ের বরণকূলা : একমুঠো ধান বা চাউল, দু'তিন টুকরো কাঁচা হলুদ, একগুচ্ছ দুর্বাঘাস, সিন্দুর, মুখে আম্রপল্লব দেওয়া একটি হলপূর্ণ মাটির ঘট, সরিষা তেল প্রজ্জ্বলিত মাটির সেজ দীপ। এগুলো একটি চিত্রিত নতুন কুলায় রাখা হয়।

মুসলমানের বিয়ে বরণকূলা : রামুর মধ্যযুগের কবি নসরুল্লাহ খন্দকারের কাব্যে আছে :

আর এক ডালা ভরি ভূত পূজা খানি।
ধূপ, ধান্যে, পিঠা, কলা, শিলা ভরি আনি।
দামাদ-কন্যার আগে আনিয়া রাখন্ত।
যুগ ধরে ধূপা দিয়া অধিক রাখন্ত।

অর্থাৎ বরণকূলায় ধান, হলুদ, দুর্বাঘাস, সরিষা তেলে প্রজ্বলিত মাটির সেজ দীপ, পানিপূর্ণ মাটির ঘটির মুখে আম সরতী ছাড়াও ধূপ, পিঠা, কলা, শিখ প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো।

বৌদ্ধ বা বড়ুয়াদের বিয়ের বরণকূলা : নতুন কূলা, সাইল ধান পাঁচ পোয়া, দুর্বাঘাস, কাঁচা কলা, কাঁচা পেঁয়ারা, কাঁচা হলুদ, শিলা, ঘিলা, সরিষার তেলের মাটির সেজ দীপ, পানিপূর্ণ মাটির কত্তি, অশ্বত্থ পাতা, বাঁশ পাতা, মুরাব্বী পাতা, আম্রপল্লব, কলাগাছের ডিক প্রভৃতি।[১]

বিয়ের সময় ও মাস সম্পর্কিত শুভ-অশুভ ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন–

১। আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃঃ ১৪০-১৪১

ফাগুনের বিয়ে আগুন
চৈতের বিয়ে হারুগা
জেঠের বিয়ে হেট
কাতির বিয়ে হাতি
পউষের বিয়ে পুস্করা।[১]

বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিয়েতে বিয়ের আগে এবং পরে প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়

নৈতিক আদর্শ

তৃতীয়-চতুর্থ শতক হতেই বাংলাদেশের কিয়দংশে উত্তর-ভারতের সওদাগরি ধনতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাশাপাশি নাগর সভ্যতার স্পর্শও লেগেছিল তার অঙ্গে। বাৎসায়নীয় নাগর আদর্শ বাংলার নাগর সমাজেরও আদর্শ হয়ে উঠেছিল। গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাদের বাসনা ও ব্যসনের কথা, গৌড় বঙ্গের রাজঅন্তঃপুরের মহিলাদের ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী, দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কামষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার বিবরণ বাৎসায়ন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বৃহস্পতিও দু'কারণে বাঙালি দ্বিজ বর্ণের নিন্দা করেছেন। প্রথমত, মৎস ভক্ষণ এবং দ্বিতীয়ত, দুর্নীতিপরায়ণা রমণীদের কারণে। অষ্টম শতকে দেবদাসী প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে। নর্তকী ছিল কমলা।

পল্লী জীবনে কিন্তু এই প্রভাব পড়েনি। কৃষিনির্ভর জীবন ব্যবস্থায় নৈতিক স্খলনের অবকাশ ছিল না। প্রাকৃত পৈঙ্গলে আছে, পুত্র পবিত্র মনা, প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শুদ্ধ চিত্তা, হাঁকে ত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ– এসব ছেড়ে কেউ স্বর্গেও যেতে চায় না। অন্যত্র কবি শুভঙ্কের পদে আছে, বিষয়পতি লোভহীন, ধেনু দ্বারা গৃহপবিত্র, নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি পরিচর্যায় গৃহিণীরা কখনো ক্লান্ত হয় না।

কিন্তু বিপরীত চিত্রও পাওয়া যায় চর্যাপদের টিলায় বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রায়। এখানে শবর-শবরী মদ খেয়ে ভুর হয়ে থাকে নারীর ঘরে নিত্যদিন অতিথি আসে। শবরী গঞ্জার মালা পরে গলায়, কটিতে জড়ানো ময়ূরের পাখ, কানে কুণ্ডল। কুঁড়েঘরে খাটিয়ায় তাদের সুখ শয়ন। তাম্বল আর কর্পূর তাদের পূর্বরাগের উপাদান। আবার 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডর ভাই/রাতি ভইলে কামরু যাই'।

বাৎসায়ন কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুবাষিনী, অনুরাগবতী ও কোমলাঙ্গী বলেছেন (মৃদুভাষিন্যো হনু রাগ বত্যো মুদ্বঙ্গ্যাশ্ব গৌড়া)। তার তৃতীয়-চতুর্থ শতকের এই উক্তি আজও সত্য।

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে জনজীবনের বিশেষ করে রাজমিউ বা রাজশহর রামুর চিত্রটিও বোধ হয় তাই ছিল। তবে এখানে আরাকানি জীবন ব্যবস্থার প্রভাব পূর্বাহ্নেই স্বীকার করতে হয়। নাগর জীবনের নৈতিক দিকটি এখানে আরো শিথিল হবারই কথা।

১। ঐ, পৃঃ ১৪৩
২। উৎসাহী পাঠক আবদুল হক চৌধুরীর চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি বইটি পড়তে পারেন

সমুদ্র বন্দর ও নৌবাণিজ্য এখানকার জীবনযাত্রায় নৈতিক স্খলনে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। পল্লী জীবনে তখন তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। তবে টিলাবাসী মানুষের জীবনযাত্রায় একই চিত্র কল্পনায় বাধা কোথায়?

মধ্যযুগের রামুর কবি নসরুল্লাহর শরিয়তনামা কাব্যে নৈতিকভাবে শিথিল জীবন যাত্রার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় :

চতুর্দিকে বেড়ি যত কামিনীর গণ।
উচ্চস্বরে সহেলা গাওন্ত রঙ্গ মন॥
কেহ কেহ মহা ঠারে মুখ কুটি হাসন্ত।
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ নিজে দেখাওন্ত।
নটীগণ হন্তে শেষ্ট সে সবের গীত।
ভিন্ন পুরুষের মন হয় উচলিত।

অথবা,

জুলুয়ার ছলে ভিন্ন নারীর বদন।
হাসি হাসি রতিভাবে করে নিরীক্ষণ।
ভিন্ন পুরুষের মুখ দেখি নারীগণ।
এক লঙেফ পাইল যেন সর্গের দর্শন॥
মুখ কুটি হাসিয়া চক্ষু ভাঙ্গা বাশতুলি।
মনপুরী হরে নিতি রতি রসে ভুলি॥[১]

নারীর প্রথম ঋতু দর্শনে আচার-অনুষ্ঠান

মধ্যযুগের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের কাব্যে নারীর প্রথম ঋতু দর্শনে যে আচার-অনুষ্ঠান করা হতো তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে আছে–

কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পকালে।
কত সন্ধ্যা উপাস রাখয় তিরি কুলে॥
কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পকালে।
সেনান করিতে দুষ্ট সক্কলেরে বলে॥
পঞ্চ কিবা সপ্তদিনে লই খেলা ওন্ত।
ধোপা নাপিত আনি শুদ্ধ করাওন্ত॥
শুদ্ধ করাই নিয়া জলে করে সেরান।
সহেলা গাওন্ত অনাদীনের ধরান॥
ঢোল বাজাই যুবক সবারে জানাওন্ত।
আমার কুমারী বধূ পুষ্প দেখিছন্ত।।

মধ্যযুগে চট্টগ্রামে নারীর প্রথম ঋতুবতী হওয়াকে পুষ্প দর্শন বলা হতো। এ সময় নারীকে অপবিত্র মনে করা হতো। তাকে অস্পৃর্শ ভাবা হতো। এছাড়া ব্যাপারটিকে ঢোল

---

১. নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত শরীয়তনামা-- আবদুল করিম, পাণ্ডুলিপি (৪র্থ খণ্ড ১৯৮১), পৃঃ ১৫১, ১৫৩। সম্পাদনা : আনিসুজ্জামান।

শহরতের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জানিয়ে দেওয়া হতো। ঋতু বন্ধ হলে ধোপা নাপিত ডাকা হতো। অন্য কারো বাড়িতে প্রথম ঋতুবতী হলে ঐ গৃহস্বামীর এতে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করা হতো। সমাজের নিম্নস্তরে এগুলো এখনো চালু আছে।

প্রথম ঋতুবতী হওয়ার মাস ও দিন সম্পর্কেও এখানে শুভ-অশুভ ধারণা প্রচলিত আছে।

শিশুর জন্মের আগে ও পরে লৌকিক আচার

শিশু জন্মের পূর্বে এখানে সাধ ভক্ষণের বা হাদি খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার সাধ ভক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। নতুন গর্ভবতী রমণীর সাধ ভক্ষণ বাঙালি সমাজে একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সন্তান কামনায় শিরনী সালাত এবং মানত করবার প্রবণতা পুরোনো সমাজে প্রচলিত ছিল। সন্তান প্রসব বিপত্তিতে মৌলবী, গুণী, সাধু প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তিদের পানি পড়া খাওয়ানো হতো। তাবিজ-কবজ দেওয়া হতো। স্বামীর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ধৌত পানি পান করানো হত। সন্তান প্রসবের পর শিশু ও প্রসূতিকে গরম পানি দিয়ে গোসল করানো হত। শুকনো বাঁশের চটি জ্বালিয়ে পানি গরম করা হতো। কেননা খড়কুটো বা জ্বালানি কাঠ দ্বারা পানি গরম করালে বাচ্চা শুকিয়ে যেতে পারে কিংবা শরীর ফেটে যেতে পারে– এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। নবজাতকের প্রতি সহসাই ভূত-প্রেতের নজর পড়ে বলে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তাই নবজাতকের কান ছিদ্র করে দিয়ে অশুভ শক্তির বদনজর এড়ানোর চেষ্টা করা হতো। আবার কেউ কেউ নবজাতককে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে তেমাথায় ফেলে দিয়ে আসত। পূর্ব নির্ধারিত কেউ কুড়িয়ে আনতেন। সামান্য অর্থে তার কাছ থেকে কিনে নেওয়া হতো। নবজাতকের বাড়িতে নাপিত গিয়ে সংবাদ দেওয়ার রীতি ছিল। নবজাতকের জন্মের ৬ষ্ঠ দিনে পারিবারিক নাপিত থেকে মাথার চুল কামানো হতো। একে চট্টগ্রামীরা 'পোয়া কামানী' বলে। এ উপলক্ষে নাপিতকে দেওয়া হতো ১ সের চাল, কিছু লাল মরিচ, সরষে তৈল এক ছটাক, পান এক বিরা, সুপারি ১ গণ্ডা, নগদ ১ টাকা। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও পান-সুপারী পাঠানো হতো। শিশু জন্মের ছয় দিনকে এ অঞ্চলে 'বিয়েলা আঁইজ' বলা হতো। প্রাচীনকালে এসময় কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে মানা হতো। লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এ সময়কার ভালো-মন্দের প্রভাব শিশুকে সারাজীবন বইতে হয়। একটি আগুনের পাতিল সব সময় নবজাতকের ঘরে রাখতে হত। কেউ ঘরে গেলে সে আগুন স্পর্শ করে যেতে হতো। আগুন থাকলে বা স্পর্শ করে এলে ভূত-প্রেত, দেও-দানব আছর করতে পারে না বলে মনে করা হতো। এ সময় মাকে সাধারণত ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হতো না। প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলেও কুপি, বাত্তি, লৌহ শলাকা প্রভৃতি নিয়ে বেরুতে হতো। নবজাতকের হাতে কলম দেওয়া হয়। প্রসূতিকে এ সময় টাকি মাছ, বেলে মাছ খেতে দেওয়া হতো না। এগুলো বয়েলা মাছ। ধাই বা ধাত্রীগণ সন্তান প্রসবের সময় সহায়তা করে থাকত। শিশুদের তাবিজ-কবজ ছড়া ব্যবহারের প্রবণতা ছিল। নবজাতকের গলায় 'কাছমপড়া' পরিয়ে দেওয়া হতো।

কোথাও কোথাও ঘণ্টার ছড়াও দেওয়া হতো। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি একমাস অশুচি থাকে বলে হিন্দু সমাজে মনে করা হত। এ সময় রান্নাঘরে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সন্তানের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে হিন্দু সমাজে 'হাইডেলা' বা ষষ্ঠী অনুষ্ঠানে সন্তানের নাম রাখা হতো। এ সময় ষষ্ঠীদেবীর পূজা হতো। ষষ্ঠীদেবী শিশু অধিষ্টাত্রী দেবী। ষষ্ঠীর দিনে শিশুর নাম রাখা হতো। পাঁচখানি নলতে দেওয়া একটি মাটির পাত্রে সরিষা তেলের সেজ দীপ জ্বালানো হতো। প্রত্যেকটি সলতের একটি করে নাম থাকে। যে নামের সলতে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে নবজাতকের সে নামটি রাখা হয়। অন্নপ্রাশনের রীতি হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সমাজেই রয়েছে। মুসলমান সমাজেও অন্য দু'টি সম্প্রদায়ের মতো সন্তান প্রসবের পর রান্না করা সব কিছু ফেলে দেওয়া হত। কবি নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের লেখায় তার নজির আছে :

ইষ্টজন মরে কিবা শিশু প্রসবয়
রান্দনের ভান্ড সব নিকালি ফেলায়।

সন্তানের মঙ্গলার্থে 'নিমুবিয়া পীরের' উদ্দেশ্যে ফাতেহা দেয়ার রীতি চালু ছিল। এ সম্পর্কেও নসরুল্লাহ্ খোন্দকার বলেন–

বালক জন্মিলে এক কুরকুট রাখয়।
নিমুরিয়া পীর নামে ফাতেহা করায়॥

মুসলমান সমাজে ছেলেদের খতনার সময় এবং মেয়েদের কান ছিদ্র করার সময় গস্তফেরানোর প্রথা চালু ছিল।

মৃত্যুর আগে ও পরের আচার-অনুষ্ঠান

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাইরেও রামুসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে হিন্দু-বৌদ্ধ এবং মুসলমান সমাজে মৃত্যুর আগে-পরে কিছু লৌকিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। 'ঘাট এ রি' দেওয়া এর মধ্যে একটি অভিন্ন আচার। এখানে লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কারো যদি মৃত্যুর সময় খুব কষ্ট হয়, মুমূর্ষু অবস্থায়ও মৃত্যু না হয় তবে মনে করা হয় যে, ফেরী ঘাটের পয়সা আদায় না করায় লোকটির মৃত্যু হচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছে। ঘাট এরি দেওয়ার মাধ্যম এই ঋণ মুক্ত করানো হয়। মৃত্যুর পর হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের বাইরেও কিছু আচার আছে– যা লৌকিক পর্যায়ের। হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নিকারীকে আম গাছ এবং চিতার মাটিতে কোপ দিতে হয়। মৃতের ঘরের দরজায় প্রথম সন্ধ্যায় চুল্লির ছাই ও বরই কাটা দেওয়া হয় এবং একজন স্ত্রীলোক দূর হও! দূর হও! বলে বলে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঝঞ্জালগুলো বাইরে ফেলে দেয়। গর্ভবতী অবস্থায় কেউ মারা গেলে সে প্রেতাত্মায় রূপান্তরিত হয় বলে বিশ্বাস। এই অবস্থায় মৃতের স্বামীকে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দান করতে হয়। বৌদ্ধদের মৃত্যুর পর আনন্দ-উৎসব করা হয়। নাতিরা মৃতের মাথায় ছাতা ধরে, বৌদ্ধ ভিক্ষুর মৃত্যুর পর জমদূত এবং দেবদূতদের মধ্যে মৃতের রথ নিয়ে টানাটানি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শেষে অবশ্য দেবদূতদেরই জয় হয়। এ সময় প্রচুর বাজি পোড়ানো হয়। রামুতে জানা যায়, একটি গাছকে ভেতর থেকে খুদে বারুদপূর্ণ করে গরুর গাড়ির উপর

স্থাপন করা হতো এবং অগ্নিসংযোগ করে বাজি ফোটানো হতো। এর আওয়াজ এত প্রচণ্ড ছিল যে বহু দূর থেকেও শোনা যেতো। মৃত্যুর স্থানের স্থলে সাত দিন পানি ছিটানো হত এবং সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হতো। শ্রাদ্ধ এবং মোচা ভাত খাওয়ানোর রীতি বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত আছে। মুসলমান সমাজে লৌকিক আচারের অবকাশ কম থাকলেও লাশ বহনের খাট তৈরির জন্য বাঁশের আগা-গোড়া দেয় না। নসরুল্লাহ খোন্দকার বলেন,

কেহ বলে মওতাব খাট বাঁধাইতে,
বাঁশ কিংবা গাছ নারে আগা গোড়া দিতে॥

কবরের চার কোণায় চারটি জিওল গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হতো। মধ্যযুগে এখানে মুসলমানরা মৃতদেহ ও তার ঘরকে অপবিত্র মনে করত। এ সম্পর্কে নসরুল্লাহ খোন্দকার বলেন–

কেহ কেহ অপবিত্র বলন্ত মরাবে।
তার দহ লোক কিবা যথেক মিত্তরে॥
বিনি ছেরানে নাপিতে ন হয় পবিত্র।
কি বুঝিয়া কহন্ত খেওরী পরিবার॥

মনে করা হতো যে, মৃতের আত্মীয়-স্বজন তিক্ত ভক্ষণ না করলে অমঙ্গল হয়। নিরামিশ খাওয়া প্রথাবদ্ধ রীতি।

অন্যান্য লৌকিক আচার

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজা পার্বণ এবং অপরাপর উৎসবকে ঘিরে কিছু লৌকিক আচারের প্রচলন রয়েছে। হিন্দু সমাজে বিভিন্ন ব্রত পালন করতে দেখা যায়। ব্রত আর্যেতর আচারানুষ্ঠান বলে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় মনে করেন। কিন্তু লৌকিক আচার কোনো ধর্মের সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি, সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। যেমন, গোবর লেপনের মাধ্যমে বাড়িঘর পবিত্র করার বিশ্বাস অতীতেও সকল সমাজে প্রচলিত ছিল। মুসলমানরাও গোবর দিয়ে লেপা, জোপার কাজ করতো বলে কবি নসরুল্লাহর শরিয়তনামা কাব্য থেকে জানা যায়। তেমনি আউশ ধানকে জারজ ধান মনে করা হতো। ফাতেহা, চুঁয়া ফেত্যা, বাইশ্যা, ফৈত্যা, ভাত ফৈত্যা প্রভৃতিতে হিন্দু ও মুসলিম রীতির মিলন ঘটেছে। এছাড়াও বিভিন্ন পূজা এবং শিরনী প্রদানে সকল সম্প্রদায়ের একক আচার-অনুষ্ঠান এদের অভিন্ন কৃষ্টির উত্তরাধিকারী করে তুলেছে। তার ব্যাপক পরিচয় কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের শরিয়তনামা কাব্যে পাওয়া যায়।

শুভ-অশুভ ধারণা

এখানে লোক সংস্কারে শুভ-অশুভের ধারণা প্রবল। শুভ-অশুভ ধারণার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো :

১। রাত্রে একনাগাড়ে কুকুর ডাকলে অমঙ্গল আশংকা করা হয়। (২) রাত্রে প্যাঁচার ডাকে অমঙ্গল আশংকা হয়। তা কেটে যাবার জন্য মেয়েরা চুলায় লৌহ শলাকা পোড়া দেয়। (৩) কুটুম পাখির ডাকে অতিথি আসে বলে মনে করা হয়। (৪) ঘর ঝাড়ু না দিয়ে

কানো কাজ করা হয় না। এতে অমঙ্গল হয়। (৫) কাউকে কুপির আগুন দিলে লক্ষ্মী চলে যায় বলে বিশ্বাস। এতে নিজের কুপি আবার জ্বালিয়ে নিতে হয়। (৬) পানের বোটা কুটি কুটি করে ভাঙলে বা কাটলে শত্রু বাড়ে। (৭) রাত্রিকালে মাথা আঁছড়ানো হয় না। (৮) রাত্রিকালে আয়নায় চেহারা দেখা হয় না। (৯) মাথা বা গালে হাত দেওয়া ক্ষতিকর। (১০) হাটবাজারে যাওয়ার সময় চুন বা সুচের কথা বলা অশুভ। ভাবার্থে পান খাওনী বা সেলানী আনতে বলা হয়। (১১) সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাবার পর টাকা-পয়সা দেওয়া মান্য। (১২) রাত্রিকালে এঁটো পানি বাইরে ফেলা হয় না– এতে দরিদ্র হয়ে যায় বলে বিশ্বাস। (১৩) টিকটিকির টিক টিক করাকে সঠিক বলে মনে করা হয়। (১৪) রাত্রে গাছের পাতা ছেঁড়া বা গাছ কাটা নিষিদ্ধ। (১৫) রাত্রে নিজের ছায়ার দিকে তাকানো অমঙ্গল। (১৬) দাঁড়িয়ে পানি পান করা দোষের। (১৭) বউদের স্বামী, শ্বশুর এবং ভাসুরের নাম নেওয়া দোষের। (১৮) পাল্লা, আড়ি, কুলা, চালুনি প্রভৃতিতে পা লাগা ভালো নয়। পা লাগলে সালাম করতে হয়। (১৯) দুধ ও আনারস একসঙ্গে খাওয়া হয় না। (২০) বাঘের সামনে পড়লে নাকি মামা ডাকলে বাঘ আর ক্ষতি করে না। (২১) রাত্রিকালে সাপকে পোকা বলতে হয়। (২২) যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয় বলে বিশ্বাস। (২৩) কপালে বাম হাত ঝুলানো অমঙ্গল। (২৪) যাত্রাকালে ডিম খায় না, (২৫) যাত্রাকালে পিছু ডাকে না, (২৬) বিবাহিতা মেয়েরা চুল খোলা রাখলে স্বামীর আয়ু কমে যায় বলে বিশ্বাস। (২৭) মুরগী মোরগের মত ডাকলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। সে মুরগি জবাই করে দিতে হয়। (২৮) পান ভাগ করে কিংবা আঙ্গুল থেকে আঙুলে চুন নিলে ভাগড়া হয়। (২৯) ডান হাতের তালু চুলকালে টাকা যায় এবং বাম হাতের তালু চুলকালে টাকা আসে বলে বিশ্বাস। (৩০) বাম চোখ নাচলে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। (৩১) খাওয়ার পর পরনের কাপড়ে হাত-মুখ মুছলে গরিব হয়ে যায়। (৩২) ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা ভালো নয়। (৩৩) ভাঙা বাসনে ভাত খেলে আয়ু কমে। (৩৪) চন্দ্র গ্রহণের সময় কিছু খায় না। এতে ক্ষতি হয়। (৩৫) বিয়েতে বৃষ্টি শুভ বলে মনে করা হয়। (৩৬) ভিক্ষুককে ভাত খাইয়ে একই সঙ্গে পয়সা দেওয়া ভালো নয় বলে বিশ্বাস। (৩৭) রাত্রে নখ কাটে না। (৩৮) কাকে ডাকলে অমঙ্গল আশংকা করা হয়। (৩৯) দিকভ্রমে পতিত ব্যক্তি তার পরিধানের বস্ত্র উল্টিয়ে মাথায় দিলে নাকি দিকভ্রম সংশোধন হয়ে যায়। (৪০) রাত্রিকালে আরশোলা ঝাকে ঝাকে উড়লে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে বলে মনে করা হয়। এ সময় জুতা উপুড় করে দিতে হয়।

এছাড়াও কোনো কোনো বার বা সময়ে যাত্রা কাজ করা মঙ্গলজনক নয়। যেমন, রবিবার বা শুক্রবারে ঘর লেপা ভালো নয়। রবিবার বা মঙ্গলবারে চুল বা দাড়ি কাটা মঙ্গল নয়। শুক্র এবং রবিবারে পশ্চিম এবং মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে যাত্রা শুভ নয়।

রামুর ডমের দিঘীকে ঘিরে বিভিন্ন কিংবদন্তি বা লোকবিশ্বাস এখানো প্রচলিত আছে। এর অতীত সম্পর্কে রহস্যময়তা এবং এর মালিকানা অর্জনে সাফল্য ও ব্যর্থতা অমোঘ এক নিয়তির লীলাকে অস্পষ্ট রেখায় বিধৃত করে রেখেছে। এছাড়া বর্ষার ভরা প্লাবনে বাঁকখালী নদীতে রাতদুপুরে শঙ্খের ধ্বনি শোনা নাকি মঙ্গল বয়ে আনে। রামুতে গুপ্ত ধন উদ্ধারের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে বিভিন্ন নকসা প্রচলিত আছে।

লৌকিক খেলাধুলা : প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে যে সকল দেশজ খেলার প্রচলন ছিল এর মধ্যে (১) বলিখেলা, (২) গরুর লড়াই, (৩) তম্বুরু খেলা, (৪) চুঁয়াখেলা, (৫) ঘাডুঘুডু খেলা, (৬) ঝিওলা খেলা, (৭) কুলুক খেলা, (৮) টুবি খেলা, (৯) নারকেল খেলা, (১০) পানি খেলা, (১১) কড়ি খেলা, (১২) বাঘ-পাইর খেলা, (১৩) ডাংগুলি খেলা অন্যতম। বলীখেলা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী খেলা। এটি মূলত মল্লযুদ্ধ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কুস্তি খেলার প্রচলন আছে। বলি খেলাও কুস্তির পর্যায়ভুক্ত। তবে নিয়মকানুনে আঞ্চলিক স্বকীয়তা বিদ্যমান। এই খেলাকে কেন্দ্র করে ঢোলবাদ্য বাজানো হয় এবং বলিদের নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। দৃষ্টি নন্দন এ দুটি মাত্রা বলিখেলার অন্য দুই আকর্ষণ। গরুর লড়াই এখানকার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় খেলা। মাঘ মাস থেকে এই গরুর লড়াই শুরু হয়। এর আগে চাষাবাদ শেষ করে গরু মোটাতাজা করা হয়। ঢোল-সহরত বাজিয়ে গরুর লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়। এটি আজও বেশ উপভোগ করে সাধারণ লোকজন।

ঙ. রাখাইন সমাজ ও সংস্কৃতি

আরাকানি শাসকরা বহু শতাব্দী যাবৎ রামুসহ সমগ্র চট্টগ্রাম শাসন করেছেন। তাদের বংশধর রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন তাই বহু পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তবে রামু এবং কক্সবাজারে রাখাইনরা ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করে অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে। বর্মিরাজা বোদপায়ার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়ে এরা উদ্বাস্তু হিসাবে রামু ও কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদেরকে এখানে পুনর্বাসন দেয়। বর্তমানে রামুতে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন সংখ্যায় কম হলেও অতীতে এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই প্রাচীন রামুর সামাজিক ইতিহাসে তাদের অবস্থান ছিল ব্যাপক বিস্তৃত।

পুরোনো পেশা

রাখাইনদের প্রাচীন ও প্রধান কাজ তাঁত বুনন। তাঁত থেকে কাপড় বোনা এবং উৎপাদিত কাপড় বাজারজাত করা রাখাইনদের আদি ও বংশগত পেশা। রাখাইনদের বসতবাড়ি সাধারণত দ্বিতল বিশিষ্ট হয়, তাঁত বুননের জন্যই আদিকাল থেকে এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক একজন রাখাইন রমণী সুনিপুণ তাঁতি। তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য করাটাই পুরুষের অন্যতম কাজ। রাখাইন সমাজে এখনো একজন তাঁতির মৃতদেহ জ্বালানি কাঠ ছাড়াই শুধুমাত্র তাত সরঞ্জামাদি দিয়ে সৎকার করা সম্ভব প্রবাদটি প্রচলিত আছে। এককালে রাখাইনদের নির্মিত চুরুট বিদেশেও রপ্তানি হতো। গ্রামাঞ্চলে রাখাইনরা কৃষিজীবী। উপকূলীয় অঞ্চলে লোকেরা মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ কাঁকড়া, ডংমাছ, বাইম মাছ বলবর্ধকও অধিক ক্যালরি সমৃদ্ধ নানা প্রজাতির সামুদ্রিক ঝিনুক শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। চুড়া ইছা মাছ (ছোট ছোট চিংড়ি, সাদা রঙের) থেকে নালি বা হিদল নামে এক প্রকার খাবার বা মুণ্ডু তৈরি করে যা সুস্বাদুর জন্য তরি-তরকারি, মরিচ ভর্তা ও শাক-সবজির স্যাপে ব্যবহৃত হয়। পাহ-

াড়ি অঞ্চলে লোকেরা বাঁশ ও বেতের সামগ্রী থেকে নানা আকারে ঝুড়ি, তলই, কুলা, দোলনা, ডোল প্রভৃতি জিনিস তৈরি করে, এটিও রাখাইনদের পুরোনো পেশা। হস্তচালিত পেশা বা কারিগরি পেশার মধ্যে আদিকালে স্বর্ণকার পেশা জনপ্রিয় ছিল। রাখাইনরা স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হতে পছন্দ করত বলে আগেকার আমলে তেমন চাকরি করত না।

লোক সংস্কার

রাখাইন সমাজে স্মরণাতীতকাল থেকেই শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল বোধ প্রচলিত আছে। সাধারণত পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পরের দিন যাত্রা বা কোনো কাজ সূচনা করে না। রাখাইন পত্রিকার নির্দেশনা মোতাবেক মাসে নির্দিষ্ট বারে (প্রাছাধা) যাত্রা ও শুভ কাজ সূচনা করে না, পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট বারে (রাৎরাজা) যাত্রা ও যে কোনো শুভ কাজ সূচনা করে। তবে বৃহস্পতিবারকে ভালো দিন মনে করা হয়। শনিবারে যাত্রা অশুভ বলে ধরে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে এবং মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে ভ্রমণ করে না। যাত্রাপথে সাপ পড়লে আর যাত্রা করে না। যাত্রাকালে হোঁচট খেলে সে যাত্রা অশুভ হয়। আকাশে অপ্রত্যাশিতভাবে তারকাপুঞ্জ বা ধূমকেতু জাতীয় কিছু দেখা দিল দেশে অমঙ্গল বা রাষ্ট্র প্রধানের মৃত্যু হবার সম্ভাবনা থাকে বলে মনে করা হয়। পাখির কলরব অতিথি আগমনের রক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। অস্বাভাবিক কর্কশ ডাক অশুভ। খাবার সময় জিহ্বায় অভাবিতভাবে হঠাৎ দাঁত কামড় পড়লে প্রিয়জন স্মরণ করছে বলে মনে করা হয়। জন্মবারে কেউ চুল ছাঁটাই করে না, রাতে আয়না দেখে না এবং চুল আঁচড়ায় না। স্ত্রীর বড় বোন থেকে স্বামী, হাতে হাতে কোনো জিনিস গ্রহণ করে না এবং সাধারণত পরস্পর কথাও বলে না। গোসলখানায় মহিলার ব্যবহৃত জিনিসসমূহ যথা– বালতি, জগ ইত্যাদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা ব্যবহার করে না। মহিলাদের পোশাক সামগ্রীর নিচ দিয়ে এবং সিঁড়ির নিচ দিয়ে পুরুষেরা গমন করে না। নতুন বাড়িঘর নির্মাণের সময় স্থাপিত প্রথম খুঁটির সাথে আমপাতা, নারকেল ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে। কুনজর এড়ানোর জন্য ফসলি গাছের সাথে পুরোনো জুতা, গরু-মহিষের শিং ঝুলিয়ে রাখে।

লৌকিক চিকিৎসা

পুরাকালে রাখাইন সমাজে আয়ুর্বেদীয় বা নিজ শাস্ত্রীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত হতো। জ্বর, পেটের পীড়া, শরীর ব্যথা, পোড়া, ক্ষত, হাত-পা কাটা-ছেঁড়া ইত্যাদি ব্যাধি সাড়াবার জন্য গাছ-গাছালি, শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা ব্যবহার করত। রাখাইন সমাজে কেউ অসুখ-বিসুখে পড়লে মন্ত্রজানা লোক মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে, ধর্মীয় ভিক্ষু বা গুণীজনেরা আশীর্বাদ পড়ে ফুঁ দিলে ভাল হয়ে যায় বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। ভন্তে (ফুংগ্রীঃ) কর্তৃক নির্মিত মন্ত্রপড়া পানি খাওয়ালে পেটের পীড়া ও জ্বীন-ভূত প্রেতের আছর ভালো হয়ে যায়। উক্ত মন্ত্র পড়া পানি বাড়িময় ছিটালে বাড়ির লোকজনের মংগল হয় এবং আয়-উন্নতি প্রসার ঘটে বলে মনে করা হয়। গলায় টনসিল, খাবার সময় মাছ-মাংসের হাড় গলায় আটকে গেলে কিংবা বাহু বা বগলে পিছলা মন্ত্র পড়ে সাড়িয়ে তোলা হয়। শিশুরা হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হলে কিংবা কোন ব্যক্তি অস্বাভাবিক রকম আচরণ করলে

ভূতে ধরেছে বলে মনে করা হয়। এ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য একজন বয়স্ক মহিলাকে একটি ঝুড়িতে করে ভূত খাবার উদ্দেশ্যে মাছ-মাংস, অনেক সময় জীবন্ত মুরগি, তরতাজা ফলমূল নির্জন জায়গায় রেখে আসতে হয়। একটি দা সাথে বহন করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে যাবার ও ফিরে আসার সময় উক্ত মহিলা কারো সাথে কথা বলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলাটি আসছে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ির উপর হতে কাউকে নামাতে এবং কাউকে বাড়ির ওপরে উঠতে দেওয়া হয় না। মহিলাটি আসলে দা দিয়ে সিঁড়িকে তিন বার আঘাত করে প্রতি বার বলে, রোগমুক্ত হয়ে ভালো, শান্তি হয়েছে কিনা। বলার সাথে সাথে বাড়ির ওপর থেকে একজন হাঁ সূচক জবাব দেয়। রাতে ছেলেমেয়েরা বাড়ী হতে বের হওয়ার সময় জ্বীন-ভূত-প্রেত যাতে আছর না করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের কানের উপর ছাদ থেকে গোলপাতা ছিড়ে এক টুকরা ফেলে দেওয়া হয়। বদলোকদের কুনজর এড়ানোর জন্য বাচ্চাদের কোমড়ে সূতা নির্মিত কালো রঙের একটি বিছা পরানো হয়। অজগর সাপের পিত্ত খেলে শিশুদের অসুখ, কাঠবিড়ালীর মাংস খেলে হাঁপানির অসুখ ভালো হয়ে যায় বলে লোকবিশ্বাস আছে। সমাজে কেউ কাউকে ক্ষতি করতে চাইলে মন্ত্রজানা লোকদের বাণ মারার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। যাকে ক্ষতি করা হবে তাঁর মাথার চুল, ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা, মাটির তলা থেকে বালু সংগ্রহ করা হয়। মন্ত্র পড়িয়ে, ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকাদের বা গণকের কথা বিশ্বাস করে এবং ভূত-প্রেতাত্মাকে বিশ্বাস করে। স্বপ্নে দেখা ভালোমন্দ বাছবিচার করে, ভবিষ্যৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল নির্ণয় ও ভাগ্যে বিশ্বাস করে। রাখাইন সমাজে গৃহ দেবতা ও বোধিবৃক্ষ পূজা ও মানত করার রেওয়াজ এখনো প্রচলিত আছে।

লৌকিক খেলাধুলা

আদিকাল থেকে রাখাইন সমাজে লৌকিক খেলাধুলার মধ্যে তাঁদের ভাষায় খেট ক্যাউছি, তেং খৃং, অং লুং চিঃ থেং, পুংনা তারাঃ হোওয়া থেং, ব্রাং লুং কাজেট, থেং, কোওয়েনছি হতেং, ক্রোধুং থেং, চি-ঠো থেং, তেইং তাক, থেং, মং বাউ থে, ক্র মা ক্রং লাই ভেম্বং, লেই উপ্যাউলো লেইমাত্রা, চা পিং ওয়াং মং পেং জাং ইত্যাদি প্রচলিত আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান খেলার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

খেট ক্যাউছি খেলা : স্থানীয় বাঙালিরা এ খেলাকে ডাংগুলি খেলা বলে। দুটি দলে সমসংখ্যক খেলোয়াড় থাকে। ছেলেরাই এই খেলার খেলোয়াড়। কাঠ বা গাছের ডাল থেকে এই খেলার উপকরণ ডাং ও গুলা তৈরি করা হয়। গুলার যে কোনো প্রান্তকে ডাং দিয়ে মৃদু স্পর্শ করার সাথে সাথেই সামান্য উঠন্ত গুলাকে প্রতিজন তিন বার করে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবার মধ্যে দলের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। বিজিত দলের খেলোয়াড়দেরকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়রা কান ধরে বা পিঠে ওঠে জয়ের স্বাদ গ্রহণ করে।

তেং খুং থেং : রাখাইন ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় ও চিত্তাকর্ষক খেলা। এই খেলাকে অনেকে জা রাক্ খুং থেং আবার অনেকে খং ব্রাউ খুং থেং নামে আখ্যায়িত করে থাকে। রাখাইন অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে আজো এ খেলার প্রচলন নাছে। হেলে-দুলে হাতে-

পায়ে-নানা অঙ্গ ভঙ্গিমায় খেলাটি দারুণ উপভোগ্য।

অং নুং চিঃ ধেং : ছেলেদের খেলা এটি। নির্দিষ্ট দাগে দাগাংকিত করে খেলার জন্য মাঠ তৈরি করা হয়। প্রতিপক্ষকে ডজ দিয়ে বা ফাঁকি দিয়ে নির্ধারিত দাগে ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের শেষ সীমানা স্পর্শ করে পুনরায় নির্ধারিত দাগ হয়ে নিজের দলের সীমানা আগমনের মধ্যে এ খেলার জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়।

গুং না তা রাঃ হো ও য়া থেং : উভয় দলে সমসংখ্যক ছেলে বা মেয়ে থাকে। মাঠে তারা দু'প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে উলটা দিকে বসে থাকে। একজন বিচারক খেলাটি পরিচালনা করেন। তাকে বলে আসতে হয় প্রতিপক্ষ দলে কে আসলে জয়ী হবে। এ খেলায় খেলোয়াড়দেরকে নিজ নামে না ডেকে ভিন্ন নামে বা ছদ্মনামে ডাকা হয়।

ব্রাং লুং খেলা : বেত নির্মিত ফুটবল আকৃতি একটি হালকা বল। খেলাটি মূলত অপ্রতিযোগিতামূলক। বৃত্তাকার হয়ে খেলোয়াড়রা নির্দিষ্ট দূরত্বে দণ্ডায়মান থাকে। মাঝখানে একজন পঁচা খেলোয়াড় থাকে। মাটিতে স্পর্শ না করে পচা খেলোয়াড়টি যাতে বলটি না পায় সে রকমভাবে অন্যান্যরা পরস্পরকে পা ও মাথার সাহায্যে আদান-প্রদান করে।

তেইং তাক থেং : ৩০/৩৫ হাত দীর্ঘ একটি সোজা ও মোটা বাঁশকে তেল ঘি দিয়ে খুব পিচ্ছিলভাবে তৈরি করে একটি খোলা মাঠে টানানো হয়। তার শীর্ষে সোনা, রুপা ও অন্যান্য দামি উপহার সামগ্রী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত প্রবজ্যা (শ্রমণ দীক্ষা) অনুষ্ঠান উত্তর ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাটি আয়োজন করা হয়। বিপুল দর্শক (ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক) সমাগম হয় এ খেলায়। কয়েকটি দলে বিভিক্ত হয়ে ছেলেরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালাক্রমে পিচ্ছিল বাঁশের শীর্ষ চূড়ায় উঠতে চেষ্টা করে। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল অত্যন্ত সম্মানিত হয়। তেতুলের বিচি খেলা, নিজেদের তৈরী পুতুল খেলা, নানা প্রকারে কানামাছি খেলা, লুকোচুরি খেলা, সাকু খেলা, পাথরের পাঁচ ঘুঁটি খেলা, কাদামাটি দিয়ে ছোট ছোট পাত্র তৈরি করে ফোটানো, লাটিম খেলা, পাথর দিয়ে পয়সা খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, নৌকা বাইচ ইত্যাদি উল্লেখ করবার মতো। এককালে রাখাইন রমণীরা ঘীলা বিচি নিয়ে জোছনা রাতে এক ধরনের মজাদার খেলা খেলত (রাখাইন ভাষায় তাকে ধো কা জেট ধেং)। সমাজ ও যুগ বিবর্তনে রাখাইন লৌকিক খেলাধুলা আজ দিন দিন বিলুপ্ত হচ্ছে।

কিছু খেলা আছে খেলার সময় মুখ থেকে ছড়ার আকারে কথা বলতে হয়। নিচে সে রকম কয়েকটা খেলাব ছড়া উদ্ধৃত করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাখাইন ভাষায় এমন কয়েকটা বর্ণ, শব্দ ও শব্দগুচ্ছ আছে যেটা বাঙালিরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

আফোঃ আফোঃ জা তুঃ সে কাজেট ধেং

আফেউঃ আফোঃ জা তুঃ লে?
সোওয়ে ঙোওয়ে তুঃ রে।

সোওয়ে না ঙোওয়ে না ফা ফোঃ নাঃ?
মা ফা।
আফোঃ জার মা নি রে?
নেংদারাছির মা নি রে
নেংমারাছি তানুং পিঃ ফোলাঃ?
মা পিঃ।
মাং ঘং থাক মা ক্রাক্ সি।
যাক পা নাই,
যা য়াক।
চাঃ কা চা নি, সিঃ পা পাউ থেঃ
ভু ভু ভু ভু।

অনুবাদ : দাদু দাদু কি খনন করো?
খনন করি সোনা রূপো।
সোনার সাথে বদল করবে কি রূপো?
করবোই না।
দাদু তুমি থাকো কোন গ্রামে?
থাকি আনারস গ্রামে।
দেবে কি আনারস একটি।
দেবো না।
তোমার মাথার উপর মুরগির গোবর
ফেলে দাও।
দেবো না।
খাও তো খাও, পায়ু বুদ ফাটিও না তবে
ভু ভু ভু।

বিবরণ : এটি এক ধরনের দৌড় খেলা বিশেষ। খেলার নাম আফোঃ আফোঃ জা তুপ লে। একদল ছেলেমেয়ে তাদেরই একজনকে (দাদু) এক কোনায় বসিয়ে রেখে উপরোক্ত কথোপকথনের পর সবাইকে দৌড়ান। ছেলেমেয়েরাও দৌড়িয়ে পালায়। তাকে সর্বপ্রথম স্পর্শ করতে পারবে তাকে বর্ণিত দাদুর ভূমিকায় থাকতে হয়।

ভেং খাঃ চু ড্রিঃ ভেং খাঃ ফওয়াং
তেংখাঃ ছুটিঃ তেংখাঃ ফওয়াং?
মা ফওয়াং।
কোওয়েন য়া ছিঃ য়া পিঃ বা মে।
চা সউ খেংবামে।
ওয়াং বা লিপেট মামাঃ সেরো
তাপিং ওয়াং মং পেং জাং
নাক্রিং ওয়াং মং পেং জাং

ছুংপিতং ওয়াং মং পেং জাং
মাং মি নামে জানে?
ক্রাক ছংনিং।
মাং ফা নামে জানে?
ক্রাক ছেং ফ্রং।
সোওয়ে ধা নাঃ খোওয়েত ফোলাঃ
সোওয়ে দা নাঃ কোওয়েত ফোলাঃ?
সোওয়ে ধা নাঃ খোওয়েত ফো।

ওয়াইং ট্রি পেত পেত্ব ওয়াইং
ওয়াইং ট্রি পেত্বপেত্ব ওয়াইং ওয়াইং
ওয়াইংট্রি জা নাঙ ক্রি লে?
এ না উ ক্রি রে।
ওয়াইং ক্রি জা না তে রে?
ছেংগুরাছিঃ কোছেব্রাউ নুং
হাইমো-হাইশো-হাইশো।

ছড়া : আমেলে রাউ মাঃ লে
মোহাং বুংজং লাঃ পেতমে
মোহাংলে বুঃ চুঃ লে চুঃ
চুঃকোলে খন নিংলে ওয়াং
ইংগোলে রাউ মোঃলে খা
কাউকারি কাউ।

অনুবাদ : ও দিদি ও বৌদি গো
মোহং শাক তুলতে চলো
মোহং শাকও তুলি, কাটাও ফুঁটি
কাটাও বের করি, সন্ধ্যাও হয়
বাসাও পৌঁছি, ভোরও হয়
মোরগও ডাকে, কুক কু রু কুক।

লোক সঙ্গীত : লেত্ লেত্... লেত্ লেত্
আলুরো লেত্
লাভাঃ তাব্রাং যাং শে না
কাজের ঝি পেত্ মে
আছু আছু পং ফো

দো ধো ধোঃ থ কেত্ পামে
রাখাইন ছুশে রি কাজেত্ তে
ও রাউমারোঃ ক্যেং প্যবারে।

অনুবাদ : এসো এসো...এসো এসো
লোকজন এসো...
ভরা চাঁদে জোছনাপরা মাঠে
চলো যাই খেলতে,
কারা কারা যোগ দিবে
ঘীলাবিচি খেলাতে
রাখাইন ছেলেটি জল পিড়াতে
বৌদি গো আমরা হয়ে উঠি আনন্দিত।

বিবাহ

রাখাইন সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমক ও হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সম্পাদিত হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো রাখাইন সম্প্রদায়ের কোনো গোত্রভেদ নেই। মূলত অভিভাবকদের পছন্দই, কালক্রমে ছেলেমেয়ের পছন্দমতো অভিভাবকদের সম্মতিতে বিয়ের অনুষ্ঠানকে প্রথাসিদ্ধ বিয়ে হিসাবে রাখাইন সমাজ স্বীকৃতি প্রদান করে। বিয়ের জন্য কোনো বয়স নির্ধারিত না থাকলেও সাধারণত বয়ঃপ্রাপ্তির পরই বিয়ের উপযুক্ততা লাভ করে। প্রাচীনকালে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাকালের অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত (রাখাইন ভাষায় ওয়া মেঃ মা) বিয়ের সময়। মাঘ ও চৈত্র মাসে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় না। সহোদর, চাচাতো, ফুপাতো ও খালাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলে ছেলের অভিভাবকেরাই ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী সন্ধান করে। বিয়ের পূর্বেই ছেলেকে ধর্মীয় বিধি মোতাবেক অন্তত এক সপ্তাহের জন্য শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করে বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করতে হয়। রাখাইন পাত্রী পক্ষের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করে। পাত্রীর সম্মতি নিয়ে পাত্রী পক্ষের লোকজন পাত্র পক্ষের সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ রক্ষা করে। এভাবে উপযুক্ত ও পছন্দসই পাত্রী সন্ধান পাওয়ার সাপেক্ষে পাত্রীপক্ষকে বিয়ে সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বলার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে পাত্রপাত্রীর রাশি, জন্মবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যবিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট তারিখে গোত্রপক্ষের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়স্বজন ও এলাকার গুণীজন সাধ্যমতো আপ্যায়িত করে এবং তাদেরও নিকট আত্মীয়স্বজন, এলাকার গুণীজনকে চূড়ান্ত কথা পাকাপাকি করার জন্য আমন্ত্রণ করে রাখে।

রাখাইনদের বিয়েতে কোনো যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই। তাই বিয়েতে কোনো দেনমোহর ধার্য করা হয় না। তবে পাত্রী যেহেতু জীবন সঙ্গিনী হিসাবে পাত্রের নিকট

চলে আসবে সে কারণে পাত্রীকে সামান্য সংখ্যক অথচ নামিদামি পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাধ্যমতো নির্দিষ্ট ওজনে সোনার গয়নাগাটি প্রদান করার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। এটি বাধ্যতামূলক। রাখাইন ভাষায় একে আছয়াং বলে। উভয় পক্ষ এ বিষয়সহ অন্য সব বিষয়ে সমঝোতায় এসে বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠান বা বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। সন্তোষজনক আলোচনার পর পাত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু স্বর্ণালংকার বা আংটি পরানো হয় ও আশীর্বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর অভিজ্ঞ বৌদ্ধের ভিক্ষু বা জ্যোতিষী কিংবা গণক কর্তৃক পাত্র-পাত্রীর রাশি, জন্মবার, ঠিকুজি ইত্যাদি দেখে দিনক্ষণ গুণে শুভ-অশুভ ইত্যাদি নির্ণয় করে বিয়ের দিনক্ষণ ধার্য করা হয়। অবশ্য পরিবার প্রধান ও পারিবারিক সুসময়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

বিয়ের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বর-কনের কক্ষ বা কামরাসহ বাড়িকে সুন্দর করে সাজানো হয়। রঙবেরঙের কাগজ, বেলুন ইত্যাদি তখন মনোরম শোভা পায়। গ্রামাঞ্চলে মাইক বাজানোর রেওয়াজ এখনো প্রচলিত আছে। দূরের আত্মীয়রা এ উপলক্ষে বাড়িতে আগাম চলে আসে। সামর্থ্য অনুযায়ী এলাকার সবাইকে লিখিত ও মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিয়ের দুইদিন পূর্বে বর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকে বিয়েতে আমন্ত্রণের জন্য অঞ্চল ভ্রমণ করার প্রথা প্রচলিত আছে। মূলত এ আমন্ত্রণ বরের বন্ধু-বান্ধব, সমবয়সি কালক্রমে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে সামান্য খুশি করার প্রয়াস মাত্র। বিয়ের আনন্দের আমেজ জমজমাট করার জন্যই খাবারদাবার আপ্যায়নের পাশাপাশি গৃহ নির্মিত মদও পরিবেশন করা হয়। অনেকে ভুলবশত একে সমাজের ট্রাডিশন বা বাধ্যবাধতা বলে মনে করে থাকে। ইদানীং বিয়েতে এ ধরনের আপ্যায়নের নিছক অপচয় বলে ধীরে ধীরে পরিহার করা হচ্ছে যা রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্য মঙ্গলময়। এ আপ্যায়ন বিয়ের পূর্ব দিন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনকে রাখাইনরা 'কোওয়েন য়ানে' বলে থাকে। এদিনে আমন্ত্রিত মহিলারা বর ও কনের বাসায় বিকালের দিকে গিয়ে পানকিলি তৈরি করে দেয়। বিয়ের খাবারদাবারের প্রস্তুতিতে বিভিন্ন আয়োজন প্রস্তুতিমূলকভাবে সম্পন্ন করে রাখে। সন্ধ্যার দিকে কনে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে নিয়ে এলাকার সমবয়সি মেয়েদের বাসায় বাসায় গিয়ে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। কেউ কেউ রাতে ফিরে গেলেও ঘনিষ্ঠরা কনের বাড়িতে থেকেই যায়। আমোদ-ফূর্তি করে তারা রাত্রি যাপন করে।

পরের দিন অর্থাৎ বিয়ের দিন ভোরবেলায় বৌদ্ধ ভিক্ষু বর ও কনের বাসায় গিয়ে বর-কনেকে পঞ্চশীলে দীক্ষিত করে। এ সময় বর ও কনের পাশে নির্দিষ্ট সংখ্যক তাদের বন্ধু-বান্ধবীরা পরিবেষ্টিত থাকে। কামরার বাইরে অভিভাবকরা অবস্থান করে। কামরার ভিতরে বর বা কনের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পাশে বা কোণ পাশে কোন বারে বসবে তাকে তাদের কি কি কর্তব্য, এসব আগে থেকে জ্যোতিষী/গণক কর্তৃক গণনা করে রাখা হয়। উপস্থিত সকলকে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। জ্যোতিষী বা গণক গণনা করে তালপাতাতে বিস্তারিত বর্ণনা করে রাখে। এ সময় বরকে বর পোশাকে এবং কনেকে কনে পোশাকে সাজানো হয়। ভিক্ষু আসার পূর্বে বর-কনেসহ কামরার ভিতরে যারা থাকবে তাদের সবাইকে গোসল করতে হয়। ভিক্ষুদের হাতে কিছু সুতা দেওয়া

হয়। তিনি মঙ্গলসূত্র পাঠ করার পর বর বা কনের মুকুট এবং তথায় অবস্থিত তামা নির্মিত ক্ষুদ্র কলসি (জলের ঘট)তে সুতা দ্বারা পেঁচিয়ে দেন। সেই কলসিতে সুতা বাঁধবার নিয়মও আছে। অবশিষ্ট সুতা কামরার চারদিকে সাতবার/তিন বার পেঁচিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পরে আমন্ত্রিতরা বর-কনেকে নগদ অর্থ, অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করে ও আশীর্বাদ করে। জবাবে বর বা কনে উপহারদাতাকে দু'হাতে প্রণাম করে পান, সিগারেট ইত্যাদি প্রীতি উপহার হিসাবে প্রদান করে। বর-কনের সাথীরা তাদের ছোট ছোট ভাই-বোনেরা উপহার দেয়ার ছলে বিভিন্ন হাস্যোদ্দীপক উপহার সামগ্রী প্রদান করে হাসি-তামাশা করে আনন্দ উপভোগ করে। উপহার দেয়া-নেয়ার পর আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে সাধ্যমতো আপ্যায়িত করা হয়।

মূল বিয়ের পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বিকাল বেলায়। রাখাইনদের বিয়ে সাধারণত চলন্ত বিয়ে অর্থাৎ কনের পিতৃগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বরযাত্রী যাবার আগে সারিবদ্ধভাবে একদল বিবাহিত মহিলা প্যাগোডা আকারে চমৎকারভাবে কারুকার্য খচিত সাজি বা ডালা (রাখাইন ভাষায় 'ঔ') বহন করে কনের বাড়িতে গমন করে। এসব ডালার ভিতরে থরে থরে সাজানো থাকে কনের জন্য বরের পক্ষ থেকে আনা পোশাক সামগ্রী, প্রসাধনী সামগ্রী, খাবার সামগ্রী ও গয়নাগাটি। দলের অগ্রভাবে থাকে এমন মহিলাকে অবশ্য সধবা এবং বর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হতে হয়। প্রয়োজনীয় ফল ও সবজির আগা ঔ বা ডালিতে বহন করতে হয়। সে ঔ-কে রাখাইন ভাষায় 'আন্যেং ঔ' বলে। তার বহনকৃত ঔ-এর আগায় বা শীর্ষে দুটি রুমাল এবং অন্যান্য ঔতে একটি করে রুমাল থাকে। বহনকারী মহিলারাই বেঁধে দেয়ার রুমাল পাওয়ার অধিকারী হয়। কনের বাড়িতে জিনিস সামগ্রী প্রদানের পর আবার সারিবদ্ধভাবে ঔ বহন করে বরের বাড়িতে ফিরে আসে। মহিলাদের এ যাত্রাকে 'পোওয়ে তাং' বলে।

এবার বরযাত্রার পালা। কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা কালে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ লাইনে অগ্রভাগে থাকে এলাকার মুরুব্বি গোছের লোকজন, মধ্যখানে ঔ বহনকারী মহি-লারা এবং পিছনে বর ও তার সাথীরা। সাথীরা বন্ধুর পরিধেয় কাপড়-চোপড়ের ব্যাগ, বিছানা, একটি লম্বা দা (তলোয়ার মতো দেখতে), জলের ঘট (তামা নির্মিত), ধূমপানের পাইপ, পাখা ইত্যাদি বহন করে। এ সময় বর মাথায় একটি সুন্দর মুকুট (শং) পরে, গায়ে জড়ানো থাকে বিশেষ ও নির্দিষ্ট শাল (কোঃ দং সোয়া) এবং শার্টের উপর একটি বারেস্টার বা কোর্ট (প্রাংখেংআংগ্যী)। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র যথা– বুৎ, লাংখ, হ্নে ইত্যাদি– সাহায্যে বন্ধু-বান্ধবরা নেচে-গেয়ে হৈচৈ করে কনের বাড়িতে গমন করে। ঔ বহনকারীরা কনের বাড়িতে সরাসরি উঠে যায়। বর নিচে অন্যান্যদের সাথে থেকে যায়। এবং তাদের বসার জন্য কনের পক্ষকে ব্যবস্থা করে দিতে হয়। দূর থেকে আগত বরযাত্রীকে প্রথমে রাখাইন সম্প্রদায়ের জনগণ বিশ্রামের জন্য বিশেষ স্থান 'চেংরাঘরে' কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে কনের অভিভাবক কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে। সেখান থেকে রীতি অনুযায়ী কনের বাড়িতে যাত্রা করে।

কনের গ্রামে বা পাড়ায় প্রবেশমুখে স্থানীয় অবিবাহিত তরুণরা বর পক্ষের কাছে নিজেদের জন্য নির্ধারিত ও প্রচলিত প্রাপ্য হিসাবে নগদ অর্থ দাবি করে এবং তা

বরপক্ষকে পরিশোধ করতে হয়। একে রাখাইন ভাষায় 'রওয়াংখা' বলে। এ নগদ অর্থ দাবি ও পরিশোধ সংক্রান্ত অনেক সময় উভয় পক্ষে মধ্যে দর কষাকষি ও মনোমালিন্য হয়। বিভিন্ন অঞ্চলভেদে যদিও এটি পূর্ব থেকে ধার্যকৃত তবুও উভয় পক্ষের মুরুব্বিদের হস্তক্ষেপে অনেক সময় মিটমাট করতে হয়।

মহিলাদের বহনকৃত ঔ-এর বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে একটিতে থাকে বরের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সুগন্ধী সরু বিন্নী চাল। সেই চালের সাথে কনের বাড়িতে অনুরূপ চাল মিশিয়ে বিশেষ ধরনের রান্না তৈরি করা হয়। রান্না চলাকালীন সময় কনের পাশে পরিবেষ্টিত বান্ধবীরা গান গেয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করে থাকে এবং নিচে বসা বরের উদ্দেশ্যে সুগন্ধী পানি ছিটায় এবং ফুল, চাউল ইত্যাদি নিক্ষেপ করতে থাকে। এ ফাঁকে কনেকে অপরূপ সাজে সাজানো হয়। যথাসাধ্য পিতামাতারা নিজেদের স্বর্ণালঙ্কার ও বর পক্ষ থেকে পাওয়া স্বর্ণালংকার দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে রাখে। কনে এ সময় ঐতিহ্যবাহী পোশাক সামগ্রী পরে এবং মাথায় একটি বর্ণময় ওড়না দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে সমাধার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কনে ঐ ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় থাকে। রান্না শেষ হবার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানোর পরই বর কয়েকজন সাথীকে নিয়ে কনের কামরা বা কক্ষে অর্থাৎ বিয়ের আসরে প্রবেশ করে। কনের বাড়িতে ওঠার সময় একজনকে বহনকৃত ঐ লম্বা দা দিয়ে সিঁড়িতে সাত বার আঘাত করে উঠতে হয়। পা ধোয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন গেইট বা দরজা পার হয়ে কনের কামরার প্রবেশ পর্যন্ত কনের বান্ধবী এবং ছোট ভাই-বোনদেরকে নগদ অর্থ দক্ষিণা দিতে হয়।

বিয়ের আসরে কনের পক্ষে কয়েকজন কামরার ভিতর অবস্থান করে এবং বিয়ে পরিচালনা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ, বয়স্কা মহিলা থাকেন। বর ও কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে রাখাইন সমাজে চিরাচরিত প্রচলিত ও ধর্মীয় রীতিনীতিসমূহ পালন করে তিনি আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন করে দেন। এখানেও বর ও কনের পাশে কে বা কারা বসবে আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে। উভয় পক্ষের উপস্থিত জনেরা ভাত মুঠো তৈরী প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। বিয়ে সম্পন্ন হবার পর কনেকে মাথা নিচু হয়ে দু'হাতে বরের পদতলে প্রণাম করতে হয়। অতঃপর বর কনের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। দাম্পত্য জীবন সুখী এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে তারাও প্রতি উত্তরে আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

সাধারণত বিয়ের শেষে ঐদিনই কনে শ্বশুরালয়ে চলে আসে। কনের পক্ষের লোকজন সারিবদ্ধভাবে কনেকে মধ্যখানে রেখে বরের বাড়িতে নিয়ে আসে। লজ্জাবনত হয়ে কনে একটি ছাতা নিয়ে মুখ নিচু করে রাখে। কনে বরের বাড়িতে ওঠার সময় সিঁড়ির গোড়ায় পাথর বাটি ও রুপার বাটিকে প্রণাম করে একটি ভরাট কলসিতে হাত ডোবাতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তিনদিন বা সাতদিন পরে কনে শ্বশুরালয়ে চলে আসে। এক্ষেত্রে বরকে কনের বাড়িতে থাকতে হয় এবং থাকাকালীন সময় বর নিজ গৃহে প্রবেশ করতে পারে না। তবে অন্যান্য জায়গায় যেতে পারে। বিয়ের পাঁচদিন পরে বর ও কনেকে একসাথে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়। সাতদিন কামরার ভিতর একসাথে

একই প্লেটে ভাত খেতে হয়। খাবারের অবশিষ্টাংশসমূহ বাইরে ফেলে না দিয়ে রাখার জন্য একটি মাটির পাত্র (মঙ্গল পাত্র) থাকে। সাতদিন পর ঐ পাত্রকে পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং বাড়ির কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা হয়। এভাবে রাখাইন সমাজে প্রথাসিদ্ধ বিয়ে প্রচলিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

উৎসব পার্বণ

রাখাইন সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধ ধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই অংশে বিভক্ত। রামুর রাখাইনসহ পুরো বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হীনযান অর্থাৎ খেরবাদী। রাখাইনরা বরাবরই তাদের ইতিহাস, শিল্প, কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত। তাদের উৎসব পরবসমূহ মূলত পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা সনের ন্যায় রাখাইন সনের বারো মাসের নাম হলো : (১) তেংখুং (বৈশাখ), (২) কাছং (জ্যৈষ্ঠ), (৩) নেংয়ুং (আষাঢ়), (৪) ওয়াছো (শ্রাবণ), (৫) ওয়াখং (ভাদ্র), (৬) তোয়াছালাং (আশ্বিন), (৭) ওয়াগ্যোয় (কার্তিক), (৮) তেংছং (অগ্রহায়ণ), (৯) নেহতো (পৌষ), (১০) প্রাছো (মাঘ), (১১) তাভোথোয়ে (ফাল্গুন) ও (১২) তাভং (চৈত্র)। এখনো উদযাপিত হচ্ছে সেরকম ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে 'এ্যংরিংপোয়ে' (বুদ্ধ পূর্ণিমা/বৈশাখী পূর্ণিমা), ওয়াছোলাব্রে (আষাঢ়ী পূর্ণিমা), ওয়াগ্যেল্যাব্রে (প্রবারণা পূর্ণিমা), কাথিংপোয়ে (কঠিন চীবর দানোৎসব) এবং সামাজিক উৎসবগুলোর মধ্যে সাংগ্রেং (বর্ষবরণ উৎসব), রাখাপোয়ে (রথোৎ সব) উল্লেখযোগ্য।

সাংগ্রেং উৎসব : দেশ ও জাতিভেদে পুরোনো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত ও বরণ করে নেয়ার রীতিনীতি ও উৎসব ভিন্ন হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি রামুর রাখাইন সম্প্রদায়েরও বর্ষবরণ উৎসব বা মাহা সাংগ্রেং পোয়ে অর্থাৎ সাংগ্রেং উৎসব হয়ে থাকে। স্থানীয় বাঙালিরা এ উৎসবকে পানিখেলা বা জলকেলি উৎসব (Water Festival) বলে থাকে। প্রতি বছর ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ উৎসবটি পালন করা হয়। সামাজিক উৎসবের মধ্যে এই সাংগ্রেং উৎসব অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দঘন অনুষ্ঠান। সাংগ্রেং পারস্পরিক মৈত্রী বন্ধনকে আরো দৃঢ় ও গাঢ় করে তোলে। কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই এ উৎসবে কয়েক দিন মেতে থাকে। সাংগ্রেং উৎসবের কয়েক দিনে সব দুঃখজ্বালা যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে সবাই একাকার হয়ে যায়। এ যেন বছরের এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সময়। তরুণ-তরুণীদের এ উৎসব করে আসবে তার দিন গুণতে দেখা যায়। সাংগ্রেং যেন নিজের অন্তরে গচ্ছিত ও পুঞ্জীভূত গোপন আপন সব কথা প্রিয়জনকে বলার সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। সাংগ্রেং একে অপরকে খুব কাছে এনে দেয়। তাই সাংগ্রেং রাখাইন সম্প্রদায়ের এত আনন্দের ও সুখের।

সাংগ্রেং কয়েক দিন ধরে স্থায়ী থাকে। ১ম দিন (আক্যানে), ২য় দিন (আ ক্যে নে), ৩য় দিন (আচাটাক), ৪র্থ দিন (আ প্যেং নে)। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রীরা পরে এলাকাভিত্তিক নারী-পুরুষেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে সারিবদ্ধভাবে নানা রকম বাদ্যযন্ত্রসহকারে বৌদ্ধ বিহারে গমন করে। অতঃপর সুগন্ধযুক্ত জল ও চন্দন পানি দিয়ে বুদ্ধের মূর্তিগুলোকে পরিষ্কার কিংবা স্নান করিয়ে দেয়। একে রাখাইন ভাষায় 'ফারা

রিসো' বলে। এ উপলক্ষে বৌদ্ধ বিহারসমূহকে আলোকসজ্জাসহ বিহারের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার যার সাধ্যমতো সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিহারে দান সামগ্রী বিতরণ করে থাকে। অবস্থাপন্ন ও বিত্তশালীরা এ সময়ে দুষ্ট ও গরিবদেরকে সাহায্য করে থাকে। যাতে করে তারাও এসব মহতী অনুষ্ঠানে সসম্মানে অংশ নিতে পারে। যেন অহিংসা পরম ধর্ম– বুদ্ধের বাণীটা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় সবাইকে। এ সময়ে সবচেয়ে আনন্দের হলো আচটাক দিন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জন্মদিন পালনের রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সাধারণত ইংরেজি পঞ্জিকা অনুযায়ী জন্মদিন পালন করে থাকে। তাই জন্মদিনে জন্মতারিখ ঠিক থাকলেও জন্মবার ঠিক নাও থাকতে পারে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্মবারে জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ এখনো যথারীতি চালু রয়েছে। ইংরেজি পঞ্জিকা অনুযায়ী জন্মদিন কেউ কেউ পালন করলেও সবাই আচটাক দিনে অর্থাৎ ঐ বারে জন্মগ্রহণকারী রাখাইন নর-নারীর জন্মদিন হিসাবে পালন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ : 'মং'-এর জন্মবার বৃহস্পতি, আর আচটাক দিনও বৃহস্পতিবার। তাই বছরে আচটাক হবে 'মংক্র সহ বৃহস্পতিবারে যাদের জন্ম, তাদের। তারা সবাই দিবসটাকে জন্মদিন হিসাবে পালন করবে। বর্ষ পরিক্রমায় সবাইকে এ দিবস পালন করতে হয়।

এতে কেক কাটা আয়োজন না থাকলেও আয়োজনের কোনো কমতি নেই। বাড়িতে-বাড়িতে তখন হরেক রকমের মিষ্টান্ন খাবারাদি তৈরি করা হয়। বন্ধু-বান্ধবসহ ঘনিষ্ঠ সকলকে নিমন্ত্রণ করে এদিনে আপ্যায়ন করানো হয়। আর সবার ঘরে ঘরে মিষ্টান্ন খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বলতে গেলে সবাইকে এ বিশেষ দিনে সাধ্যমতো আপ্যায়ন করা সবারই সাধ থাকে। এ দিনে জন্মলাভকৃত সবাই ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী সর্বপ্রথম বিহার অধ্যক্ষ (ভিক্ষু/ভন্তে/ফুৎ গ্রি)-কে মিষ্টিমুখ করাতে হয়। আর সবাইকে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করতে হয়। বয়স্করা উপোস (ওতৌ) পালন করলেও তরুণ-তরুণীরা সাংগ্রেং আমেজে অনেকে তা পালন করতে পারে না। তবে যথারীতি বিহারে গমন করে বুদ্ধপূজা, পুষ্প পূজা, প্রদীপ পূজা ইত্যাদি করে থাকে।

মূলত আচটাকের পর দিন হলো রাখাইন সম্প্রদায়ের নববর্ষের সূচনা দিন। সাংগ্রেং উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য বিষয় হলো রাখাইন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের পানি খেলার উৎসব (রিংলং পোয়ে)। পানি খেলা উৎসব প্রধানত ৩ দিন হয়। কক্সবাজারের রাখাইন অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় এ উৎসব ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন তারিখে পালিত হতে দেখা যায়। এ উপলক্ষে প্রতিটি মহল্লায় বা পাড়ায় কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা স্ব স্ব বন্ধু-বান্ধবী, সহপাঠী ও সমমনাদের সাথে সমবেত হয়ে বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। তরুণীরা বিশেষ আকারে পেন্ডেল (মেং ডেং) তৈরী করে। নানা ধরনের সতেজ গাছগাছালি ও ফুল দ্বারা প্যান্ডেলটি সাজায়। প্যান্ডেলসমূহে লাল রঙের কৃষ্ণচূড়া বেশি দেখা যায় এবং নিজেরাও সজ্জিত হয়ে সবাই একই কালারে একই পোশাক পরে, যা দেখে তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ অন্য এলাকায় প্যান্ডেলের তরুণীরা ঈর্ষান্বিত হয় এবং পানি খেলার জন্য এখানে আগত বিভিন্ন তরুণের দলকে সহজে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এসব মেং ডেংতে পানি রাখার জন্য বড় বড় আকারে

পাত্র রাখা হয়। পানি রাখার জন্য কোনো কোনো অঞ্চলে নৌকা ব্যবহার করতেও দেখা যায়।

সাংগ্রেং উপলক্ষে বিশেষ সাংগ্রেংর গান (ছেং গ্যাই) রচনা করা হয় এবং প্রত্যেকেই তা গাইতে শোনা যায়। তবে দুঃখের বিষয় কক্সবাজারের রাখাইন শিল্পীদের মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্র পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এখানকার শিল্পীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাংগ্রেং গীত বের করতে পারে না। কক্সবাজারবাসীরা এখানকার শিল্পীদের সাংগ্রেংর গীত পেলে আরাকান থেকে প্রচারিত সাংগ্রেং গীতের জন্য আগ্রহ থাকত না বলে অনেকের অভিমত।

সাংগ্রেংতে জনপ্রিয় একটি গান নিম্নে তুলে ধরা হলো :

লেঃ লেঃ... লেঃ লেঃ
মংরো মংরো........ মংরো মংরো
পেং পাদাউশে পোয়াংরে লা,
সাংগ্রেং ক্যালোঃ মংরো প্যরে।
মেরীশে আহ্‌লা পাঃ
মেংডেৎ খেকা চা উৎলো ক্রোরে
সাংগ্রেং রি ঈরে ঈরে,
মেরীশে সা সারে।
রোঃ রা গো তিং ছিং কেত্ পা
চাইংলা গো ম্রেঃ নোঃ গেঃ পা।
রোং রা হিমা যাইং ক্যেঃ বারে,
চাইংলা হিমা লুম্যোঃ হেংরে।

অনুবাদ :

লেঃ লেঃ.... লেঃ লেঃ (আহ্বান ধ্বনি)
মংরো মংরো........ মংরো মংরো (ঐ)
রাঙা পুষ্প শোভিত এ মাসে,
আত্মহারা হই সাংগ্রেংস্বর আনন্দে
এ শুভ দিনে তুলনাহীন তুমি,
প্যান্ডেলে বসে স্বাগত জানাও
সাংগ্রেংর জল হিমশীতল,
সুন্দরী তুমি অপূর্ব।
কৃষ্টিকে লালন করো,
ঐতিহ্যকে ধরে রেখো।
কৃষ্টিতেই সভ্যতার পরিচয়,
ঐতিহ্যেই জাতির পরিচয়।

মেং ডেংসমূহে সাংগ্রেংর গীত বাজানো হয়। অনেক জায়গায় তরুণীদের সমবেত কণ্ঠে এ ধরনের গান গাইতেও শোনা যায়। আজকাল সাংগ্রেং গীতের পাশাপাশি বাংলা,

হিন্দি, ইংরেজি, বর্মি ইত্যাদি গান বাজাতে শোনা যায়। গাং প্রেয় উৎসবের সাংপ্রেং গীতই ভালো লাগে অনেকের কাছে। রুচি ও সময়ের বিবর্তনে রাখাইন তরুণ-তরুণীদের পোশাকে-চালচলনে পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করার মতো চোখে পড়ে আজ।

পুরোনো বছরের সমস্ত পাপ পংকিলতাকে পানিতে ধুয়ে মুছে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো আনন্দের বহিঃপ্রকাশই সাংপ্রেং উৎসব। সাংপ্রেং উপলক্ষে সবাই বাড়িঘর পরিষ্কার রাখে এবং নতুনভাবে সাজায়। তাই গেল বছরের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে আসছে বছরের সুখের জন্য আশা বান্ধে। আনন্দ লাভের সুযোগ ও উপায় হচ্ছে এ সাংপ্রেং উৎস। অনেকের কাছে নতুনভাবে বেঁচে থাকে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের তো একেবারে চাঁদের হাট। দেখা মাত্রই কোনো আড়ষ্টতা না রেখে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাবে। আর যারা এতদিন সামাজিক ও পারিবারিক বলয়ের কারণে নিজের প্রিয়জনকে কিছু বলতে চেয়েও বলার সুযোগ হয়নি তারা কিন্তু সাংপ্রেংতে সে কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি অনায়াসে পেয়ে যায়।

মহল্লায় বা পাড়ায় পাড়ায় কিশোর, তরুণ ও বয়স্কদের আয়োজিত বনভোজনের হৈ হুল্লা এবং আনন্দ প্রকাশের নানা ঢং মনকে আরো আনন্দিত করে তোলে। অনেকে আবার আনন্দের মাত্রা বাড়ানোর জন্য নেশা জাতীয় কিছু পানীয় পান করে পাশ্চাত্যের ব্রেকড্যান্স, ডিসকোর মাধ্যমে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা যে কারো পরিধেয় পরিধান ভিজে যেতে পারে। তারা অলি-গলিতে এলোপাতাড়িভাবে ঘুরে বেড়ায় পানি নিয়ে। এখনও ভিজে নাই এমন কাউকে ভেজাতে পারলে আনন্দবোধ করে তারা। এ ব্যাপারে কেউ আবার বাধা দিলে তারা দারুণ দুঃখ পায়। তাই ছোট-বড় সবার জন্য সাংপ্রেংর আনন্দ উন্মুক্ত।

মেং ডেংগুলিতে মেয়েরা সজ্জিত হয়ে বসে থাকে। ছেলেরা পরে বিভিন্ন ধরনের গান ও উল্লাসধ্বনি করতে করতে একটির পর একটি মেং ডেংতে যায়। তরুণের দল আসলে মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দলের মনের মানুষটি থাকলে ব্যস্ততা একটু বাড়ে বৈকি। পানি কার সাথে কে খেলবে এর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তরুণরা নিজেদের সমঝোতার মাধ্যমে তা ঠিক করে নেয় কে কার সাথে খেলবে। তবে এক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সুবিধা একটু বেশি। কেননা, কোনো ছেলে যে কোনো মেয়েকে পানি খেলা অংশ নেওয়ার জন্য প্রথম আমন্ত্রণ জানাতে পারে। কিন্তু কোনো মেয়ে চাইলেও কোনো ছেলেকে এ ধরনের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না বা জানায় না। কার্যত ছেলেদের আহ্বানেই মেয়েরা সম্মত হয় বলে প্রথমে ছেলেরা নিজ নিজ পছন্দমতো মেয়েকে পানি ছোড়ে। মেয়েরাও হাসিমুখে ছেলেদের আমন্ত্রণের জবাব দেয়। এভাবে কয়েক যুগলের পানি ছোড়াছোড়ি বা পানি খেলার দৃশ্য সকলের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে আর যারা অংশ নিচ্ছে তাদের তো কথা নেই। ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কথা এ সময়ে সেরে নেয়। পরস্পর অপরিচিত হলেও পরিচয়ের প্রথম পর্বটা চুকে যায়। এভাবে ১ম, ২য়, ৩য় দিনে পানি খেলা হয়। মোদ্দা কথা, এ উৎসবে সবারই পরিধেয় কাপড় ভেজা থাকা চাই। শেষদিনে সাংপ্রেং উৎসব অত্যন্ত আনন্দদায়ক অন্যদিকে

শেষদিন বলে মন খারাপের দিনও বটে। শেষদিনে ছেলেমেয়েদের পানি খেলা বিদায় ক্ষণে 'মেই তা রী' নামে (স্নেহের পানি) খুব কাছাকাছি পরস্পরকে আপাদমস্তক পানিতে ভিজিয়ে দেয় অত্যন্ত আন্তরিক ও স্নেহের সাথে। আইন-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি তরুণীকে প্যান্ডেলের অভিভাবকদের মধ্য থেকে ১ জনকে প্রদান করে শৃংখলা কমিটি গঠন করা হয়। কোনো আবদার, অনুরোধ, অভিযোগ থাকলে তারা মেং ডেং প্রধানের নিকট শরণাপন্ন হয়। এভাবে রামুসহ কক্সবাজারে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা রাখাইন নববর্ষ 'সাংগ্রেং' পালন করে থাকে প্রতি বছর।

নীতিবাক্য, উপদেশ, আদেশ, হাসি, খোঁলমো রা কথা ইত্যাদি সরাসরি ব্যক্ত না করে রাখাইনরা মাঝে মাঝে প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। আবার এদের যথাযথ বক্তব্যকে যেমন সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে তেমনি বাক্যকে বুদ্ধিদীপ্ত, তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। রাখাইন সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১। কো থামাং কো চাঃ প্রি কে
যাউ খামা ন কো ঝ্যং রে
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো (নিজের ভাত খেয়ে শ্বশুরের রাখাল হওয়া)

২। ল ফাঃ ক্রি ল কেং দারা ফ্রাই
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

৩। ছি য়াং ম্রাং য়াং আওয়া নাক্
জেনে শুনে জিদ ধরে কোনো কিছু করা

৪। ম্যাক্ না ফ্রি রা হাং ফেত্ না
বড় মাছের কাঁটাও ভালো

৫। আতং য়ংকে কাইং হং নাঃ রে
পুনঃ মূষিক ভবঃ (পাখনা ক্লান্ত হলে পুরাতন তালে ফিরে আসা)

৬। ঙাঃ মা ছিলো ম্যাইংহ্ চোয়েন রে
পছন্দের জিনিস না পাওয়াতে অপছন্দের জিনিস পাওয়া

৭। আ ঘু কেং তুঃ আ ঘু রি খ
কালনেমির লন্‌কাভোগ (কাজ আরম্ভ করার আগেই ফল পাওয়ার আশা)

৮। আঃ কি কে আবেত মা লা
সবল হলে দোষ থাকে না।

৯। আগ্রো মা নাইং ন র কাইং
নেতা না পারলে শিষ্য ধরো (শির না পারলে কান ধরো)

১০। আকে জেনা ক্যাং ফ্রাই
ঋশকরাতে ঝগড়া হয়

১১। লাক ছা ম্রাংগে লাকছেঃ রেহ্‌রে
নাপিত দেখলে নখ লম্বা হয়

অনুসৃত গ্রন্থ : মং বা অং– দি রাখাইন রিভিউ, ১ম সংখ্যা।

১২। রছাঃ ঞিংগেন খওয়েত চাঃ
দশের লাঠি একের বোঝা (গ্রামবাসীরা মিল থাকলে গরু জবাই করে খাওয়া যায়)

১৩। আসাই মা ঞিং লা পোওয়ে ছি
ভালোবাসা অসমানে অমাবস্যা মরে

১৪। রু কোয়েন ছং ওয়া অং চাঃ
পাগল সেজে সব কিছু আত্মসাৎ করা/খাওয়া

১৫। ক্রং কা ক্রিজেত্ ক্র ছি তেট
বিড়ালে খেলা ইঁদুরে মরার

১৬। ইংগা আছুই মংগা ক্রি
বেঙের আধুলী/বাড়ি তো নষ্ট উঠান হড়

১৭। গেছেং চাইংরা ক্যামি মালাই নাইং
সব বিপদে সাহায্য করতে অক্ষমতা

১৮। মা খি তা রাঃ আয়ু মাহ্
অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী

১৯। উই রীয়া কেং কু
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

২০। আলো ক্রি পে আরা নেঃ রে
বেশি চাওয়াতে কম পাওয়া

২১। ছেংকা ছেং ফ্যাক্ ছেং সী তাক্
সঙ্গে দোষে লোহা ভাসে

২২। প্রং গো ক্রে গে প্রোগো ম্রাং রে
উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায় (কাজের আরম্ভ দেখেই পরিণতি বুঝা যায়)

২৩। মেৎ কো আং থং লাং মা রা
মেৎ মা মায়াঃ নাঃ
অন্যের অপেক্ষায় নিরর্থক আশা (গুড়ে বালি)

২৪। ছেই মাছি খাং লি উ ফাউতে
বা, চা কাং কংপ্র ঙায়ং ফা আ
কথার মাঝে কথা বলা

২৫। কেং না ছাই গাং লিষ্টা তা ছন ছন
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা (এক কষ্টের উপর আরেক কষ্ট)

২৬। আ উইঃ নি কে তা থাক থাক
আ পাঃ নি কে তা খাক খাক
দূরে থাকলে টানটান

---

১. এই অংশটি রচনায় তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন মংবা। তিনি রামু থানা নির্বাহী অফিসের সার্টিফিকেট সহকারী।

কাছে থাকলে খটখট

২৭। পানেঃ ছি আখোয়েন পো ন রা ই য়ং রা ই লো
পছন্দের জিনিসের সাথে লেগে থাকা

২৮। নব্রিরা মাহ্‌ফ্রা ছো র য়! রন লো
না বুঝে শুনে পিছু নেওয়া

২৯। মাংখাঝা য়াউক্যাঃ কেংনাঃ ছাই পাং
মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত

৩০। ক্যাঃ ফা ই ফো ন ন তঝা য়ং
বাঘের নজর পড়া গরু বনের ধারে যায়।

৫. সাহিত্য

ক. মধ্যযুগের কবি নসরুল্লাহ খান

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রথম কবি নসরুল্লাহ খানের 'জঙ্গনামা' এবং 'মুসার সওয়াল' কাব্য দু'টির তথ্য প্রকাশ করেন ('বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ৫৩ ও ১১৩ সংখ্যক পুথি)। প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক হিসাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ অত্যন্ত নন্দিত পুরুষ। কিন্তু তিনি নসরুল্লাহ খানের সব ক'টি পুথির সন্ধান দিতে পারেননি। ড. মুহম্মদ এনামুল হক নসরুল্লাহ খানের চারটি গ্রন্থের কথা বলেছেন (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ১৭০-১৭৮)। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী গ্রন্থগুলো হলো (১) জঙ্গনামা, (২) মুসার সওয়াল, (৩) হেদায়েতুল ইসলাম এবং (৪) শরীয়তনামা। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে 'হেদায়েতুল ইসলাম' গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'মুসার সওয়াল' গ্রন্থের ৩ খানি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছে 'শরীয়তনামা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি– যার ক্রমিন নং ২৫৪। এ যাবৎ কবির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাব্য 'জঙ্গনামা' সংগৃহীত হয়নি। সাহিত্যবিশারদ এটি জনৈক লাল মিয়া চৌধুরীর বাড়িতে দেখেছিলেন [বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ড. আবদুল করিম মনে করেন, কবি নসরুল্লাহ খানের (নসরুল্লাহ খোন্দকার) ৩ খানি গ্রন্থ আবিস্কৃত হয়েছে– (১) জঙ্গনামা, (২) মুসার সওয়াল, (৩) শরীয়তনামা (পাণ্ডুলিপি চতুর্থ খণ্ড (১৩৮১) পৃঃ ১৫৫, সম্পাদক : আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁর মতে 'হেদায়েতুল ইসলাম গ্রন্থখানি 'শরীয়তনামা' গ্রন্থের ৪০ থেকে ৬১ পৃষ্ঠার একখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া নতুন কিছু নয়। খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির ১২(খ) পৃষ্ঠার শীর্ষে কেউ 'হেদায়েতুল ইসলাম' নাম লিখে দিয়েছেন, এই নামের হস্তাক্ষর এবং মূল পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর এক নয় (পাণ্ডু-লিপি চতুর্থ খণ্ড (১৩৮১), পৃ. ১৫৫, সম্পাদক আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।

কবির নামের শেষে ব্যবহৃত উপাধি নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। সাহিত্যবিশারদ কবির নাম লিখেছেন নসরুল্লাহ খান। তিনি 'জঙ্গনামা' কাব্যে এই নাম পাঠ করেন (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৮]। ড. মুহম্মদ এনামুল হক

সাহিত্যবিশারদের পাঠ গ্রহণ করে নসরুল্লাহ খাঁ নাম ব্যবহার করেছেন। অপর দিকে 'শরীয়তনামা' কাব্য অনুসরণে ড. আবদুল করিম কবির নাম নসরুল্লাহ খোন্দকার ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি এই যে, 'কবি খান উপাধিধারী হলে শরীয়তনামা গ্রন্থে একবারও খান উপাধি উল্লেখ না করার কারণ বুঝা যায় না। সাহিত্যবিশারদ শুধু জঙ্গনামা পুথিতেই খান উপাধি পাঠ করেছেন। তাই জঙ্গনামা সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং সাহিত্যবিশারদের পাঠ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। তাছাড় খান ও খোন্দকার দুটি ভিন্ন প্রকৃতির উপাধি। খান সাধারণত সামরিক উপাধি, খোন্দকার নিশ্চিতভাবে পণ্ডিত ও শিক্ষকদের উপাধি। সৈনিক বংশের লোক মসীজীবী হয়ে খোন্দকার উপাধি নেওয়া কিংবা মসীজীবীর বংশধরদের সৈনিক হয়ে খান উপাধি নেওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীয়তনামা গ্রন্থে একবারও খান উপাধি না পাওয়ায় আমরা কবিকে নসরুল্লাহ খোন্দকার নামেই অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করি (পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড (১৩৮১) পৃঃ ১৫৮, সম্পাদনা : আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।) জঙ্গনামা কাব্যে কবি কোথাও কবির পূর্বপুরুষদের নামের সঙ্গে খান আবার কোথাও খোন্দকার উপাধি ব্যবহার করেছেন। এ কাব্যের আত্মবিবরণী অংশে আছে, "ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত/মর্যাদার নামিঅন্ত /পিতামহ হামিদুল্লাহ খান/তানপুত্র কল্প তরু/বোরহানদ্দি জগগুরু/রূপান্তর ইছুক সমান।/মহীপাল রোসাঙ্গের/ধবল মাতঙ্গেশ্বর/নিজমুখে প্রসংশিলা যারে/তানপুত্র মহাবীর/অস্ত্রে শস্ত্রে রণে স্থির/ইব্রাহীম খান নাম ধরে/ তান পুত্র জ্ঞানবান/শ্রী সুজা ওদ্দিন খান/পূর্ণ বন্ত সঙ্গে তান বেলা/ অনেক গ্রামের পতি/যাকে কৃপা কাঁর অতি/নিজকন্যা সমর্পিয়া দিলা/তানপুত্র রূপবান/শ্রীযুক্ত বাবু খান/অবিরত ফকিরীতে মন/ত্যাজিয়া সংসার মায়া/প্রভুভাবে চিত্ত দিয়া/করিলেন্ত আগমে গমণ/আছিলেন পুত্র তান/শ্রী ইছহাক খান/শরিয়ত খাদেম প্রধান/তানপুত্র শীল ধর্ম/ছেয়দানী উদন্তে জন্ম/সরিফ মনছুর গুনবান/তানপুত্র অল্পকান/হীন নছরল্লা খান/পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি। 'কবি অন্যত্র লিখেছেন, 'কল্প তরু জগগুরু শা স্ত্রেএতে বিজ্ঞান/পিতামহ কাজী ইছাহাক গুণবান/তানপুত্র সরিফ মনছুর খোন্দকার' (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৮ এবং মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য পৃঃ ১৭৩ উদ্ধৃত)।

উদ্ধৃত অংশে উভয়বিধ উপাধি ছাড়াও কবির বংশ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কবির শরীয়তনামা কাব্যেও বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তবে দু'টি কাব্যের বংশ পরিচয় অংশে উল্লেখযোগ্য একটি দিক আছে। কবির পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ সৈনিক ছিলেন। আবার কেউ কেউ 'শরীয়তখাদেম প্রধান' ছিলেন। কেউ আবার সংসার বিরাগীও ছিলেন। কবির বংশগত উপাধি 'খান' 'খোন্দকার' দুই-ই আছে। তিনি যুদ্ধ বর্ণনার কাব্য লিখতে গিয়ে 'খান' উপাধি ব্যবহার করেছেন। আর ধর্ম বিষয়ে উপদেশমূলক কাব্য লিখতে গিয়ে নিজের নামের পাশে খোন্দকার উপাধি ব্যবহার করেছেন। শরীয়তনামা কাব্যের বংশ-পরিচয় অংশে ড. মুহম্মদ এনামুল হক যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তাতে কবির পূর্বপুরুষদের 'খান' উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ড. মুহম্মদ এনামুল হক যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তাতে কবির পূর্বপুরুষদের 'খান' উপাধি

ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ডা. আবদুল করিম ভিন্ন পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাতে কোথাও 'খান' উপাধি নেই। আমাদের কাছে এই পাঠটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয় (দ্রষ্টব্য, পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১, সম্পাদক : আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।

কবির জন্মস্থান এবং কাল নির্ণয় করা একটি কঠিন কাজ। সম্প্রতি প্রকাশিত কক্সবাজারের ইতিহাসে কবি জন্মস্থান রামু থানার ফতেখাঁরকুল গ্রামে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ভাষা ও সাহিত্য, অধ্যাপক শফিউল আলম, পৃঃ ১৮৯)। কিন্তু এই স্থান নির্ণয়ের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তবে স্থানীয় লোকদের একটি প্রচলিত বিশ্বাস, কবি নসরুল্লাহ রামুতেই জন্মগ্রহণ করেন। কবির জঙ্গনামা কাব্যে 'রাম্ভুদেশ নরপতি নামে ফতেখান' কথাটির উল্লেখ আছে। নরপতি ফতেখান কবির পিতাকে সম্মান দেখেছিয়েন। 'রাম্ভু' বর্তমান রামু। আকবরনামা, রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং দলিলদস্তাবেজে রামুকে 'রাম্ভু' বলা হয়ছে (এ হিস্ট্রি অব চিটাগাং, ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, পৃঃ ৬৩২)। মধ্যযুগের রামু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। সেবাস্টিয়ান ম্যানরিকের বর্ণনায় রামু সিটির কথা আছে (৫ জুলাই ১৬৩০)

কবির পূর্বপুরুষ হামিদ উদ্দিন কবির বর্ণনামতে গৌড় দেশের বাঙ্গালায় উজির ছিলেন। তাঁর পুত্র বোরহানুদ্দীন দৈবক্রমে দেশ ছেড়ে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে রোসাঙ্গে আসেন। তখন রোসাঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্য ছিল না তাই রোসাঙ্গরাজ তাকে লস্কর উজির নিযুক্ত করেন। সৈন্য বিভাগে তার পরবর্তী বংশধরেরা কাজ করেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। সুজা উদ্দিন খানকে রোসাঙ্গরাজ নিজকন্যা এবং সেই সঙ্গে অনেক গ্রাম দিয়েছিলেন। সুজা উদ্দিনের পুত্র বাবু খান সংসার ত্যাগী ফকির ছিলেন। সম্ভবত তিনি রোসাঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। তার পুত্র মনছুর 'খোন্দকার' উপাধি পেয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এরা পরবর্তীতে কোথায় বসবাস করেছেন এ সম্পর্কে কবি কোথাও কোনো তথ্যসূত্র দিয়ে যাননি। সম্ভবত কবির পিতা মনছুর খোন্দকার রামুসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে পেশাগত কারণে অবস্থান করেছেন। ড. আবদুল করিম নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত 'শরীয়তনামা' প্রবন্ধে বলেছেন, কবির বংশধররা এখনও চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার জলদী গ্রামে বাস করছেন। তাঁর মতে, ড. আহমদ শরীফ তাঁকে এই তথ্য প্রদান করেছেন। (পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ১৬৪)। কিন্তু তিনি তাঁর প্রবন্ধে যে বংশ-লতিকা ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে কবি নসরুল্লাহ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। তাই কবির প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয়ে আরো অনেক তথ্য ও গবেষণার প্রয়োজন।

কবি নসরুল্লাহ খানের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে ড. আবুদল করিম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি মুহম্মদ এনামুল হকের মতের বিরোধিতা করেছেন। ড. হক 'শরীয়তনামা' কাব্যের আত্ম-বিবরণী অংশের আলোকে বলেন, কবি ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, রোসাঙ্গ রাজ নৃপমুখ্যের রাজত্বকালে কবির ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ বোরহানুদ্দীন খান আরাকানে এসে লস্কর উজির নিযুক্ত হন। কে এই নৃপমুখ্য (ভিন্ন পাঠ : নৃপরঙ্ক)? এর জবাবে ড. হক বলেন, তিনি বর্মা ইতিহাসের নরমিখুন (Naramaikhla) এবং আরাকানি ইতিহাসের মেঙৎ (Mengtsan mwun) ব্যতীত আর কেউ নন। তাঁর সময় ১৪০৪ খ্রিঃ হতে ১৪৩৪

খ্রিঃ। এই সময় তিনি ব্রহ্ম সামন্তরাজ অনান্থিউ (Ananthiu)-র ভগ্নীকে জোর করে বিয়ে করায় ব্রহ্মরাজ তাকে পরাজিত করেন (১৪০৪)। তিনি গৌড়ে পালিয়ে যান এবং নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ মুসলিম সৈন্যের সাহায্যে নরমিখনকে স্বীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৪৩০ খ্রিঃ)। চার পুরুষে একশত বৎসর হিসাবে ড. হক লস্কর উজির বোরহানুদ্দীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষ নসরুল্লাহ খানকে ১৭৫ বৎসরের পরবর্তী অর্থাৎ ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের লোক বলেছেন (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ড. আবদুল করিম 'নৃপমুখ্য'কে নরমিখনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন না। তাই তাঁর বিবেচনায় ড. হকের যুক্তিটি 'নৃপমুখ্য'-এর অভিন্নতার ওপর নির্ভরশীল বলে ড. হকের মতে কবির নসরুল্লাহ খান ১৬০৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন– এ মত গ্রহণযোগ্য নয় [পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ১৬৮]

'জঙ্গনামা' কাব্যের আত্মবিবরণী অংশে 'রাম্ভু'র নরপতি ফতেহ খান এবং রোসাঙ্গরাজের উল্লেখ করে ড. হক কবি নসরুল্লাহ খানের সময় সম্পর্কে আরেকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে পর্তুগিজ নৌবহরের কাপ্তান ছিলেন ফৎহ (ফতেহ) খান। তিনি ১৬০০ হতে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে পর্তুগিজ আড্ডা সন্দ্বীপ অধিকার করেন এবং পর্তুগিজদের হত্যা করেন। তিনি অবশ্য পরে (১৬০৯ খ্রিঃ) পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালিসের সঙ্গে এক নৌযুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হন। ড. হকের মতে এই সময়ে আরাকান রাজবংশীয় 'অন্নপুরুম' গৃহ বিবাদের ফলে সন্দ্বীপের শরণাপন্ন হন। এই অন্নপুরম'ই দিল্লী গিয়ে থাকবেন। এই বিবেচনায় ড. হক মনে করেন, কবির পিতা ১৬০০ হতে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কবিও তখন প্রৌঢ় বয়স্ক ছিলেন। তিনি ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৬০ কি ৬৫ বৎসর বেঁচে ছিলেন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে হিসাবে কবির আবির্ভাব কালকে ১৫৬০ হতে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ১৭৪)

ড. আবদুল করিম এ মতেরও বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, ড. হক রামু দেশের নরপতি ফতে খানকে পর্তুগিজ নৌবহরের কাপ্তান ফতে খানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার কোনো যুক্তি দেননি। তাঁর মতে পর্তুগিজ বিবরণে এক ফতে খানের কথা উল্লেখ থাকলেও তিনি রামু দেশের নরপতি হন কি করে? এছাড়া একজন নরপতি হয়েও তিনি পর্তুগিজদের অধীনে চাকরি করতে গেলেন কেন? রামু কি কখনো স্বাধীন ছিল যে রামু দেশের নরপতি থাকবে? এসব প্রশ্নের উত্তর ড. হকের আলোচনায় পাওয়া যায় না। ড. করিম রোসাঙ্গরাজ বলে কথিত 'অন্নপুরম'কে ম্যানরিকের বিবরণ অনুযায়ী চট্টগ্রামের গভর্নর বলতে চান এবং সে হিসাবে তার দিল্লীশ্বরের সাহায্যে স্বরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না বলে মনে করেন। তাঁর বিবেচনায় ড. হকের এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

ড. করিম কবির কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তনামা কাব্যে উল্লিখিত 'দৈবগতি' শব্দটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। কবির উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ বোরহ-

ানুদ্দীন 'দৈবগতি' স্বদেশ গৌড় দেশের বাঙ্গালা ত্যাগ করে রোসাঙ্গ গমন করেন। এই 'দৈবগতি' দ্বারা ড. করিম প্রথমত মহামারীর কথা বলেছেন। গৌড়ে মহামারী সংঘটিত হয়েছিল। গৌড়ে মহামারী সংঘটিত হয়েছিল ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে। সে হিসেবে কবির সাত পুরুষের জন্য ১৭৫ বৎসর যোগ করলে কবির কাল দাঁড়ায় (১৫৭৫+১৭৫) ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু মহামারী হয়েছিল গৌড়ে, বাঙ্গালায় নয়। তাই 'দৈবগতি' হিসাবে মহামারীকে বুঝানো হয় নাই। ড. করিমের বিবেচনায় হোসেন শাহী বংশের পতনের (১৫৩৮ খ্রিঃ) ফলে বাংলাদেশ শের শাহ্ শুরের হস্তগত হয়। তখন চট্টগ্রামস্থ হোসেন শাহী অফিসারদের দুর্দিন উপস্থিত হয়, যাকে 'দৈবগতি' বলে চিহ্নিত করা যায়। দৈবগতি দ্বারা হোসেন শাহী বংশের পতন ধরে নিলে কবির সময় দাঁড়ায় (১৫৩৮+১৭৫) ১৭১৩ খ্রিঃ বা তার নিকটবর্তী। 'দৈবগতির' ওপর নির্ভর করে কবির কাল নির্ণয় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নয় একথা ড. করিমই স্বীকার করেছেন। ড. করিম তাও যুক্তি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, আরাকান রাজ নরমিখন কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বর্ণিত রোসাঙ্গ রাজের সঙ্গে অভিন্ন হলে কবির ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ হামিদুদ্দীনের ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে জীবিত থাকার কথা এবং হামিদুদ্দীনের পুত্র বোরহানুদ্দীন ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে বা কাছাকাছি সময়ে গৌড় ছেড়ে রোসাঙ্গে যাবার কথা। কিন্তু উল্লেখিত সময়ে গৌড়ে রাজনৈতিক 'দৈবগতি' ছিল না এবং বাঙ্গালাও গৌড়ের অধীন ছিল না।

ড. করিম কবির কাল সম্পর্কে 'শরীয়তনামা' কাব্যগ্রন্থ থেকেই কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়েছেন। 'শরীয়তনামা' কাব্যে দোহাজারীর উল্লেখ আছে, 'একদিন দোহাজারী শহরেতে রঙ্গে/বসিছিলুম কতজন অশ্বরার সঙ্গে।' দোহাজারী নামের উৎপত্তির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব রয়েছে। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম অধিকার করেন। আরাকানরাজ চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত হবার পর মীর মর্তুজার নেতৃত্বে মোগলরা রামু জয় করে। মগেরা দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রায়ই হানা দিত বলে শঙ্খ নদীর তীরে আধু খান হাজারী এবং লক্ষ্মণ সিংহ হাজারীকে নামমাত্র পাহারার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। এই দুই হাজারীর নামানুসারেই দোহাজারীর নামকরণ করা হয়। এই দিক থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় কবি শরীয়তনামা কাব্যটি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরে রচনা করেছেন (পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড পৃ. ১৮০)। ড. করিম অপর একটি সূত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত শরীয়তনামা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের রচনাকাল পাওয়া গেছে। রচনাকাল সূচক শ্লোকগুলো এইরূপ: এবে কহি তুমি সবে মুন মন দিয়া/পুস্তক আদায় সন লওত গুনিয়া/চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগণের বাস/সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস (পাতা ৮৫ পৃঃ খ)। তাঁর বিশ্লেষণে চন্দ্র=১, ঋতু=৬, সিন্ধু=৭ এবং গগন=১, অর্থাৎ গ্রন্থ রচনার সন ১৬৭১। ১৬৭১ সন তাঁর মতে শকাব্দ। ইংরেজি সনে যা দাঁড়ায় ১৬৭১+৭৮=১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ (পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ১৮১)। কবি গ্রন্থটি রচনার শেষ তারিখ উল্লেখ করেছেন এভাবে : 'চতুর্বিংশ অগ্রাণের জোহর সময়/বিংশগ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয়/আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার/সেদিন হইল দেখা সমাপ্ত মুসার' (৮৬ পৃঃ)। ড. করিম মনে করেন, ঈদের দিন রোজ সোমবার ২৪শে অগ্রহায়ণ ১লা শাওয়াল। রমজানের ২০

তারিখ লিপিকর প্রমাদ। তিনি অবশ্য সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস– এই শ্লোকটির কোনো ব্যাখা দেননি। পুস্তক রচনার সন তারিখ সম্পর্কে কবির রহস্যময় ভণিতা আরো ব্যাখ্যা ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। মুসলমানরা সাত আসমানে বিশ্বাস করে। এ হিসেবে গ্রন্থ রচনার কাল আরো ৬ বৎসর পিছিয়ে যায়।

কবি নসরুলাহ খান তাঁর জঙ্গনামা কাব্যে রাম্ভু দেশ নরপতি নামে ফতেকান শ্লোকের মাধ্যম যে ফতে খানের উল্লেখ করেছেন তার কাল নির্ণয় করলে কবির কাল নির্ণয় অনেকটা সহজ হয়। ড. হক এই ফতেখানকে সন্দ্বীপের অধিপতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য মতে, প্রথমে তিনি পর্তুগিজ নৌবহরে কাপ্তান ছিলেন। ১৬০০ হতে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি বিদ্রোহী হয়ে পর্তুগিজ আখড়া সন্দ্বীপ অধিকার করেন (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য পৃঃ ১৭৪)। ড. করিম এমত স্বীকার করেন না। তিনি দ্বিমত পোষণ করে বলেন যে, এক ফতেখাঁন পর্তুগিজ নৌবহরে কাপ্তান ছিলেন– এই পর্তুগীজ বিবরণেই আছে। কিন্তু সেই ফতে খান রামু দেশের নরপতি হন কি করে (পাণ্ডুলিপি-পৃ. ১৬৯) পর্তুগিজ নৌবহরের কাপ্তান রামু দেশের নরপতি নন। এটা সহজেই মেনে নেওয়া যায়। তিনি ফতেখানকে রামু দেশের নরপতি বা রাজা বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে রামু কোনো সময় স্বাধীন ছিল বলে জানা যায় না। নরপতি শব্দটি প্রয়োগ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট বলে মনে হয়। মধ্যযুগের কবিরা গ্রাম্য মাতবরকেও 'নৃপতি' বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, কবির বর্ণিত ফতে খান একজন জমিদার মাত্র ছিলেন, তাই ইতিহাসে তার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না (পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১৭৮)

শাহ সুজা আরাকানে পলায়নকালে তার সঙ্গীদের মধ্যে এক ফতে খাঁর নাম জানা যায়। তিনি রামুতে থেকে গিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয় (কক্সবাজারের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫৩)। তিনি কথিত নরপতি কি-না তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তার সময়ের দিক বিবেচনা করে কবির আবির্ভাবকালের একটি দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। কবির পিতাকে ফতে খান সম্মান দেখিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকের শেষ পদে এটি হয়েছিল বলে সহজে অনুমান করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শুরুতেও এক ফতে খাঁর পরিচয় জানা যায়। অশোক কুমার দেওয়ান তাকে চাকমা রাজা বলে দাবি করেছেন। তার মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাতে খোদিত আছে 'ফতেখাঁ ১১৩০'। ড. আলমগীর সিরাজ উদ্দিন ফতেখাঁর রাজত্বকাল ১৭২৬ খ্রিঃ বলে মনে করেন (অশোক কুমার দেওয়ান-চাকমা জাতির ইতিহাস অষ্টাদশ শতক উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গবেষণা পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৮২)। রামুর চাকমারকুলে চাকমা রাজা ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। শেরমস্ত খানকেও চাকমা নরপতিবলা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শাহ সুজার আরাকান গমনের সময়ের (১৬৬০ খ্রিঃ) সঙ্গে এই সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়। আরাকানী মগদের পরাজিত করে ফতে খাঁর ক্ষমতা দখলে আরো দু'এক দশক সময় লাগতে পারে। শায়েস্তা খানের বড় ছেলে প্রধান সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খানের নির্দেশ সেনাপতি মীর মর্তুজা রামু দুর্গ অবরোধ করে আরাকান রাজের ভাই রামু দুর্গের অধিনায়ক রাউরীকে পরাজিত করেন (১৬৬৬ খ্রিঃ)। কিন্তু বর্ষাকালেই তাদেরকে অবরোধ তুলে নিতে হয়। এর পরবর্তী সময় সম্ভবত ফতে খাঁ এখানকার অধিপতি হন। রামুতে কবি

নসরুল্লাহ খানের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য না পাওয়া গেলেও রামুর তখনকার শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব তার এখানে বসবাসের জন্য আনুকূল্য সৃষ্টি করেছিল বলে সহজে ধরে নেওয়া যায়। প্রথম দিককার মতো তাঁর পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করলে নসরুল্লাহ খানের হয়তো কাব্য রচনার প্রবৃত্তি হতো না– যুদ্ধবিদ্যাই রপ্ত করতে হতো। এছাড়া তার অবস্থান হতো রোসাঙ্গে। পিতার 'খোন্দকার বৃত্তি'ই সম্ভবত রামু অবস্থানের পথ সুগম করেছে এবং সেই সঙ্গে কাব্যচর্চার দ্বারা উন্মোচন করেছে। আর এজন্যেই কবি নসরুল্লাহ খানের প্রসঙ্গে ফতেখাঁ রাম্ভু (রামু) এই দুইটি নামকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

খ. মধ্যযুগের অন্যান্য কবি

রামুতে কবি নসরুল্লাহ খন্দকারের পরবর্তী সময় মধ্যযুগে আরো কয়েকজন কবির র্বর্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে শেখ মনসুর অন্যতম। তিনি তাঁর আত্মবিবরণীতে বলেছেন, 'রোসাঙ্গে আছিল আসি রাম্ভু হৈলবাদ।' রোসাঙ্গ রাজাদের রাজসভায় অনেক বাঙালি কবি আনুকূল্য লাভ করেছিলেন– একথা আমরা সবাই জানি। রাজনৈতিক কারণে অনেক সভাসদও রোসাঙ্গ ছেড়ে ছিলেন। কবির পিতার নাম ছিল কাজী ঈশা খাঁ ও পীরের নাম ছিল শাহ উদ্দিন। কবি নিজেকে পীর বংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন। তার লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'শিরনামা'। এটি ১৬০৫ মঘীসনে অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত।

কবি তমিজী তাঁর 'লালমতী তাজল মুলুক' পুঁথিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আত্মপরিচয়ের এক অংশে লিখেছেন–

> ঠাকুর আলী হোছনধীর আরতি করিয়া স্থির
> রামু গ্রামে বৈসে মহাপাত্র॥
> তাহান আরতি শুনি আপনার মনে গুনি
> হীনমতি তমিজি ভনএ॥

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কবি তমিজীকে অষ্টাদশ শতকের কবি বললেও ড. আহমদ শরীফ মনে করেন, তাঁর লেখা কাব্যটি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ উনিশ শতকে রচিত।

উনিশ এবং বিশ শতকের শুরুতে রামুতে আরো দু'জন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এদের একজন আমির মোহাম্মদ সিকদার এবং অপরজন মোহাম্মদ মজহেরুল হক চৌধুরী। আমিন মোহাম্মদ সিকদার আদর্শ হেজাজ ভ্রমণ নামক একটি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। মোহাম্মদ মজহেরুল হক চৌধুরী আরবি-ফারসি এবং বাংলা ভাষায় কবিতা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

গ. লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের অমিয় উপাদান সারাদেশের মতোই রামুর সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁ ধাঁ, গীত প্রভৃতি লোকমানসের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাকে ছন্দে-কবিতায় ধারণ করে আছে। এর মধ্যে সামাজিক ইতিহাস আছে, সামাজিক আচরণ

আছে। তাই এগুলোর সামাজিক মূল্য অনন্য সাধারণ। রামুতে প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন এবং অন্যান্য লোকসাহিত্যের কিছু নমুনা উপস্থাপনা করা গেল :

প্রবাদ

১. যার বরযে[১] কুঁইরয়ে[২] খাইয়ে ঢেই দেইলে ডরায়।
২. লাফে[৩] লোয়া[৪] বয় অলাফে[৫] ওলাও[৬]ন বয়।
৩. মূর্খ বৈদ্য জমর[৭] ভাই।
৪. গফে সফে মরত[৮], কানি সিংহে বলত[৯]।
৫. ভালা মানষ্যর জুতা বইন্যম, অমানষ্যের পহরীও ন বইষ্যম।
৬. ছেপ[১০] ছিড়িলে গায়ত পড়ে, কুইড়ল[১১] মাইরল্যে পায়ত পড়ে।

ডাকের কথা/প্রবচন

১. গাছ চিনে বাহলে[১২], মানুষ চিনে আহলে[১৩]।
২. বায়াল[১৪] বুড়া ডাকত সার, ময়লা[১৫] বুড়া হিররে ধার।
৩. ভাত ভালা উদা[১৬] খাইও, পথবালা বেহা[১৭] যাইও।
৪. হতুরে[১৮] চতুরে করে, বধে[১৯] জানে[২০] মারে।
৫. বাইন্যার টুক্কুর টাক্কুর কামাইজ্জার এক বারি।
৬. ধরি মাছ ন ছুই পানি।
৭. হক কথায় টগ বেজার, গরম ভাতে বিলাই বেজার।
৮. দাসরে তাবা[২১] মইশরে নাপা চইরে গিল বউরে কিল।
৯. চেইক্যার লত ন পাইলে মাছ হারাম।
১০. হাড়র লাতি, গাড়র কিল, যার কোয়ালে[২২] যে চিতিল।
১১. জাতে জাত টানে কেয়ারা[২৩] গাত টানে।
১২. তুই দিয়ারে মুই দিয়া ন দিয়ারে কি দিয়া।
১৩. তেইল্যা মাথাত তেল, আতেইল্যা মাতা পুড়ি গেল।
১৪. অতি কাম আর[২৪] ভাত নাই, অতি সুন্দরীর নেক নাই।
১৫. খাল কুইল্যা বাড়ী মুড়া কুইল্যা গাই
    হিন্দুর দাড়ি, পথের কুইল্যা নারী।
    এই চাইর জাতের বিশ্বাস নাই।
১৬. ঘর নষ্ট বেনার ছাই, ওরা নষ্ট ছেড়াইল্যা গাই,
    ভিটা নষ্ট অরল, মুখ নষ্ট বরল।
১৭. গাডার[২৫] আগাত বড়ই গাছ নরুইয়ম,
    পেয়াদার লই দুস্তগিরি ন গইজ্জম।
১৮. নাঠা জমি আগে ফাড়ে
    নাটা মানুষ আগে মাতে

১. স্বামী, ২. কুমির, ৩. লাভে, ৪. রৌহা, ৫. অলাভে, ৬. শোলা, ৭. যমের, ৮. মরদ, ৯. বলদ, ১০. থুথু, ১১. কুড়াল, ১২. বাকলে, ১৩. আক্কলে, ১৪. বাচাল, ১৫. ভিজা, ১৭. বাঁকা, ১৮. শত্রু, ১৯. বন্ধু, ২০. জীবনে, ২১. থাপ্পড়, ২২. কপালে, ২৩. কাঁকড়, ২৪, কামলার, ২৫. পথ,

১৯. ধুইট্যা মরিচ কষ্ট কইট্যা বেশি। গোযা কচু বয় বেশি।
আপোয়াদ্যা[২৬] মানষ্যের কতা বেশি।

২০. মা ছা, ঝি ছা, বাপ ছা, পুত ছা।

২১. উজু আওলে[২৭] ঘি ন উডে
আঁজে আই মাঝে লুডে।

২২. তেলত নদি মছ মইছ্যা ঘল
রূপ চাইয়া কাইডা ফল।

প্রবাদ প্রবচনের বাইরেও লোকসাহিত্যের অনেক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; খনার বচন, পানি মাগনের ছড়া, গরু দাগনের ছড়া, খেলাধুলার ছড়া প্রভৃতির মধ্যে। এছাড়া আছে বিভিন্ন মন্ত্র এবং গুপ্তধন সন্ধানের ছক-ছিকলি।

খনার বচন : পূরের ধনু-এ ধান
পচিমের ধনু-এ বান।

পানি মাগনের ছড়া : গিরছ ভাইরে গিরছ ভাই
দুয়ার খোল মুখখানা চাই।
ভিক্ষা দেঅ চলিয়া যাই।
পানি দেঅ ভিজিয়া যাই।
মারে মা মেঘ রানী,
ঠেং ধুই ফেলা পানি।
কেলা তলে গলা পানি,
কচু তলে হাঁটু পানি।
কুলার আগাত বেতর বান
ঝর ঝরাইয়া পানি আন।

গরু দাগানোর ছড়া : তোরে দাগাইলাম জট করি
তোর রোগটি যাইব ছট করি।
তোর পেডে করে খলখল।
তুই খাবি গঙ্গার জল।
পুড়ি দিলাম তোর দাঁতের মাথা
রৈব না আর দাঁতের ব্যথা
দিলাম তোর লেজ পুড়ি
রোগ যাইব মুল্লুক ছাড়ি।

খেলাধুলার ছড়া :

১. ঘাডুঘুডু লক্ষণ
তোরে মাইত্যে কতক্ষণ (ঘাডুঘুডু খেলা)।

---

২৬. অস্বাদ, ২৭. সোজা আঙুল।

২. ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁওলা
বুড়ীর বাড়ীতে পিঁওলা
পিঁওলা খাইতাম গেলাম রে
কেডা ফুডি মৈলামরে (ঝিওলা খেলা)।

৩. টুবি
একডুবে ছুবি (টুবি খেলা)

৪. টুনি ভাইয়র টুনি
হরবা গাছের বুনি।
কাত থে আছে
কাত থে নাই
টিডিং টিডিং মানিক ছোড়
এই বেটা বড় চোর (টুনি খেলা)।

৫. অশুয়া শুয়া
তোর পোন্দ কা মেরা
ভাতে মরা।
ভাত কনে ন দেয়
বউয়ে ন দে।
বউর নাম কি?
আঁচিলা
ঢেঁই কলত বাজিলা (ঢেঁকি খেলা)।

এছাড়া পুরাতন সমাজে ব্যাপকভাবে পুঁথি পাঠ ও কিস্তা বলার প্রচলন ছিল।*

* লোকসাহিত্যের উপাদানগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন জনাব আমির হোসাইন হেলালী এবং জনাব তপন চক্রবর্তী। এরা রামুর অধিবাসী এবং পেশায় সাংবাদিক।

পরিশিষ্ট ক

Francis Buchanan in South-East Bengal

Ramu 7th April, 1798.

Before Sun rise I set out for Ramoo. After passing a few low sandy hills covered with trees, and situated on the north side of the Burma Camp. I come to a district clear of woo(ds) but covered with long Grass. and named Rungka pallung. North from thence is a wood of some extent, the soil of which is exactly the same with that of the cleared lands. Having passed this wood, I came to another district clear from Trees, but covered with long grass, and named Hilludea pallung. Here some wild buffalos made their appearance, and occasioned such an alarm among my people, that I was in some danger of their running away, and leaving me to walk to Ramoo. There was however little danger to be apprehended, as the buffalos were in a herd, and were running along the skirts of an opposite wood evidently alarmed at our appearance. Solitary buffalos however, especially Males, or females with young Calves, are certainly very dangerous, Passing through some more sandy hills, I came to another district like the not so sandy, as those before mentioned : but in may places the soil resembles that in the jooms of Mascally. Among these Hills I passed the principal branch of the Rajoo, which comes from the East, and is fine clear little stream. Beyond this the hills became more Sandy, and on passing them, I came to another deserted pallung named Deelia, which by a few woody Hills is separated from Sunna P. West from this is Dua P. Passing on through more sandy Hills. I crossed Jumkua-cally and Cheem-cherra, two small streams, that after running through Dua P. fall into the Rajoo. I now for a considerable way passed through hills and woods, till I came to Coirmoora Cherra, a small stream falling into the Bakcally or Ramoo river, a little below the Cutchery From this we entered the plain of Ramoo, after passing through some narrow sandy Vallies, surrounded by Hills, On which grows a fine Timber Tree named Coir (a mimosa which I have called Robusta). At the cutcherry I crossed the River Ramoo, and took up my quarters in the remains of Bungalo built by on of the officers of Colonel Erskines detachment. The River here is deeper than the Mamoree at Chuckerya; but it is neither so rapid, nor so clear. The bottom is mud, and the tide is said to to up farther to a considerable distance.

In the afternoon I received a Visit from Umpry Palong, Chief of a small tribe of the nation by the Bengalese called Joomea Mugs. He says that the proper name of his Tribe is Kiaung-sa, or the Sons of the Rivulet, as inhabiting the

banks of Pang-wa Kiaung, as all the nations of the Burm(a) race call the Ramoo River. The native language of the Kiaung-sa is the same with the dialect of Arakan, and their writing differs very little from that of the Burmas. He says, that he has Poun-gres, or priests, who are men of learning, and have many Books and that like the Rakain he worship(s) Ma-ha Moony). His tribe consists of six jooms, or moveable Villages.

1. Umpry Palong, governed by the Chief himself. He is commonly called by this name, but is only his title, or the name of his Estate, what his real name is I did learn.
2. Pow-mang A-tsein.
3. tuang-Pouk.
4. Taj-mung Ung-yee.
5. Laung-daung-sa.
6. A-ra-wo-sa.

These five last Villages are each governed by Rua-sa, tributary to Umpry palong. He again pays to the Company a Tribute of Cotton, of which he sends a great quantity into the province of Chittagong, from whence it is exported chiefly to the manufactoring districts near Luckipour. He says that in going up the Mroo-theik-Kiaung, or Eastern branch of the Naaf, one comes to a hill which stops all farther navigation towards the (North) and is called Sa-lu-daung. North from there is Pow-tsein one of Umpry Pallong's Villages, which stands on a branch of the Pang-wa Kiaung, that goes off to the right. East from Pow-mang A-tsein are the Sak subject to the King of Aree, as the Rakain call Ava. Some of these Sak however are subject to the Umpry Palong, and live in his Villages. Beyond the Sak live Rakain, for so he writes the word, Chief in his appearance was a poor man with normel few trifling Golden Ornaments. He had two ill looking Bengalese attendants, who took every opportunity of restraining his inclination to satisfy my curiosity.

A Rakain of some education informed me, that the Mroo-seit branch of the Naaf river is not so considerable, as that ending at Oo-kia. It is to be observed, that Mroo-seit is the proper orthography : but when the-word is followed by Kiaung, or Rivulet, the pronunciation requires the-final, t. to be changed into K. From what this man says, it would appear, that the religion of Arakan differs a good deal from that of the orthodox Burma. He says that the great copper Image, carried from'Arakan to sent the principal object of worship among the Rakain. In Geographical acuteness, as indeed in almost every other respect, I find the Rakaintives, both Hindoos and Mussulmans; and as they are subjected to these people, do not escape without severe oppression; although by the influence of the British Government such butchery cannot be committed on them, as was done, while they remained in the

Burma Dominions; The only means of preventing these pooression would be to give them officers of their own, entirely independent of the Bengalese, and if possible a sepawell adapted for this purpose: but a considerable Military force station. Indeed both Rakain and Benaglese are persuaded, that in the late dispute with the Burmas (1794) the refugees were given up by our-Government from fear. I have therefore great doubts, if any permanent. Establishment could be made to the Southward, without previously humbling the Burmas. Perhaps therefore it would be better to give the Rakain an establishment in the Sunderbunds.

In the evening I walked out through the plain of Ram(oo,) going West along the bank of a narrow Salt water canal named Pateela. At its Eastern end it communicates with the Bak-cally : but it receives the tide from the Cruz-cool river. Its water is very salt, while that of the Bak-cally is quite fresh. It is navigable for small Boats, and serves to open an inland communication between Ramoo and much of the Country to the northward From east to west the plain of Ramoo mayectend about five or six Miles but from North to South not quite so much. The low Hills, which surround it, approach very near at the East and west ends; but recede in the middle, leaving a beautiful ovalplain. The ground is so high above the River, that in most places the water is not in sufficient quantity to enable the farmer to have annually two-Crops of Rice : but the soil is a very productive mixture of clay and sand. Bak-cally makes great ravages in this light soil, and frequently changes its Channel, although it be far below the level of the plain. The country is perfectly clear, and tolerably well peopled, although– many families are said to have fled on the approach of the Burmas. It is not however so well cultivated, as many other parts of the province.

পরিশিষ্ট খ

ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স-এর বার্মা মিশন (১৭৯৬)

ক্যাপ্টেন সাইম্‌স মিশনের সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং বার্মা সরকারের সাথে কোম্পানির সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে নিশ্চিত করার জন্যই ১৭৯৬ সালে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের নেতৃত্বে বার্মায় কোম্পানির পরবর্তী মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে বার্মায় ক্যাপ্টেন কক্সের নিযোগ ছিল কোম্পানির একজন রেসিডেন্টের পদে, রাষ্ট্রদূতের পদে নয়। এই মিশনের উদ্দেশ্য এবং রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ক্যাপ্টেন কক্সকে বিভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়। মিশনটির উদ্দেশ্য ছিল মূলত তিনটি। প্রথমত, বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি বিধান করা। দ্বিতীয়ত, বার্মায় বাণিজ্যরত ব্রিটিশ নাগরিকদের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সবশেষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বার্মায় ফরাসি প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা। ১৭৯৪-৯৫ সালে ইংলন্ডে স্পেন ও হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফরাসিদের বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ চলাকালীন বিপক্ষীয় রণপোত বা বাণিজ্য জাহাজের বার্মা হতে রসদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্যাদি বর্মী বন্দরে খালাস করার প্রয়াসকে বাধাদানও ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বার্মা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স কর্তৃক সংকলিত বিবরণের অবশিষ্টাংশ প্রণয়নের দায়িত্বও ক্যাপ্টেন কক্সকে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে বার্মার অভ্যন্তরীণ শাসন, শিল্প-কলা, বাণিজ্য, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিষয়গুলো অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কলিকাতায় একজন বর্মী রাষ্ট্রদূত প্রেরণের জন্য বর্মীরাজকে উৎসাহী করে তোলার নির্দেশও ক্যাপ্টেন কক্সকে দেয়া হয়। বাণিজ্য প্রসঙ্গে রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে তাকে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়।

(১) বার্মায় ব্রিটিশ বণিকদের অভিযোগের প্রতিবিধান ও বর্মি বন্দরসমূহে কোম্পানির বণিকদের ওপর অত্যাচার ইত্যাদি সম্পর্কে রেসিডেন্ট কক্সের ক্ষমতা যথাসম্ভব সীমিত থাকবে।

(২) রেংগুনের সরকারি কর্মচারীগণ ব্রিটিশ বণিকদের অভিযোগের প্রতিবিধানে উদ্যোগী হলে কোম্পানির রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় বলে কোম্পানি মনে করে।

(৩) বার্মায় যে কোনো ব্যাপারে কোম্পানির রেসিডেন্ট ও বণিকদের সহিষ্ণু থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

বার্মায় বাণিজ্যরত ব্রিটিশ নাগরিকদের অভিভাবক ও পরিদর্শক হিসেবে রেসিডেন্টের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বার্মার সাথে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ ও ক্যাপ্টেনদের জন্য একটি রেজিস্ট্রার

সংরক্ষণ এবং ইংরেজ ব্যতীত বার্মায় অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের এফিডেভিট গ্রহণ। এই সাথে ভারতের বন্দরে বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক বর্মি বাণিজ্য জাহাজগুলোকে অনুমতিসহ উৎসাহ প্রদানের দায়িত্বও ক্যাপ্টেন কক্সের ওপর অর্পণ করা হয়। মিশনটির উদ্দেশ্য সাধনে এবং রেসিডেন্ট হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালনে কোম্পানি ক্যাপ্টেন কক্সের নিপুণতা, শিষ্টাচার এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন সাইমসের নিকট প্রেরিত বর্মিরাজের পত্রে কোম্পানির প্রতিনিধির যে ক্ষমতা ও পদমর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব কোম্পানি ক্যাপ্টেন কক্সের ওপর অর্পণ করে।

একজন দোভাষী, কয়েকজন কেরানিও ভৃত্য, একজন হাবিলদার ও নায়েকসহ ১২ জন সিপাহির একটি ক্ষুদ্র দেহরক্ষী দল নিয়ে ক্যাপ্টেন সিম্পসন পরিচালিত কোম্পানির জাহাজ সোয়ালরের' মাধ্যমে ক্যাপ্টেন কক্স ১৭৯৬ সালে ১০ অক্টোবর রেংগুন পৌঁছান। রেংগুন বন্দরে তাঁকে একজন রেসিডেন্টের মর্যাদা দিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়নি। রেংগুনবাসীরা তাঁকে একজন সাধারণ বণিক হিসেবেই ধরে নেয়। অতএব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর বদলে রেংগুনের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মচারী শাহবন্দর ও ঝাঁসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন কক্সের রেংগুন বন্দরের সরকারি কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করার পূর্বেই একটি ঘটনা কোম্পানির মিশনের প্রতি বর্মিদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। ঘটনাটি ছিল বর্মিরাজা কর্তৃক কোম্পানির নিকট আরাকানে অরাজকতার অপরাধে অভিযুক্ত কয়েকজন সর্দার ও তাদের পরিবারবর্গের প্রত্যর্পণ দাবি। উল্লেখ্য যে, সর্দারদের প্রত্যার্পণ দাবি ছিল ক্যাপ্টেন সাইমসের নিকট বর্মিরাজের চিঠিতে উল্লেখিত বক্তব্যেরই প্রতিফলন। গভর্নর জেনারেল জন শোর বর্মিরাজের এই দাবি অযৌক্তিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি বর্মিদের সমস্ত বক্তব্য বার্মায় কোম্পানির রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কক্সের নিকট পেশ করার অনুরোধ জানান। আরাকানী সর্দারদের প্রত্যার্পণের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়াই ছিল কোম্পানির মিশনের প্রতি বর্মিদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার একমাত্র কারণ।

ক্যাপ্টেন কক্স অমরাপুরায় পৌঁছেও বর্মিরাজ বোধপায়ার সাক্ষাৎ পেলেন না, কেননা তিনি নাকি মিন্‌গুনে পৃথিবীর বৃহত্তম প্যাগোডা নির্মাণের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কক্স বর্মি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মিনগুনে পৌঁছেও বর্মিরাজের সাক্ষাৎ লাভ করতে সমর্থ হননি। সেখানেও তাঁকে উপেক্ষা করা হয়। অবশেষে লুট্রু এর তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তথা হানথাওয়াড়ির মিয়োউন এবং রেংগুনের ইয়েউনের সাহায্যে ১৭৯৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি বর্মিরাজের সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হন। এই সময় ক্যাপ্টেন কক্স বর্মিরাজের নিকট তিনটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপি তিনটি ছিল কোম্পানির প্রতিনিধির কূটনৈতিক অধিকার, বাণিজ্যিক স্বার্থ ও ফরাসী তৎপরতা সংক্রান্ত। কোম্পানীর প্রতিনিধির কূটনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত স্মারকলিপিতে ক্যাপ্টেন কক্স নিম্নোক্ত দাবিসমূহ পেশ করেন। প্রথমত, কোম্পানির এজেন্ট বার্মা আইনের এখতিয়ারের বহির্ভূত এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ কলিকাতা কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানির এজেন্টকে রেংগুনে অফিস বাসগৃহ নির্মাণের অধিকার দিতে হবে।

এ ছাড়া এজেন্ট ও তাঁর লোক-লস্করদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ হবে সর্বপ্রকার শুল্কমুক্ত।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ এজেন্ট তাঁর নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষী রাখতে পারেন, তবে দেহরক্ষীর সংখ্যা বর্মি সরকার নির্ধারণ করবেন।

সবশেষে, কোম্পানির এজেন্ট বর্মিরাজ ও রাজবংশের সদস্যদের নিকট অবাধ গমনাগমন করতে পারবেন। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের সাথে সমস্ত যোগাযোগ কোম্পানি এজেন্টের মাধ্যমে করতে হবে।

বাণিজ্যিক স্বার্থ সংক্রান্ত স্মারকলিপিতে ক্যাপ্টেন কক্স বর্মিরাজের নিকট যে সমস্ত দাবি পেশ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো (১) বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য মুদ্রার প্রচলন, (২) রেংগুনে জাহাজের ওপর শুল্ক হ্রাস, (৩) রেংগুনে বন্দরে দ্রব্যাদি পরীক্ষা করার আপত্তিকর পদ্ধতির বিলোপ, (৪) আমদানী শুল্ক হ্রাস করে ৫%-এ স্থিতিশীলকরণ (৫) বর্মি বণিকদের নিকট হতে বকেয়া দাবি আদায়ে বর্মি সরকারের আইন ও প্রশাসনিক বিভাগের সাহায্য, (৬) সমুদ্রের মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকদের জাহাজ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ বর্মি সরকারের বিচারের এখতিয়ারভুক্ত না হওয়া, (৭) উভয় দেশের বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা উভয় পক্ষের প্রতিনিধির মাধ্যমে সম্পাদন করা, (৮) দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিক্রয়ে ইংরেজ বণিকদের বার্মায় যথেচ্ছ গমনাগমনের সুবিধা, (৯) ব্রিটিশ জাহাজগুলোর যাত্রা ও নাবিকদের জন্য বার্মা হতে তিন মাসের রসদ সংগ্রহের অনুমতি, (১০) বার্মায় কোন ব্রিটিশ বণিকের মৃত্যু হলে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি কোম্পানির এজেন্টের নিকট হস্তান্তরকরণ এবং (১১) বন্দরে শুল্ক পরিশোধ করার পর কোম্পানির জাহাজ বিলম্ব না করানো।

বর্মিরাজের নিকট উপস্থাপিত তৃতীয় স্মারকলিপি ছিল বার্মায় ফরাসিদের প্রভাব সম্পর্কে। ক্যাপটেন কক্স দাবি করেন যে ১৭৯৫ সালে কোম্পানি কর্তৃক তিনজন আরাকানী সর্দারকে বর্মিদের হাতে এই শর্তে অর্পণ করা হয়েছিল যে বর্মি সরকার ইংরেজদের শত্রুদের বিশেষত ফরাসিদের বার্মায় আশ্রয় দেবেন না, এবং ফরাসি জাহাজগুলোকে মেরামত বা লুণ্ঠিত দ্রব্য খালাস করার জন্য বর্মি বন্দরে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। উক্ত শর্তানুযায়ী ক্যাপ্টেন কক্স দাবি করেন যে কোন ফরাসি জাহাজ বর্মি বন্দরে অবতরণ করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে বন্দর ত্যাগ করার নির্দেশ দিতে হবে, অন্যথায় জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে বর্মি কর্মচারী বা প্রজাগণ ফরাসি জাহাজকে কোনো রসদ বা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে পারবেন না।

ক্যাপ্টেন কক্সের অমায়িক ব্যবহার মুগ্ধ হলেও বর্মিরাজ তাঁর সমস্ত দাবি এড়িয়ে যান। অধিকন্তু তিনি স্বীয় খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য ক্যাপ্টেন কক্সকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করেন। তিনি বর্মিরাজের নির্দেশানুযায়ী চারফুট বিশিষ্ট মন্টোগফ্লর বেলুন তৈরি করতে অপারগ হলে বর্মিরাজের নিকট অপ্রিয় হন। এই সময় কক্সের জীবনে এক হাস্যকর পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বার্মার ছোট বড় সব কর্মচারীদেরকে আপ্যায়ন করতে এবং উপহার দিতে বাধ্য হন। বলাবাহুল্য বর্মি কর্মচারীদের আপ্যায়ন এবং উপহার প্রদান ইত্যাদি কার্যে কেবলমাত্র ব্যয়ের মাত্রাই বেড়ে গেল, রেসিডেন্টের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সাধিত হলো না। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য উত্তরকালে ক্যাপ্টেন কক্সকে কোম্পানির নিকট সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল।

কোম্পানির একজন সুদক্ষ ও নীতিবান কর্মচারী হিসেবে ক্যাপ্টেন কক্স স্বীয় দায়িত্ব পালনে কোনো অবহেলা করেননি। এডমিরাল এলফিনস্টোন কর্তৃক ওলন্দাজ নৌবাহিনীর একাংশকে পরাজিত করার সংবাদ কলিকাতা হতে বার্মায় প্রেরণ করা হলে ক্যাপ্টেন কক্স বর্মি সরকারকে এই বিজয় বার্তা সম্পর্কে অবহিত করলে জলযুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবহরের পরাক্রমে ও কর্তৃত্বের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কক্স ক্রমেই বার্মায় তাঁর অযৌক্তিক ও দুঃখজনক অবস্থা উপলব্ধি করেন। এই সময় তিনি কলিকাতার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বর্জিত অবস্থায় ছিলেন। একজন আরব ফকিরের মাধ্যমে তিনি কলকাতায় সংবাদ প্রেরণ করেন যে কলিকাতা প্রত্যাগত আরাকানের মিয়োউনের একজন ভৃত্য বার্মায় গুজব ছড়াচ্ছে যে অযোধ্যার নবাবের ইঙ্গিতে কাবুলের জামান শাহ্ ভারত আক্রমণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সংবাদ বার্মায় ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বর্মিরাজ বোধপায়া মিনগুন হতে অমরাপুরায় প্রত্যাবর্তন করলেও তিনি ক্যাপ্টেন কক্সের প্রতি মনোযোগী হননি। তাঁর মনোযোগ বিশুদ্ধ ছিল সদ্যাগত রজতশুভ্র দুটি হস্তীর ও আসামের বৈশালী হতে আগত রাজকন্যার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বার্মায় বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশবিরোধী সংবাদ কোম্পানির প্রতি বর্মিদের বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। অবশ্য পরে ক্যাপ্টেন কক্স এই এজেন্টকে বিহারের একজন জমিদার শিউ শিং! শমসের বাহাদুর হিসেবে শনাক্ত করেন। ক্যাপ্টেন কক্স এ পর্যায়ে দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি বার্মায় মিউন উনজির সহায়তায় শমসের বাহাদুরের বর্মিরাজের সাক্ষাৎ লাভ বিলম্বিত করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি গুপ্তচর নিয়োগের মাধ্যমে শমসের বাহাদুরের বার্মায় আগমনের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। গুপ্তচরের তৎপরতার ফলে শমসের বাহাদুরের গোপন পত্রের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বর্মিরাজ বোধপায়ার নিকট লিখিত শমসের বাহাদুরের পত্রে জামান শাহের ভারতে আক্রমণ এবং হোসেন বক্স নামে তৈমুরের জনৈক বংশধরকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু শিউশিং শমসের বাহাদুরের বার্মা আগমনের প্রকৃত কারণ ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কৃর্তক দখলকৃত তাঁর জমিদারি পুনরুদ্ধারে বর্মিরাজের সাহায্যলাভ। শেষ পর্যন্ত শমসের বাহাদুর বর্মিরাজের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেননি।

অবশেষে ক্যাপ্টেন কক্সের স্মারকলিপি লুট্টর রাজদরবারে আলোচিত হয়। আলোচনার সময় বর্মি মন্ত্রীবর্গ কিছু অপ্রত্যাশিত সুপারিশ করেন। প্রথমত, চট্টগ্রামে আশ্রিত আরাকানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জামিনস্বরূপ রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন কক্সকে বার্মায় আটক রাখা হোক। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কাশিমবাজার, মুর্শীদাবাদ ও ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল বর্মি সরকারের নিকট হস্তান্তর করার জন্য কোম্পানির ওপর চাপ প্রয়োগ করা হোক। উল্লেখ্য যে একত্রে বর্মি মন্ত্রীগণ ঐতিহাসিক কারণ দর্শিয়ে এই অঞ্চলসমূহ আরাকানীদের অধিকারভুক্ত বলে গণ্য করেন। অবশ্য পরে এই সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করে ঢাকার অর্ধেক অংশ দাবি করার বিকল্প সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেন কক্স ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন। তিনি গভর্নর

জেনারেলকে জানান : "অল্পকালের মধ্যে আমার কোনো চিঠি না পেলে ধরে নেবেন যে, আমি অন্তরীণাবদ্ধ ও সকল প্রকার যোগাযোগ বর্জিত। ক্যাপ্টেন কক্স এ সময় বর্মিদের সামরিক প্রস্তুতির কথা কোম্পানিকে অবগত করান। তিনি জানান যে বর্মি সরকার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম ও আসাম সীমান্তে ২০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করেছেন। এ ছাড়া ১০,০০০ সৈন্যর একটি দল রেংগুন ও পেগুর নিরাপত্তার জন্য বার্মার দক্ষিণাঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে। এই সময় ক্যাপ্টেন কক্স বার্মা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স প্রদত্ত বিবরণের তীব্র সমালোচনা করেন। কক্সের মতে বার্মা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সাইম্‌সের অতিরঞ্জিত কাহিনী কোম্পানিকে বর্মিদের প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে এবং পরিণামে এই ব্যবস্থা কোম্পানিকে ভুল পথে পরিচালিত করতে বাধ্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির প্রতি বর্মিদের মনোভাব পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, এন্ডারসনের গ্রন্থে প্রকাশিত পিকিং-এ লর্ড মেকার্টিনির মিশনের ব্যর্থতা বর্মি সরকার অবগত হন এবং এরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কোম্পানির প্রতি বর্মি সরকারের নীতিতে। দ্বিতীয়ত, বর্মি রাজদরবারের অহমীয়া দল, মিউন উনজি ও মালাবারের শাহ বন্দরসহ রেংগুন ও অমরাপুরার প্রভাবশীল রাজনৈতিকচক্র আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে জনরব ছড়িয়ে কোম্পানির প্রতি বর্মিদের ভয় ও সন্দেহকে বদ্ধমূল করে তোলেন। তৃতীয়ত, দুটি জনশ্রুতি কোম্পানির প্রতি বর্মি সরকারের বিরূপ মনোভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই জনশ্রুতি দুটি হলো মিনগুনের প্যাগোডা নির্মাণে বার্মা ধ্বংস হয়ে যাবার ভবিষ্যদ্বাণী। এই ঘটনার পূর্বে বার্মায় ধাতু নির্মিত নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করা হবে বলে জনৈক ফুংগি আরো একটি ভবিষ্যৎবাণী করেন। উল্লেখ যে, কিছুদিন পূর্বে বর্মিরাজ বোধপায়া ধাতু নির্মিত নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং ক্যাপ্টেন কক্স তাঁকে কিছু মুদ্রা ও একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। নতুন মুদ্রা প্রচলনের ফলে বার্মায় অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই অবস্থাকে নতুন মুদ্রা প্রবর্তনজনিত ফল হিসেবে গ্রহণ না করে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন কক্সকেই তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী করা হয়। এ ছাড়া আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বার্মা ও বাংলাদেশের পরস্পরবিরোধী ভূমিকা কোম্পানির প্রতি বর্মিদের শেষ আন্তরিকতাও লুপ্ত হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোম্পানির প্রতি বর্মি সরকারের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাপটেন কক্স তাঁর সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমকালীন রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিরোধী। বার্মায় কোম্পানির মিশনের অচলাবস্থায় ক্যাপ্টেন কক্সের কলিকাতার পথে প্রত্যাবর্তন করার প্রত্যেকটি অনুরোধ বর্মি সরকার প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজপ্রাসাদে একটা ঘটনা কক্সকে নতুন করে অনুকূল পরিবেশের প্রত্যাশায় আশ্বান্বিত করে তুলে। ক্যাপ্টেন কক্সের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণকারী মিউন উনজি বর্মি সভাসদের সহায়তায় বর্মিরাজ বোধপায়াকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করে ব্যর্থ হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাপ্টেন কক্স পুনরায় বর্মিরাজের নিকট তাঁর দাবিসমূহ উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর দাবিসমূহ প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তিনি ১৭ অক্টোবর অমরাপুর ত্যাগ করে নৌকাযোগে ১ নভেম্বর রেংগুন পৌঁছান। রেংগুনেও

ক্যাপ্টেন কক্সকে এক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। হানথাওয়াডীয় মিয়োউন ক্যাপ্টেন কক্সকে অনতিবিলম্বে অমরাপুরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দেশ জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশের অর্থ ছিল রেসিডেন্টের গতিবিধি সীমাবদ্ধ করা। ক্যাপ্টেন কক্স নিজেই সংকটময় পরিস্থিতি উপলব্ধি করেন এবং তিনি সুপ্রিম কাউন্সিলকে জানালেন : "আমার বাসস্থান হতে আমায় বলপূর্বক নিয়ে যাবার কোনো প্রচেষ্টাই আমি বিনা বাধায় হতে দেব না। যাই হোক না কেন, যতদিন না আপনাদের নির্দেশ পাই ততদিন আমার স্থান ও নীতি রক্ষা করবই।"

রেংগুন ও অমরাপুরায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্মি সরকার রেংগুনে কোম্পানির রণতরীর আক্রমণের আশংকা করেন এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন কক্স জানান যে বিনা অনুমতিতে কোনো জাহাজ রেংগুন নদী বেয়ে যাতে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য রেংগুনের নিকটে বর্মি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এ সময় রেসিডেন্ট কক্স বার্মার সাথে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ও কর্মপন্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি কোম্পানিকে জানান : "অতীত অপমানের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণের নিরাপত্তা ছাড়া অন্য কোনো শর্তে এদের সঙ্গে আপোষ করবেন না। এ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তরবারি হাতে নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। আপনাদের পূর্ব সীমান্তবর্তী প্রদেশের নিরাপত্তার জন্য এ জাতির সঙ্গে একটি দৃঢ় মৈত্রী চুক্তির জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এরা যদি আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে না আসে, কিংবা আমরা যদি এদের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার অর্জন করতে না পারি তবে শীঘ্রই ফরাসিরা এদেশের শাসক হয়ে বসবে। পাঁচ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য অতি সহজেই এর বর্তমান শাসকদের হাত হতে এদেশ কেড়ে নিতে পারে। সুনিপুণ ও সুসভ্য সরকারের পরিচালনাধীন এদেশ শীঘ্রই বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। কারণ বাংলাদেশের ওপর এদেশের যে কোনো নৌশক্তি সম্পন্ন জাতির কাজে আসে এমন কতগুলো অবস্থা ও সুবিধাদি রয়েছে।" এরপর কোম্পানির নিকট লিখিত রেসিডেন্ট কক্সের কয়েকখানা পত্রে কক্স মিশনের করুণ চিত্র প্রতিভাত হয়। কোম্পানি এ পর্যায়ে বর্মিরাজ, তাঁর প্রধানমন্ত্রী, প্রধান উনজি, দ্বিতীয় উন-জি ও পেগুর প্রতিনিধির নিকট সরকারি পর্যায়ে সংবাদ প্রেরণ করে মিশনের ব্যর্থতার জন্য রেসিডেন্ট কক্সকেই দায়ী করে এবং রেসিডেন্টকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়। তাঁকে জানানো হয় যে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন বর্মিরা কোনো বাধা দিলে কোম্পানি সুপ্রিম কাউন্সিল সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ সময় হঠাৎ করে বর্মিদের মনোভাব পরিবর্তন হয় এবং তারা কোম্পানির মিশনের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করেন। সম্ভবত মিশনটি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সংবাদই বর্মিদের মনোভাব পরিবর্তনের কারণ ছিল। ক্যাপ্টেন কক্স ১৭৯৮ সালের ১২ জুন কলকাতায় পৌঁছান। উল্লেখ্য যে, ক্যাপ্টেন কক্স এর রেংগুন ত্যাগ করার পর পরই লুট্ট হতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বর্মি সরকার ক্যাপ্টেন কক্সকে রেসিডেন্ট হিসেবে বিভিন্ন সুবিধাদানের প্রস্তাবে সহযোগিতা করতে রাজি হন। বর্মিদের এই সহযোগিতার বক্তব্য ভিত্তিহীন। কারণ এর পরে ফোর্ট উইলিয়াম কতৃপক্ষ বার্মায় পুনরায় এজেন্ট নিয়োগের প্রস্তাব করলে বর্মিদের নিরুত্তর থাকতে দেখা যায়।

ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স বার্মায় তাঁর মিশনের ব্যর্থতার কারণ আলোচনায় বর্মিদের অতিরিক্ত আভিজাত্যবোধ এবং বাবাশিন ও ঝাঁঙ্গীর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। বাবাশিন ছিলেন বার্মার একচেটিয়া বাণিজ্যির মালিক 'বোদিন' কোম্পানির সাথে জিড়ত এবং এ ব্যবসার অবসান কল্পে রেসিডেন্ট কক্সের হস্তক্ষেপেই ছিল কোম্পানির মিশনের প্রতি বাবাশিনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার একমাত্র কারণ। কক্সের মতে কোম্পানির প্রতি বর্মিদের আপোষহীন মনোভাবের কারণ হল বর্মিরাজের আসাম দখলের প্রচেষ্টায় কোম্পানির প্রতিবন্ধকতা। উল্লেখ যে ক্যাপ্টেন কক্স বর্মিরাজের আসাম দখল করার প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারিভাবে সতর্কবাণী করেছিলেন যে এ ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কোম্পানিকে আসামে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করতে পারে। এছাড়া তিনি কোম্পানির মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স প্রদত্ত বার্মা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও ভুল ধারণার ওপর বিশ্বাস স্থাপনকে দায়ী করেন। কেননা তাঁর মতে সাইমসের অতিরঞ্জিত বক্তব্যে কোম্পানি প্রভাবিত না হলে পরবর্তী মিশন প্রেরণের বিষয়টি কোম্পানি গভীরভাবে বিবেচনা করতো। কক্স জানান যে বাণিজ্য সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির আদৌ কার্যকরোপযুক্ত ছিল না। ফরাসিদের প্রভাব সম্পর্কে সাইম্‌স প্রদত্ত তথ্য ভুল ছিল বলে কক্স দাবি করেন। ক্যাপ্টেন কক্স মনে যে বর্মি সরকার কোম্পানির এজেন্টকে বার্মায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক এবং কোম্পানির এজেন্টের কূটনৈতিক অধিকার প্রদানের দাবি প্রত্যাখ্যান করাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়া কোম্পানির মিশনের ব্যর্থতার পেছনে বিভিন্ন দেশগুলোতে মিশনের অধিকার এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বর্মিদের অজ্ঞতা, তাদের অপ্রতিহত বিভিন্ন বিজয় এবং বার্মায় অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের নৌযান ও দল পরিবর্তনকারী নাবিকদের তৎপরতা দায়ী ছিল বলে কক্স উল্লেখ করেন।

ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের মিশনের ব্যর্থতা হতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ ১৭৯৭ সালে স্বাক্ষরিত ক্যাম্পো-ফরমিও চুক্তির পর ইউরোপের রাজনীতিতে ইংল্যান্ডের মর্যাদার ব্যাপক হ্রাস লক্ষ করা যায় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডকে এক ফরাসি শক্তির মোকাবিলা করতে হয়। এই ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাসের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের দরবার ফরাসিদের প্রাধান্যও তাদের ব্রিটিশবিরোধী ষড়যন্ত্র। নিজাম, সিন্ধিয়া ও টিপু সুলতানের দরবারে ফরাসি শক্তি প্রাধান্য লাভ করে। ভারতের রাজনীতিতে কোম্পানির এই অবস্থার সুযোগ নিয়েই বর্মি সরকার বারংবার চট্টগ্রাম সীমান্ত লংঘন ও কোম্পানির মিশনকে অগ্রাহ্য করেন। এই অবস্থার সাথে সংযোগ ঘটেছিল পিকিংয়ে লর্ড মের্কাটনির মিশনের ব্যর্থতা। কক্স মিশনের দ্বিতীয় গুরুত্বটি ছিল বার্মা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স প্রদত্ত অতিরঞ্জিত ও ভুল ধারণার নিরসন। কক্স মিশনের পর পরই কোম্পানি বার্মা সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলেও পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন ক্যানিং-এর মিশনসমূহের মাধ্যমে কক্স মিশনের ব্যর্থতার কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

পুনশ্চঃ

ক্যাপ্টেন হাইরাম কক্স ১৭৫৯ খ্রিঃ (মতান্তরে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টের পদাতিক বাহিনীর ব্যাটেলিয়ন ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যাডেট হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে আসেন। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কমিশন লাভ করেন। ২৯ মে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ল্যাফটেনেন্ট পদে পদোন্নতি পান। ১১ এপ্রিল, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন। ২৯ অক্টোবর ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় থার্ড বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টে ল্যাফটেনেন্ট পদে যোগদান করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ জানুয়ারি ব্যাটেলিয়ন ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন।

মি. কক্স স্কটিশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার মাতা মেরি ছিলেন আলেকজান্ডার ফ্রেসার-এর কন্যা, যার প্রমাতামহ ছিলেন অষ্টম লর্ড লোভেটো। পিতা হেনরি চেম্বাস্ মারভে কক্স কিউ. ভি.।

মি. কক্স ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি এলাকায় আরাকানী মগদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। বার্মায় রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার ওপর তিনি একটি বই লেখন। বাইটির নাম Journal of a Residence in the Burman Empire'। বইটি তার পুত্র এইচ. সি. এম. কক্স কিউ. ভি. ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ক্যাপ্টেন কক্স ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২ আগস্ট ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৩৯ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে মারা যান।

অনুসৃত গ্রন্থ : Officers of the Bengal Army 1758-1834, by Hodson (Chomb, T 19855, 16/10/6)

পরিশিষ্ট গ

No. 560G.S., dated Chittagong, the 10th August 1894.

From-C.G.H. ALLEN, ESQ., Settlement Officer,

To-The Director of the Department of Land Records and Agriculture.

As directed in your telegram, dated the 25th June, I have the honour to submit a report on the result of the revision of the Ramu assessment.

2. The revision was undertaken in compliance with the orders of Government contained in their letter No. 1233L.R., dated the 6th March 1984. Instructions as to the method to be pursued were drafted by you in Chittagong on the 18th March 1894, and were approved by Government, subject to certain modifications, in their letter No. 1806 L. R., dated the 31 st March 1894. Finally, in your telegram, dated the 31st March 1894, I was authorized to fix rasadi gradations without special confirmation.

3. In order to carry out these orders I encamped at Cox's Bazar from the 23rd to the 29th March 1894. The Assistant Settlement Officer was also there, and with him I went through the assessment records. I recorded the result of my proceedings in a memorandum, a copy of which accompanies this report.

4. The report now submitted has special reference only to 166 taluks, viz., 154 long-term taluks and 12 taluks formed out of excess lands separated from permanently-settled estates. Particulars with regard to the assessment of these taluks are contained in statements A and B submitted herewith. The Assistant Settlement Officer has not furnished me with similar particulars with reference to the remaining mahals in the circle, viz., independent itmams, hal taluks, izaras, khas jots and Noabad taraf Joy Narain Ghosal. I have called upon him for similar information about these mahals, but think it better to submit this report at once, more especially as the rents of the remaining mahals were but little affected by my revision.

5. Rents of raijats payable to talukdars. The principal objection raised to these rents has been that they were illegally and inequitably enhanced on a basis of soil-rates. The villages in which rents were originally enhanced on this basis are named in the margin. These rents had been revised by the Assistant Settlement Officer in the light of the Board's criticisms before I visited Cox's Bazar. The result of the revision will appear from the following figures:-

VILLAGE.	Raiyati rental proposed in 1892	Rental fixed.	Deduction obtained in revision.	REMARKS
1	2	3	4	5
No. 1, Jhilwanja ...	14253	13153	1100	Hal taluks and taluks with which excess
" 2, Khuruskul ...	4,93040	4,864 9 3	65109	lands have been amalgamated have been omitted.
" 11, Chakmarkul...	2,97679	2,927 1 0	4969	Column 2 is filled up from the printed
" 16, Fatehkhankul...	67820	671 100	680	statement A submitted with this office
" 17, Rajakul...	2,519129	2,404 8 3	11546	No. 1638, dated the 19th August 1892
" 25, Garjania ...				No assessments completed.
" 26, Kachapia ...	5,22409	4,861 2 9	362140	
Total	16,471 06	15,86046	610120	

6. The Following figures show the reduction in the raiyati assets of the taluks included in statement A submitted with this report effected by the Assistant Settlement Officer previous to my revision :-

Total raiyati assets previously proposed (see column 4 of statement A submitted with my letter No. 1638 G.S., dated the 19th August 1892)

	Rs. A. P.
... ...	81,363
Deduct raiyati assets of hal taluks	5,47037
Balance	75,89354

Deduct raiyati assets of items 5, 33, 56, 58 110, 122, 157, 173 of the old statement A with which excess lands separated from permanently-settled mahals have been amalgamated

	5,31522
Balance	70,5783 2

Raiyati assets of the taluks as proposed in 1892, with .the exceptions marginally noted

	Rs. A. P.
... .	70,578 3 2
Raiyati assets now fixed ...	66,600711
Reduction	3,977113

New assets.

Total of colums 9 and i0 of statement B submitted herewith	72,849 9 3
Deduct raiyata assets of mahals formed of excess areas, viz;, items 7, 8, 43, 44, 45, 78, 79, 122, 147, 155, 165, 166 of statement A herewith aubmitted	747 15 4
Balance	72,1029 11
Deduct raiyati assets of mahals with which excess lands have been amalgamated (items 5, 31, 55, 56, 109, 120, 146 and 163 of statement A herewith submitted).....	5,501 2 0
Balance	66,6007 11

which is equivalent to a reduction of 5.6 per cent. The effect of these reductions has been to ordinarily leave the existing rates of rent untouched, the increase of rental being due to increase of area under cultivation.

7. From column 4 of statement A submitted herewith, it appears that the rents of raiyats paying direct to the talukdars have been enhanced from Rs. 31,610-10-5 to Rs. 37,201-5-6, or by Rs. 5,590-11-1. In other words, the rents of these raiyats have been increased 17.6 per cent. I am of opinion that these figures are sufficient to show that the rents of these raiyats have unto, generally speaking, been extravagantly enhanced, as the bulk of the increase obtained is attributable to increase of area brought under cultivation by the raiyats since the creation of their holdings. I examined the records with a view to ascertain whether rents had been enhanced in any case in such a manner as to cause hardship, but I was unable to find that anything of the sort had occurred. The fact that these rents had already been revised by the Assistant Settlement Officer rendered my task comparatively a simple one, and obviated the necessity of moving the Assistant Settlement Officer to review his fair rent decisions, except in the cases of a few itmams, which I shall notice when I come to deal with them.

8. Rents of taluks payable to Government. - In the memorandum referred to in my third paragraph, I have recorded at length the reductions which I effected in the rents of taluks, my reasons for making the reductions, and the process by which they were made. I employed four methods of reducing the rents where they appeared to me to be excessive with reference to the existing rents :-

(1) In some eases I increased the allowance to the talukdar up to a limit of 40 per cent of the assets.

(2) In other cases I adopted as the assets the rents payable by itmamdars to the talukdar instead of the gross raiyati rents of the taluk.

(3) I fixed rasadi gradations for the payment of the enhanced rents.

(4) In some taluks requiring costly embankments, I allowed special reductions.

9. It is to be observed that before I commenced the revision, the Assistant Settlement officer had already, acting under my instructions, revision, the rents. The rents entered in column 5 of statement A which accompained my letter No. 1638, dated the 19th August 1892, were proposed rents only. In setting the rents of the taluks, the Assistant Settlement Officer was guided by the remarks made by the Board upon the assessment proposition statement, and in cases in which the proposed enhancement appeared to him excessive, he settled lower rents that those originally proposed by him, by allowing the talukdar to retain 35 and in some cases 40 per cent, of the gross assets of the taluk. The revision of raiyati rents which I have described in paragraphs 5, 6 and 7 above, also had the effect of reducing the talukar's rents in many cases, by diminishing the raiyati assets. In statement C which accompanies this report I have given particulars of all the taluks whose rents as now settled differ from those proposed in 1892. In this statement are included both the taluks whose rents have been reduced by me in revision, and also those whose rents as now settled by the Assistant Settlement Officer are less than those originally proposed by him. It will be seen that the total reduction effected is Rs. 5,756-11 representing a reduction of 14F(1,2) per cent, as compared with the rents originally proposed.

10. In statement D I given figures showing the reduction effected by me in revision. As the enhancements were mitigated in many cases by fixing rasadi gradations, I have calculated the total reduction of demand which will result during the settlement of 30 years. The total is Rs. 84,484, re-resenting a yearly reductin of Rs. 2,816, which is equivalent to 9.3 per cent, of the total rent settled by the Assistant Settlement Officer.

11.

	Rs. A. P
Total of column 9 of statement F of 1892	4,415 6 0
Deduct proposed revenue of items 17 and 18 not included in new statement A ...	3.196 12 Q
Balance ...	1,21810 0

The rents fixed are in reality somewhat lower than this, but H have not been able to calculate the difference.

Statement D shows that the rental fixed by the Assistant Settlement Officer of the taluks for which I have fixed rasadi gradations is Rs. 21,811. Deducting Rs. 15,032-2, the total of column 7 of this statement, the balance is Rs. 6,778-14.

11. From statement A submitted herewith, it appears that the rents of the taluks in the statement have been raised from Rs. 24,221-15 to Rs. 47,717-15-5. From the latter figure must be deducted, however, the rents of the excess lands amalgamated with taluks or formed into new taluks in statement A, amounting to Rs. 1,218-10.* The enhanced rents are therefore Rs. 46,599-55, and the rate of enhancement 92.3 per cent. Of the enhanced rents, however, Rs. 6,778-14+ is payable by rasadi gradations. The enhancement immediately payable is therefore as follows :

	Rs. A. P.
Total enhanced rents	46,599 5 3
Deduct formerly existing rents	24,221 15 0
Balance	2,377 6 3
Deduct enhancement realizable by rasadi gradations	6,778 14 3
Balanace	15,598 8 3

	D. K.
Total present cultivated area of taluks	
(column 3 of old statement A)	2,816 8
Deduct present cultivated area of hal taluks	199 13
Present cultivated area of long term taluks 2616	11
Former total cultivated area of taluks	
(column 7 of old statement A)	2305 13
Deduct dito of hal taluks	209 10
Former cultivated area of long-terms taluks	2096 3
Increase of cultivation	520 8

which is an enhancement of 64 per cent, on the previous rents. This is a high rate of enhancement, but is should be remembered that since these taluks were settled in 1836, prices have risen 62 per cent., and cultivation in the long-term taluks 19 per cent., as is shown by the figures in the margin.

12. The rents of the taluks specially referred to in paragraph 20 of the taluk No. 64, the present prevenue entered in old statement A, Rs. 3-4-5, was a misprint of Rs. 30-4-5. In the case of taluk No. 20, the rent settied is less than Rs. 10. and the present cultivated area is 8% 15g, 3c. as against 1 k 12g. 2c. on which the former assessment was based. For these reasons I did not consider it necessary to reduce the rent fixed.

13. Rents of dependent itmans:-previous to the receipt of the present orders the Assistant Settlement Officer had already, under my instructions, revised his records by recording the existence of all itmamdars and fixing their fair rents. The allowance made to these itmamdars varied from 15 to 20 per cent of the raiyati assets. From column 4 of Statement A submitted herewith, it appears that the rents of the itmams included in these taluks have been enhanced from Rs. 24,559-6-5 to Rs. 32,465-7-10 or by 32 per cent. From the above it will be seen that the revision ordered by the Board had already been made before I visited Co'x Bazar. I however revised the rents of some itmams in mauza Khuruskul, as will be seen from paragraphs 6-9 of my memorandum of revision.

14. The records of 48 villages were finally published before the commencement of the agricultural years 1894-95. Consequently, the new rents published will become payable with effect from the 13th April 1894, corresponding with the 1st Baisakh 1301 B. S. or 1256 M.S. The settlement of 30 years will expire, therefore, at the end of the agricultural year 1923-24, i.e., on the 30th Chaitra 1330 B.S. or 1285 M.S. In the 48 villages whose records were finally published before the commencement of the agricultural year, the new rents of the Noabad taluks included in the accompanying statement A, and of independent itmams and khas jots, were published. The rents of the hal talukdars have not yet been settled by the Assistant Settlement Officer, though the rents of the tenants subordinate to the hal talukdars have been settled. I have directed the Assistant Settlement Officer to settle the rents of the hal taluks at once.

15. Paragraph 44 of the Boards letter-Special allowances on the score of embankments have been made to talukdars in mauzas Chaufaldandi, Machuakhali, and Nandakhali, as described in paragraphs 100, 101, 103 and 107 of my memorandum of revision.

NOTE ON THE REVISION OF ASSESSMENTS IN OLD THANA RAMU.

No. 1, Mauza Wanjarbil

I have seen all the rents of Noabad taluks and khas jots as revised.

2. Taluk No. 69. – I reduced the rent from Rs. 39 to Rs. 33-6, allowing the talukdar 40 per cent., because he collcets rents in small sums from a large number of tenants.

3. The fair rent of taluk No. 77 is not yet fixed. I approved the fair rents of all the Noabad jots and ijaras.

Note.–The fair rent of this taluk has since been fixed.

C.H.A.

4. Excess lands.– Item No. 3 has been amalgamated with taluk No. 74. The fair rents of items I and 2 have not yet been fixed. Some raiyats under item No. 1 have appealed to the Special Judge, who has reduced the rents of two, and ordered the enhancements in the case of these two raiyats to be spread over five years. The rent of one of these men, Easaf Ali, has been raised from Rs. 52-14 to Rs. 231-8. He holds 9d. 10k. hasila, and the new rent seems fair, but the rise seems too large to take in five years. I therefore moved the Assistant Settlement Officer to review his judgement and spread the enhancement over ten years in five gradations with intervals of one year.

The fair rents have since been fixed. Item No. I is item No. 7 of statement A (now), and item No. 2 of old statement F is item No. 8 of new statement A.

C. H. A.

5. Independent itmamdars.-Some of these itmamdars have appealed without success up to the High Court. None of the enhancements exceed 100 per cent. I have therefore let them stand.

Instructed the Assistant Settlement Officer to issue notices for final publication on the 2nd April.

No. 2, Mauza Khurushkul.

6. Taluk No. 84, Tajanissa, Itmam No. 51 Asraf Ali.-Former rent Rs. 333-2-6. New rent Rs. 1,262-14.

	D.	k.	g.	c.	
Former area	16	1	0	0	
New area	50	6	7	2	hasila.
	8	15	13	3	khila.
	59	6	1	1	

The former rate was nearly Rs. 1-4-9 a kani. The present assets follows :-

	D.	k.	g.	c		Assets
Nij-jot area	12	14	13	1	knsila.	
Raiyati						Rs. A. P.
	5	5	7	3	khila.	393 0 0
Total	18	4	1	0		
Raiyati	37	6	4	0	hasila	1, 185 10 3
Total	40	14	10	0	khila.	1 578 103

Gross rents.

The Assistant Settlement Officer has allowed the itmamdar 20 per cent, including cost of collection, and fixed the fair rent at Rs. 1,262-14. In this case there is no great an increase of cultivation that, in whatever mode the rent is assessed, a very large enhancement is unavoidable. Under the circumstancess I consider the existing rate a fair one, an assessing the hasila area at the rate of Re. 1-4-9 a kani, fix the fair rent at Rs. 1,037-8. This is, however, too large an increase to take all at once, and Im moved the Assistant Settlement Officer to review his judgement accordingly, fixing the fair rent at Rs. 1,037-8, payable in the following instalments, viz. :-

	Rs. A
For 1894-95 to 1898-99	
From 1899	666 6
	1,037 8

7. Itmam No. 336, Fakir Mahommed.–Former area 2d. Former rent Rs. 38.

8. New area 3d. 1k. 19g. 3c. New rent Rs. 83-14. The total assets are–

	Rs. A.
Nij-jot	26 6
Raiyati	78 8
Total	104 14

Bearing in mind the high rate of enhancement and the large proportion of the assets due to raiyati rentals, I moved the Assistant Settlement Officer to reduce the rent to Rs. 77, thereby allowing the itmamdar *a* commission of about 25 per cent.

8. Itmam No. 541, Tilak Chandra.-Former area 2d. 4k. Former rent Rs. 24–3–6. New area 1d. 13k. 16g. 3c. hasila. New rent Rs. 50-11. Assets–

	Rs. A.
Nij-jot	32 12
Raiyati	26 14
Total	59 10

I moved the Assistant Settlement Officer to allow the itmamdar 20 percent., thereby reducing the rent to Rs. 47-8.

9. Itmam No. 548, Nejameddin-Former areaid. 9k. 2g.2c. Former rent Rs. 29-1. New area 2d. 12k. 19g. 2c. hasila. New rent Rs. 61-2. I moved the Assistant Settlement Officer to reduce the rent to Rs. 58.

The total reductions in the rents payable by itmamdars in taluk No. 84 are–

	Rs. A. P.
For the years 1894-95 to 1898-99	616 1 0
For the year 1899-1900 onwards	206 3 0

The rents of the raiyats in this taluk have already been revised by the Assistant Settlement Officer in accordance with my instructions.

10. The gross rents of taluq No. 84 are–

	Rs. A. P.
Nij-jot	108 11 0
Payable by raiyats	1,060 5 3
Payable by itmamdars from 1894-95 to	2,204 11 0
1898-99	3,373 11 3
From 1899-1900 onward the assets will be	3,783 9 3

Tho Assistant Settlement Officer had, in accordance with may instructions, revised the rent of this taluq, fixing it at Rs. 2,786-4. 1 allowed the talukdar 30 per cent, on the above assets, and fixed his fair rent as follows:-

For the years 1894-95 to 1898-99	2,301 8 0
For the years 1899-1900 onwards	2,648 8 0

1 1. Taluk No. 89.– The old rent was Rs. 27-5-6 an the new is Rs. 77. This is too large a sudden rise. I reduced the rent to Rs. 54 for the years 1894-95 to 1898-99. The new rent, Rs. 77, will come into force from 1899-1900. The fair rents of the other taluks in this village appear to have been correctly fixed. I did not go into the proposed assessments in Noabad taraf Joy Narain Ghosal, as they are not referred to in the Government orders. I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the Noabad records of this village at once.

No. 3, Mauza Tetaia.

12.1 perused the records by which the fair rents of Noabad taluks and jots were fixed in this village and found nothing to alter. The records can be finally published at once.

No. 4, Mauza Totakhali.

13. The rents of subordinate tenants in this village were all fixed by Babu Durga Charan Ghose. The enhancements do not appear to be excessive, and there is no necessity for revision. The records may be finally published at once.

No. 5-6, Mauza Patali Machuakhali.

14. Taluk No. 94, Yar Mahommed.-This is a difficult case. The former rent was Rs. 240 and the new rent is Rs. 1,043. The raiyati rents have been raised from Rs. 1,084-3-9 to Rs. 1,503-8. The Assistant Settlement Officer informs me that the existing rents of the majority of the tenants were settled as fair, and that the rents which have been raised are mainly those of relatives of the talukdar. The raiyats rents were fixed not on the basis of soil-rates, but on rates adopted after local enquiry and based upon recorded evi-

dence. After perusing the record, I see no reason to interfere with the rents recorded evidence. But the enhancement which the Assistant Settlement Officer proposes to take from the talukdar is to large. The Assistant Settlement Officer informs me that the talukdar has ruined himself by filing a tauzi in which he understated the rents of his raiyats. The raiyats took advantage of this to tender rents at the rate alleged, and the talukdar stood out for the old rents. Under all the circumstances I consider it hopeless to expect to realise more than Rs. 960, which represents a 300 percent, enhancement. This amount cannot be realized immediately. In accordance with the rules drawn up by the Director of Land Records, I fix the rent at Rs. 480 for the years 1894-95 to 1898-99, at Rs. 720 for the years 1899-1900 to 1903-1904, and at Rs. 960 from the year 1904-05 onwards.

15. Taluk No. 95, Nabi Jafar.-Former area 5d. 7k. hasila. Former rent Rs. 87-14-6. New area 15d. 11k. hasila. New rent Rs. 369-4. Assets–

	Rs. A. P.
Itmamdari	140 0 0
Raiyati	352 10 3
Total	492 10 3

Rents based on rates adopted after local enquiry, as in 1st case, appear to be moderate. Allowing the talukdar 30 per cent, of net assets, I fix the fair rent at Rs. 344-12, enhancement to take place by following gradations:–

	Rs. A. P.
1893-94 to 1898-99	175 12 0
1899-1900 to 1903-04	258 8 0
1904-05 onwards	344 12 0

16. Taluk No. 101, Samad Ali-The Assistant Settlement Officer has already, acting under my instructions, fixed the rent at Rs. 901-2 instead of Rs. ,1,053-10, the proposed rent. This leaves the talukdar a net profit of about 37 per cent. I do not consider this rent excessive, but the old rent was so low that the rise is too large. I therefore direct that the enhancement shall come into effect by the following gradations, viz.:-

	Rs. A. P.
For the years 1894-95 to 1898-99	512 12 0
" " 1899-1900 to 1903-04	769 4 0
" " 1904-05 onwards	901 2 0

17. Taluk No. 107, AjgarAli.-Old area 20d. Oldrent Rs. 140. New area 16d. 7k. hasila. New rent Rs. 361.

The round figures in which the former area of this taluk are shown and the low rate of rent make it clear that the area was originally estimated only,

and that the lands were probably covered by jungle at the time of settlement. It will be seen that the raiyati assets are Rs. 516-6 as against Rs. 476-10 previously shown. The reason is that the existing rents of itmams, which were formerly ignored but have now been recorded, are actually higher that the rents calculated at soil-rates. I am informed that this taluk has recently been bought at auction and the rents still further enhanced. I see no reason to reduce the rent, but the rise from the old rent is too sudden, and I ordered that the new rent should come into effect by the following gradations:-

	Rs.
For the years 1894-95 to 1903-04	280
" " 1904-05 onwards	361

18. Taluk No. 108, Aman Ali. - Former area 5 d. hasila. Former rent Rs. 62-4-9. Now area 16d. 12k. hasila. Proposed rent Rs. 348-2.

The assets have already been revised and reduced from Rs. 519-10-6 to Rs. 497-5-6. I do not think any further reduction advisable. It will be seen that the area is more than trebled, and that the taluk was originally held at the rate of Rs. 12 a drone. The Assistant Settlement Officer informs me that the lands are good. The rent has already been reduced by him to Rs. 348-2 in accordance with the revised assets. In such cases as these the enhancement cannot but be large, and after consideration I do not think that the limit of 300 per cent, would work equitably in this case. It would reduce the rent in this case to Rs. 249, which is only 50 per cent, of the assets. I .allowed 40 per cent, to the talukdar in consideration of the large enhancement, and reduced the rent to Rs. 298, payable by gradations as follows :-

	Rs.
For the years 1894-95 to 1898-99	141
" " 1898-99 to 1903-04	219
" " 1904-05 onwards	298

19. Taluk No. 109, Khorshed Ali.-Old area 2d. 12k. hasila. Old rent Rs. 37-1-3 New area 6d. 2k. hasila New rent Rs. 140-12.

The assets have been very slightly increased, and I consider the rent fixed, R. 140-12, to be fair But the rise from the old rent, Rs. 37-1 -3, is too sudden, and I direct that it shall be payable by the following gradations :-

	Rs.	A.	P.
For the years 1894-95 to 1898-99	74	0	0
" " 1898-99 to 1903-04	111	0	0
" " 1904-05 onwards	140	12	0

20. Taluk No. 110, Akbar Ali.–Former area 1 d. 11 k. hasila. Former rent Rs. 26-11-9. New area 3d. 6k. hasila. New rent Rs. 90-6.

The raiyati rents have practically remained unaltered, and there seems no case for reducing the rent. The enhancement power is large, and I direct that it shall take place by gradations as follows:-

		Rs.	A.	P
For the years 1894-95 to 1898-99	....	58	8	0
From the year 1899-1900 onwards	....	90	6	0

I think it unnecessary to fix more gradations in view of the small amount of the rent.

21.I considered the rents of the other taluks, but they appear to require no revision.

22. Independent Itmams.– Their rents have already been reduced in consequence of a commission of 20 per cent, being allowed them (see paragraph 34 of the Board's No. 168A., dated the 9th February 1894).

No. f (11,13), Jafar Dewan and others.-The former area was 2d. 2k. hasila and the rent was Rs. 41 -3-3. The present area is 3d. 15k. hasila and the new rent is Rs. 159-2-0.

The raiyati rents have been left unaltered. So there seems no reason to reduce the assets on the rent, but I direct that the enhanced rent shall come into effect by the following gradations :-

		Rs.	A.	P.
For the years 1894-95 to 1898-99	....	82	0	0
" " 1899-1900 to 1903-04	.....	123	4	0
From the year 1904-05 onwards	.....	159	2	0

Itmam No. 4, Dom Ali.-The increase of rent from Rs. 495-1-1 to Rs. 957-4 seems to large to take effect at once, gradations :-

	Rs. A. P.
For the years 1894-95 to 1898-99	753 0 0
From the year 1899-1900 onwards	957 4 0

23. There appears to have been no excessive enhancement of the rents of khas jots in this village. The rents were all fixed in one proceeding along with those of all the Noabad raiyats in the village, and appear to have been based on moderate rates.

24. Patili Machuakhali Khurulia.-I examined the rents fixed for separated excess lands —— Settlement Officer to finally publish the records forthwith.

No. 7. Mauza Khurulia.

25. The rents of all the raiyats in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. There are taluks and jots in this

village. After considering the rents I am of opinion that none are excessive, and I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records forthwith.

No. 8. Mauza Chainda.

26. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. I examined the rents of the taluks and jots and did not observe any excessive enhancement. I directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records of the village forthwith.

No. 9. Mauza S. Mitachari.

27. The raiyati rents were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. I examined the rents of the taluks, khas jots and separated excess lands. None appeared to need revision. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to proceed with the final publication at once.

No. 10. Mauza Umkhali.

28. The raiyati rents were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer.

29. Taluk No. 134, Rahat Jan.–The large increase of raiyati rent is due to the assess of 2d. 8k. 6g. 2c. which is in the possession of the talukdar, and for which no existing was recorded.

30. Taluk No. 136, Mritunjoy Barua.– The former rent of the taluk was Rs. 30-4-5, 3-4-5 as shown in the statement.

31. Taluk No. 136, Mritunjoy Barua.–The former rent of the taluk was Rs. 30-4-5, 3-4-5 as shown in the statement.

Taluk No. 137, Bux All.–Former rent Rs. 6-13-5. New rent Rs. 16-6. He has to realize from eight tenants and has no land in his own cultivation. For this and in consideration of large enhancement and the high rate of rent, I allow him 40 percent commission, including cost of collection, and fix his fair rent at Rs. 14.

32. I have considered the rents of the other taluks and khas jots in this village, and am of opinion that the enhancements are not excessive. I have accordingly instructed the Assistant Settlement Officer to proceed with the final publication at once.

No. 11, Mauza Chakmarkul.

33. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, on the basis of soil-rates, but the rents have since been revised by him, and considerable reductions made. It will be seen that this revision has effected large reductions in the rents of the taluks. The effect of this revision has been that existing rents have ordinarily been accepted, and rents increased only in cases of increased cultivation.

Note.-These rents have since been fixed and are included in the accompanying statement A.

C.H.A.

34. The rents of taluks Nos. 139 and 143 have not yet been fixed judicially. The date of disposal is fixed for the 27th instant.

35. Taluk No. 144, Dom Ali.-Previous rent Rs. 170-2-6. New rent Rs. 273. The net profits realizable by the talukdar are :-

	Rs.	A.	P.
Payable by Itmamdar	91	10	0
Payable by raiyats	276	5	9
Total ...	367	15	9

The Assistant Settlement Officer has calculated the assets at Rs. 388-10-9, ignoring the rents of the itmamdars, and taking the assets of the taluk to be the rents payable to the itmamdars by their tenants. In view of the large enhancement, I take Rs. 367-5-9 to be the assets of the taluk, and allowing the talukdar 30 per cent, commission including of collection, reduce the rent to Rs. 257-8.

36. No. 147, Taluk Khairullah.-Former rent Rs. 13-9-3. New rent Rs. 26-4. In view of the large enhancement and of the facts that the talukdar has to collect his rent in small sums from 12 tenants and has no nij-jot lands, I allow him 40 per cent, commission and reduce the rent to Rs. 22 8.

37. Taluk No. 149, Petan Bibi.-In this case the Assistant Settlement Officer has in revision of his previous proceedings allowed the talukdar a commission of 40 per cent., thereby reducing the rent to Rs. 60-3. This appears to be a fair rent, but the enhancement is too large to take effect at once. I therefore directed that it should come into force by gradations as follows :-

	Rs.	A.	P.
For the years 1894-95 to 1898-99	41	0	0
From the year 1899-1900 onwards	60	3	0

38. The rents fixed for the remaining taluks and of the khas jots appear not to excessive. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 12. Mauza Nunachari.

39. In this village Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, fixed the fair-rents of the Noabad tenants.

40. Taluk No. 154, Ali Hosain.-Former rent Rs. 166-13. New rent Rs. 293-4. The enhancement is too large to come into effect at once. I therefore fixed the following gradation :-

	Rs.	A.	P.
For the years 1894-95 to 1898-99	229	0	0
From the year 1899-1900 onwards	293	4	0

41.1 considered the rent of No. 158, Taluk Abdul Hakim. The old rent was Rs. 30-2-6 and the new rent is Rs. 76-8. The enhancement is therefore large, but in consideration of the facts that the talukdar is a well-to-do merchant, and the rent is small, I consider it unnecessary to fix rasadi gradation.

42.1 considered the rent fixed of the remaining taluks and khas jots in this village; the rents did not in any case appear to be excessive. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 13. Mauza North Mitachari.

43. Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, fixed the fair rents of tenants in this village. There are only two taluks in this village. The enhancement of neither appears to be excessive. I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records of this village at once.

No. 14. Mauza Merangloa.

44. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer.

It has since been fixed-see item No. 19 of statement A.

45. The rent of taluk No. 171, Azimuddin, has not yet been fixed.

46.1 considered the case of taluk No. 173, Manu Ram. The large increase in raiyati rental is due to rent having been imposed for the first time on a number of raiyats. The enhancement of the taluki rent is about 100 percent, but the profit is not altered, being now Rs. 239-168 or Rs. 71, as against Rs. 155-84 or Rs. 71 before. I did not therefore fix any rasadi gradation.

47.1 considered the case of taluk No. 180 or Rs. 71, as against Rs. 155-84 or Rs. 71 before. I did not therefore fix any rasadi gradation.

48. Taluk No, 185, Abdul Ali.-Old rent Rs. 18. New rent Rs. 35-12. The entire assets of this taluk are raiyati. There are 11 tenants, and the rents have been somewhat raised. For these reasons, and on account of the large enhancement, i allowed the talukdar *a* commission of 40 per cent, including cost of collection, and reduced the rent to Rs. 30-10

49. For the same reason I allowed 40 per cent, commission to taluk No. 192, Yar Muhammad, reducing his rent to Rs. 13.

50.1 considered the cases of the independent itmams in this village in the light of the Board's remarks in paragraph 35 of their letter No. 168A., dated the 9th February 1894, and of paragraph 11 of the Government letter

No. 1233, dated the 6th March 1894. The mistake which had been made as to the status of these itmamdars and their under-tenants had already been corrected, the itmamdars being recorded as tenure-holders, and their raiyats as raiyats. The existing rents of the latter have in each instance been accepted as fair, and the itmamdars appear to have been allowed a sufficient margin over them. None of the enhancements appear to be excessive.

51. I considered the cases of the remaining taluks and khas jots in this village. None of the enhancements appeared to be excessive. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to proceed to final publication at once.

No. 15. Mauza Hytobi.

52. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. I considered the rents of the taluk and jots in this village. None of the enhancements appeared to be excessive. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to proceed to final publication at once.

No. 16. Fatehkhar Kub

53. The rents of this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose on the basis of soil maps. He has since revised the rents, with the result of largely reducing them.

54. No. 194, Taluk Magan Das.-The Assistant Settlement Officer has reduced the raiyati rental from Rs. 909-3-6 to Rs. 852-5-6. The figures. Rs. 579-4-6, showing existing rents, are misleading, because they do not include previous rents of itmamdars. I have examined the rents of the itmamdars and tenants, and one of them appear to be excessive. With this taluk has been amalgamated item No. 14 of old statement F, which comprised excess lands separated from a private estate. The net assets are now as follows :-

	Rs.	A.	P.
Rent paid by Itmamdars ...	527	10	0
Ditto by raiyats	235	13	0
Assessment of nij-jot	2	2	0
Gross rents	765	9	0

The Assistant Settlement Officer has taken as gross rents of the taluk, not the rent payable by the itmamdars, viz. Rs. 527-10-3, but the rent payable by the itmamdar's tenants, viz. Rs. 650-2-3, and he has allowed the talukdar a commission of 35 percent., fixing the fair rent of the taluk at Rs. 577-5. Taking as the gross rents the amount directly realizable by the talukdar, viz Rs. 765-9, and allowing the talukdars 30 per cent, of this sum, including cost of collecting, I reduced the rent to Rs. 535-12.

55. Taluk No. 195, Anandi Ram.-This is a similar case to the last. The Assistant Settlement Officer had taken as the gross rents of the taluk–

	Rs.	A.	P.
Rents payable by the talukdar's raiyats	182	7	9
Ditto ditto itmamdars.. ...	564	o	6
Total...	646	8	3

and had allowed the talukdar 35 percent., fixing his fair rent at Rs. 420-4. I took as the assets–

	Rs.	A.	P.
Rents payable by Itmamdars	389	7	6
Ditto by talukdar's tenants	182	7	9
Total	571	15	3

and allowing the talukdar 30 per cent, commission, I reduced the rent to Rs. 400-4.

56. The rent of No. 200 taluk, Alimaddin, had not been fixed. I considered the rents of the remaining taluks, ijaras and khas jots. None appeared to need revision. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the record at once.

NOTE– It has since been fixed-see tem 114 of new statement A.

No. 17. Mauza Rajarkul.

57. The rents of this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, on the basis of soil-rates, but they have since been revised by him under my instructions. I had also previously revised the itmamdar's rents.

58. Taluk No. 203, Sher Musta Khan.-Former rent Rs. 1,101-8-6. New rent Rs. 1,587-11. The Assistant Settlement Officer has taken as the gross rents of the taluk–

	Rs.	A.	P.
Assessment on nij-jot area	38	4	0
Rents of talukdar's raiyats	327	9	9
Itmamdars	2,0442	12	3
Total...	2,442	12	3

and allowing the talukdar a commission of 35 percent., has fixed the fair rent at Rs. 1,587-11

I took as the gross rents–

	Rs.	A.	P.
Assessment on nij-jot area	38	4	0

Rents of talukdar's raiyats	327 9 9
" payable by itmamdars	1,740 0 3
Total	2,105 14 0

and allowing the talukdar a commission of 30 percent., reduced the fair rent to Rs. 1,474.

59. I considered the rents of the remaining taluks and khas jots in this village. None of them appeared to require revision. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 18. Mauza Srikul.

60. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. None of the rents appeared to be excessive, I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to proceed with the final publication of the records at once.

No. 19. Mauza Compana.

61. The raiyati rents of the village were fixed by Babu Durga Charan Ghose. All the records have been finally published with theexception of the khewat of the one Noabad taluk. There appeared to be no reason for revision in this village, and I directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the khewat at once.

No. 20. Mauza Ukhiaghona.

62. In this village the raiyati rents were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer.

63. Noabad taluk No. 207, Indra Narain.-The Assistant Settlement Officer has amalgamated the excess lands forming item No. 15 of old statement F with this taluk, and has fixed the joint rent at Rs. 772. The rent does not appear excessive. I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 21. Mauza Kowarkho. (P)

64. The raiyati rents in the village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlemtn Officer. Three is one taluk, No. 207, Muhammad

Kasim. Old area 4d, 2k. hasila Old rent Rs. 64-0-3. New area 13d. 15k. hasila New rent Rs. 188-2. In this case the Assistant Settlement Officer has, in consideration of the large enhancement, already allowed the talukdar a commission of 40 per cent, on the gross assets. I think this rent is fair, but the enhancement is too large to take effect at once. I therefore fixed the following gradations:-

		Rs.	A.	P.
From 1894-95 to 1898-99	.....	128	0	0
From 1899-1900 onwards	.....	188	2	0

65.1 have considered the rents fixed of the khas jots, and am of opinion that there is no ground for revision. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to proceed with the final publication at once.

No. 22. Mauza Manurjhil.

66. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Chose, Assistant Settlement Officer. There are one hal taluk and one ijara in this village, the rents of which have not yet been fixed, though the rents of the subordinate tenants have been fixed. There appears to be no need of revision in this village, and I instructed the rents of the subordinate tenants have been fixed. There appears to be no need of revision in this village, and I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 25. Mauza Garjania.

67. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer. There is one hal taluk, the rent of which has not been fixed, though the rents of the subordinate tenants have been fixed. There is a large mahal, item No. 18 of statement, which has been formed out of the excess lands separated from a permanently settled estate. The Special judge on appeal has directed that the lands of the permanently-settled estate, as measured in the 1200 m.S.survey, shall be identified. The survey is about to commence. The records of this village cannot be finally published until this case has been disposed of.

No. 27. Mauza Dariardighi.

68. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Chaose, Assistant Settement Officer.

69. No. 220, Taluk Ilari jugal-Old rent Rs. 42-9. New rent Rs. 117-11. the Assistant Settlement Officer has allowed to the talukdar in this case a profit of 40 per cent, in consideration of the large enhancement. After consideration, I have not made the enhancement rasadi for the following reasons:

1. The new assessment is light, being at the rate of Rs. 12 a drone on the hasila area.

2. The profit is not very largely reduced.

3. The talukdar has over 5f(1,2) drones hasila in his own possession, assessed at a very light rate.

70. There is a large apparent enhancement in the hal taluk and ijara in this vilalge. The rents were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose. Assistant Settlement Officer, on the basis of soil-rates. I have consulted the Assistant Settement Officer, and he informs me that there is every reason to believe that the rents recorded as existing rents had no real existence. I have exam-

ined these rents and have come to the same conclusion. Thus I notice the following rents recorded as existing:

	D.	K.	G.	C.	
1. Rupees 16 per , ...	2	8	18	3	hasila
	O	2	5	O	khila
Total	2	11	3	3	
2. Rupees 16-8-3 for ...	2	14	11	3	hasila
	O	9	7	2	khila
Total	3	7	19	1	

Babu Durga Charan Ghose found Rs. 28 a drone to be a fair rate for lands in this village. The rates adopted by Babu jogendra Kumar Bose have been proved by evidence, oral and documentary, and I am satisfied that they are not excessive. I have instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 28. Mauza Dhichia Palong.

71. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. I examined the rents of the taluk ijara and jots in this village. No revision appeared to be necessary. I therefore directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 29. Mauza Dhoa Palong.

72. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer.

73. No. 222, Taluk Hari jugal-Old rent Rs. 100-7-2. Now rent Rs. 239. The enhancement is a large once, and assets are entirely raiyati. For these reasons, I allow the talukdar a profit of 40 per cent, on the new assets, and reduce his rents to Rs. 204-12.

74. There seems no reason for reducing the rents of the remaining taluks and khas jots in this village, and I therefore directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 30. Mauza Goalia Palong

75. The raiyati rents of this village by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer. The records have all been finally published already with the exception of the talukdar's khewats. The rents do not appear to need any modification, and I accordingly directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 26. Mauza Kachapia.

76. The rents of this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, but they have been subsequently revised and

reduced by him.

77. Taluk No. 217, Rustam All.-the settlement has been revised. The Assistant Settlement Officer has taken the gross assets as follows :

	Rs. A. P.
Assessment on nij-jot area	27 2 0
Rents payable by raiyats to talukdar	1,842 14 6
Ditto ditto itmamdars	1,050 11 9
Total gross rents	2,920 12 3

He has allowed the talukdar 35 per cent, commission in consideration of the great enhancement, and has fixed the fair rent at Rs. 1,898-8. Taking as assets of the taluk the rents paid by the itmamdars to the talukdar, instead of the rents paid to the itmamdars by their raiyats, the assets are as follows :

	Rs.	A.	P.
Assessment on nij-jot area ...	27	2	0
Rents payable by raiyats to talukdar	,842	14	6
ditto itmamdars to talukdar	929	10	0
Total	2,799	10	6

and if 30 percent of these assets be allowed to the talukdar, the rent comes to Rs. 1,959-12, which is a higher rent than the Assistant Settlement Officer has fixed.

The large increase of raiyati rents shown in the statement A previously submitted is not real, for the existing rents of itmamdars were not entered in the existing rents column. I had previously examined all the itmamdars rents, and am of opinion that they are fair. The effect of the revision which the Assistant Settlement Officer has made is shown from the following figures:-

	Rs.	A.	P.
Fair rent fixed as shown in the printed statement A ,.	3,066	0	3
New rents payable by raiyats to talukdar	1,050	11	9
Gross rents of itmans	1,842	14	6
Total	2,893	10	3

A reduction of Rs. 172-6 has therefore been effected. The new of the taluk is not, I consider, excessive, and the profits will be but little reduced.

78. Taluk No. 218, Panchcowri jalia.-The Assistant Settlement officer has assessed this taluk as follows :-

	Rs.	A.	P.
Assessment on nij-jot area ...	20	0	9

Rents paid by raiyats to talukdar	1,436 2 8
Ditto itmamdars to talukdar	455 12 3
Gross rents	1,911 15 0,

and allowing the talukdar 30 per cent, profit, reduce the rent to Rs. 1,337-8.

79.1 examined the fair rents of the two ijaras in this village. These have not been revised by the Assistant Settlement Officer, and some of the enhancements appear to be excessive, or at least too large to come into effect at once. I therefore instructed the Assistant ijaras until the rents had been revised.

80.1 examined the fair rents of the khas jots. These are lands settled by the Assistant Settlement Officer, and the rents do not appear to be excessive. I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records with the exception of those of ijaras Nos. f(47,51) 1811 and f(48,52) 1812.

No. 33. Mauza Idghur.

81. The rents of this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, not on the basis of soil maps, but, after a local enquiry, on some what similar lands. I examined the rents fixed, which do not appear to be excessive, and instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 34. Mauza Gajalia.

82. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. All the records of this village have already been finally published with the exception of the khewat of the Noabad talukdar.

83. Taluk No. 229, Raj Ballabh.-Old rent Rs. 56-2. New rent Rs. 118.

In this case the enhancement is large, and the Assistant Settlement Officer informs me that the lands are bad, hard and dry. There has been a large increase of raiyati rentals which will probably make collection more difficult. For these reasons I allowed the talukdar a profit of 40 per cent and reduced the rent to Rs. 101-4. There are no other mahals in this village, and I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 35. Mauza Bhomariaghona

84. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer. I considered the rents of the taluk and khas jots, but as there seemed to be no cause for modification, I directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 36. Mauza Ingaon.

85. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, not on the basis of soil-rates, but after a local enquiry of a somewhat similar nature.

86. Taluk No. 231, Sib Charan.-Old rent Rs. 4,479-11. New rent Rs. 8,830.

This is a very large taluk belonging to estate Magan Das, now under the management of the Court of Wards. I understant that the Board' have ordered the estate to be made over to the wards with effect from next year. The Assistant Settlement Officer has made the assessment as follows:-

	Rs.	A.	P.
Assessment on nij-jot area	142	11	0
Rents payable by recognized itmamdars	1,327	2	0
Gross rents of invalid itmams	10,518	8	8
Rents of raiyats payable to the talukdar	2,728	4	1
Total gross rents	14,716	9	9

He has allowed the talukdar 40 per cent, commission including cost of collection, in order to mitigate the enhancement, and has fixed the rent of the taluk at Rs. 8,830. If the rents payable by invalid itmamdars to the talukdar, instead of the gross rents of the itmamdars be included in the assets, and 30 per cent, commission be allowed to the talukdar, the assessment works out to Rs. 9,047, so I have not modified the rent as fixed by the Assistant Settlement Officer. I consider this a fair rent, and the profit of the talukdar has been but little reduced. The net amount realizable by him is Rs. 12,924-8-8, so that his profit is Rs 4,094 odd. Were the estate to remain under the Court of Wards, and the talukdar to have the assistance of the certificate procedure to realize the new rents, there might be no necessity to modify the assessment. But in consideration of the difficulty which will probably be expericence by the wards in collecting the new rents, I direct that the enhancement shall be gradual, as follows:-

	Rs.
From 1894-95 to 1898-99	5,929
1899-1900 to 1903-04	7,379
1904-05 onwards	8,830

87. I have considered the rents of the ijaras and jots in this village, and there seems no ground for modification. I have therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 37. Mauza Boalkhali.

88.-The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan

Ghose, Assistant Settlement Officer, and the records have all been finally published with the exception of the khewat of the taluk.

89. No. 232, Taluk Mobarak Ali.-Old rent Rs. 137-5-6. New rent Rs. 282.

The enhancement is large, and the talukdar has suffered hy tho exclusion of khila land from his taluk, for these reasons I allow him a profit of 40 per cent., and reduce his rent to Rs. 241-12.

90.1 considered the rent of the other taluk in this village, but there appeared no reason to modify it. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 38. Mauza Napitkhali.

91. There is only one Noabad taluk in this village and the Assistant Settlement Officer has settled the existing rent as fair. The records will not be finally published at present as the Assistant Settlement officer has a case on his file for settlement of a large area of previously unassessed lands in this village.

No. 39. Mauza Batamani.

92. In this village Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, fixed the raiyati rents, and the records have all been finally published.

No. 40. Mauza Phulchari.

93. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, and the records have already been finally published with the exception of the khewat of the Noabad taluk.

94. Taluk No. 236, Mobarak Ali.-The large enhancement of the raiyati rental in this taluk is due to the fact that Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, disbelieved the statements of the landlords and tenants as to the existing rent, and apparently with good reason, for they produced no documents, and the incidence of the existing rent upon the hasila area (apart from the khila area which is of considerable extent) is only slightly over nine annas a kani. According to his own showing the talukdar will now make a profit of Rs. 70, instead of a loss of Rs. 7. There are no other mahals in this village. The records may be finally published at once.

No. 41. Mauza Khuntakhali.

95. The raiyati rents in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose Assistant Settlement Officer. The enhancements appear not to be excessive. The records may be finally published at once.

No. 42. Mauza Ichakhali.

96. There is only one Noabad taluk in this village. The talukdar owns

also the taluk in Napitkhali. The Assistant Settlement Officer has settled the existing rent of both taluks as fair in accordance with the written statement filed by the talukdar. The enhancement of rents in this village is due to the assessment at Rs. 126-14 of an itmam, of which the previous rent has not been shown in statement A. The records may be finally published at once.

No. 147. Mauza Gomatali.

97. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, and the records have all been finally published with the exception of the khewat of the Noabad taluk.

98. No. 239, taluk Tonagazi.–Former rent Rs. 120, New rent Rs. 241-12. The talukdar has recently brought more land under cultivation which accounts for the increase in nij-jot assessment.

The assessment is as follows :-

	Rs.	A.	P.
Nij-jot	32	14	0
Raiyati	370	1	3
Gross rents	402	15	3

In consideration of the large enhancement, the talukdar has already been allowed 40 per cent, commission, his rent being fixed at Rs. 241-12. In consideration of the high rate of enhancement, I fix the following gradation of enhancement :-

	Rs.	A.	P.
For the years 1894-95 to 1898-99	180	0	0
Ditto 1899-1900 onwards	241	12	0

This is the only mahal in the village. The records can now be finally published.

No. 44. Mauza Pokkhali.

99. The raiyati rents of this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, and the records have all been finally published with the exception of the khewats of the Noabad taluks. The assessments do not appear to be excessive, and the records may be finally published at once.

No. 45. Mauza Chaufaldandi.

100. The rents in this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, not on tin basis of soil-rates, but after *a* local enquiry of a somewhat similar nature. The enhancement of raiyati rents do not appear to be excessive.

101. Taluk No. 243, Aman Ali.–Former rent Rs. 1,386-9-6. New rent Rs. 2,998-13. The Assistant Settlement Officer has made the assessment as fol-

lows:-

			Rs. A. P.
Assessment of nij-jot area	.....	.....	482 14 0
Rents paid by raiyats to talukdar	.....	.....	3,367 8 6
Gross rents of itmans	.....	.....	763 3 3
Total gross rents	.....		4,613 9 9

and, allowing the talukdar 35 per cent., he has fixed the rent at Rs. 2,998-13. The high precentage of commission is owing to the fact of gross rents of itmnms being included in the assets, and also to the lands requiring embankments. It will be seen that Chaufaldandi is one of the villages refered to in paragraph 15(c) of Government letter No. 1233, dated the 6th March 1894. This taluk belongs to the estate of Muzaffir Ahmad, now under the management of the Court of Wards. The Assistant Settlement Officer informs me that the embankments were formerly maintained at the expense of the tenants, but that since the Court of Wards recently assumed management, they have spent large sums on the embankments. The naib informs me that the cost of the embankments in this village will be not less than Rs. 3,000 this year, and he estimates the annual cost of repair at Rs. 400. This estate holds in this village :-

Drones.		
Taluk Amanali with an area of		417
Hal taluk Durga Charan .		90
A permanently-settled mahal		10
	Total....	517

Accepting the naib's statement as correct, the proportionate share of the expenditure on embankments on account of this taluk may be estimated at Rs. 2,419 for this year and Rs. 280 annualy.

		Rs. A. P.
The gross rents of the taluks are-		
Assessment on nij-jot area		482 14 0
Rents payable by itmamdars		662 9 0
Ditto by raiyats		3,367 8 6
Gross rent....		4,512 15 6
Deduct 35 per cent, commission		1,579 15 6
	Balance	2,933 0 0

The expenditure on embankments for the five years 1894-95 to 1898-99 is estimated at–

Rs.

Initial cost	....	2,419
Recurring charge at Rs. 280 for four years	....	1,120
Total	....	3,539

The talukdar is to enjoy is profit only 35 per cent, of the assets. I therefore allow him 65 per cent, of this expenditure as remission, or Rs. 2,300. Spreading this amount over the five years, the share of the annual charge is for the first five years Rs. 460. The share of the subsequent annual charge is Rs. 182. I therefore settle the rent as follows :-

		Rs.
For the years 1894-95 to 1898-99	....	2,473
Ditto 1899-1900 onwards	....	2,751

I have considered the rent of the ha|l taluk and jots in this village, and the rents do not appear to be excessive. The records may now be finally published.

No. 46. Mauza Machuakhali.

102. The rents in this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, but not on a basis of soil-rates.

103. No. 245, Taluk Amaljama.-The assests of this taluk are :-

	Rs.	A.	P
Assessment of nij-jot lands	15	6	0
Rents payable by recognized itmamdars	461	0	0
Ditto by unrecognized itmamdars	1,199	0	6
Ditto by raiyats	589	4	0
Total....	2,264	10	6

The Assistant Settlement Officer has taken the gross rents of the unrecognized itmams, viz. Rs. 1,438-1-6, and, calculating the assets at Rs. 2,503-11 -6, he has allowed 35 per cent, commission to the talukdar on account of his net assets being less than those thus calculated, and has settled the fair rent at Rs. 1,628-7.1 take the assets as above calculated, and allowing the talukdar 30 per cent., reduce the rent to Rs. 1,585-4.

104.1 cosidered the rents of the hal taluk and jots in this village, and they did not appear to require modification. I therefore directed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 47. Mauza Dhalichara.

105. The rents in this village were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, but not on the basis of soil maps. I considered the rents of the taluks and jots, but they did not appear to be excessive. In assessing taluk No. 247, Magan Das, the Assistant Settlement Officer has

taken the gross rents of the invalid itmams as the assets of the taluks, and has allowed the talukdar 35 per cent. Had the taken the rents payable by the itmamdars to the talukdar as the assets and allowed the talukdar 30 per cent., the rent would have been larger. The records of this village may now be finally published.

No. 48. Mauza Bharoakhali

106. The rents in this village were similarly fixed.

No. 249, Taluk Mahammed Raja Jamsher-The Assistant Settlement Officer has based his assessment on the gross rents of the invalid itmams, allowing the talukdar a profit of 35 per cent, for this reason. I calculated the assets as follows:-

		Rs.	A.	P.
Nij-jot assessment		4	0	0
Rents payable by itmamdars	....	1,549	12	6
Ditto raiyats	....	567	1	9
Total	....	2,120	14	3

I deduct 30 per cent, commission, including cost of collection, leaving a balance of Rs. 1,484-10-0. It will be seen that this is one of the villages referred to in paragraph 14 (c) of the Government letter No. 1233, dated the 6th march 1894. This taluk belongs to estate Muzaffir Ahmad of which the Court of Wards have recently taken charge. The naib informs me that there will be an expenditure of Rs. 1,500 on this taluk this year, which is required to put the embankments in thorough repair, and that the annual charge for repairs will probably be about Rs. 150 a year. Accepting these figures, it appears that the expenditure during the five years 1894-95 to 1898-99 will be–

		Rs.
Initial expenditure	....	1,500
Annual expenditure at Rs. 150 for four years	....	600
Total		2,100

This is equivalent to a yearly charge of Rs. 425 a year for the five years and to Rs. 150 a year subsequently. As Government is to take 70 per cent, of the assets, it seems fair that a proportionate amount of this cost should be deducted from the rent. I therefore deduct Rs. 297 for the first five years and Rs. 85 subsequently, fixing the fair rents as follows :-

		Rs.	A.	P.
For the five years 1894-95 to 1898-99	....	1,187	8	0
From the year 1899-1900 onwards	....	1,400	0	0

107. Taluk No. 250, Mohammad Raja.-Old rent Rs. 272-12. New rent Rs. 1,302-9. There is a large increase in hasila area, viz., from about 21 drones to 65 drones. The Assistant Settlement Officer has fixed the assets at Rs. 1,860-13, and, allowing the talukdar 30 per cent., has fixed the fair rent at Rs., 1,302-9. This talukdar constructs embankments, or at any rate assists his tenants to do so, and in consideration of this fact and of the large enhancement., I allow him 40 per cent, commission, including cost of collection. His assets are as follows :-

	Rs.	A.	P.
Nij-jot assessment	70	7	0
Payable by itmamdars	115	5	0
Ditto raiyats	1,658	2	5
Gross rents :	1,843	14	5

Deducting 40 per cent., I fix the fair rent at Rs. 1,106-4.

The enhancement is too large to come into effect at once, and I fix the following gradations :-

	Rs.	A.	P.
For the five years 1894-95 to 1898-99	550	8	0
Ditto 1899-1900 to 1903-04	828	4	0
From the year 1904-05 onwards	1,106	4	0

I examined the rents of the jots in this village and the enhancements did not appear excessive. I instructed the Assistant Settlement Officer to finally publish the records at once.

No. 49. Mauza Ultakhali.

108. In this village the raiyati rentals were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer, and the records have already been finally published with the exception of the talukdar's khewats.

109. Taluk No. 253, Mahommed Taki.-Old rent Rs. 19-10-9. New rent Rs. 41-5. The existing rent was formerly misprinted as Rs. 9-10-9. The Assistant Settlement Officer has allowed the talukdar a commission of 40 per cent, in consideration of the large enhancement, and the rent now seems fair. I have considered the rent of the other taluks in this village and it does not appear to be excessive. The records can be finally published at once.

No. 50. Mauza Nandakhali.

110. The raiyati rentals in this village were fixed by Babu Durga Charan Ghose, Assistant Settlement Officer.

111. Taluk No. 254, Gouri Sanker.-Old rent Rs. 152-14. New rent Rs. 297-4. The talukdar's profit has been reduced from Rs. 273 to Rs. 126.

Taluk No. 256, Yar Mahommed.-Old rent Rs. 45-5-3. new rent Rs. 79-12.

Taluk No. 259, Nabi Jafar.-Old rent Rs. 36-4-3. New rent Rs. 78-6. All the taluks in this village have been recently bought by a mahajan. His profits in them have been reduced from Rs. 430 to Rs. 204, and the enhancements are very high. For these reasons I allow the talukdar a profit in the above three taluks of 40 per cent., and fix the rents at Rs. 254-12, Rs. 68-4 and Rs. 67-4, respectively. I have considered the rents of the remaining taluks, ijaras and jots in this village, and the enhancements do not appear to be excessive. I therefore instructed the Assistant Settlement Officer of finally publish the records at once.

No. 51. Mauza Jowaria Nála.

112. In this village the rents were fixed by Babu Jogendra Kumar Bose, Assistant Settlement Officer, but not on the basis of soil-rates.

113. Taluk No. 262, Gouri Sankar.-Old Rent Rs. 528. New rent Rs. 718-10 Taluk No. 270, Golam Hosain.-Old rent Rs. 20-14. New rent Rs. 37-15.

In each of these taluks the Assistant Settlement Officer has taken the gross rents of the invalid itmams as the assets of the taluks. Taking the rents payable by the itmamdars to the talukdars as the taluki assets, I fix the rents as follows :-

Taluk No. 262.

	Rs.	A.	P.
Nij-jot assessment ...	0	3	0
Rents of valid itmams	84	4	9
Ditto invalid itmams	237	9	9
Ditto raiyats	126	9	0
Gross rents	448	10	0

Allowing 30 per cent, commission, fair rent Rs. 314.

Taluk No. 264.

	Rs.	A.	P.
Nij-jot assessment	13	4	0
Rents of itmamdars	608	3	6
Ditto raiyats	339	14	9
Gross rents	961	6	3

Allowing 30 per cent, commission, fair rent Rs. 673

Taluk No. 270.

Rs. A. P.

Rents of itmams	....	40 12 0
Ditto raiyats		7 4 0
	Gross rents	48 0 0

Allowing 30 per cent, commission, fair rent Rs. 33-8.

114. Taluk No. 267, Rustam Ali.-Old rent Rs. 27-13-9. New rent Rs. 65-4. The enhancement is at a high rate, and the assets are entirely raiyat. For these reasons I allow to the talukdar a commission of 40 percent and fix the fair rent at Rs. *55-12.*

115. Taluk No. 271, Golam Ali.-The increase in this taluk is due to the amalgamation with it of item No. 23 of statement F. The Assistant Settlement Officer has allowed to the talukdar a profit of 40 per cent, in consideration of the large increase of rents and the rent seems fair.

I have considered the rents of the other taluks and jots in this village, and the enhancements do not appear to be excessive. The records may now be finally published.

CAMP Cox's Bazar
The 29th March 1894,

C. G. H. Alien
Settlement Officer.

B A Y
O F
B E N G A L

46
VIII
47
IX
22°
RANGAMATI
CHITTAGONG
Sandip I.
Hatia I.
MEGHNA R.
Chittagong
Kutubdia
Bauphal
S
G
A
N
G
E
S
RENCES
PLATE NUMBERS.

থানা রামু
কক্সবাজার
স্কেল ১:১৫০,০০০
উ
সাংকেতিক চিহ্ন
১ জেলা সীমানা
২ থানা সীমানা
৩ ইউনিয়ন সীমানা
৪ থানা হেড কোয়ার্টার
৫ ইউনিয়ন " "
৬ নদী
৭ আর এইচ ডি সড়ক